

প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর ১৯৭১

প্রকাশ করেছেন :
চিত্তরঞ্জন সাহা
মুক্তধারা
[স্বাধীন বাংলা সাহিত্য পরিষদ]
৭৪ ফরাশগঞ্জ
ঢাকা—১
বাংলাদেশ
প্রচ্ছদ এঁকেছেন :
হাশেম খান
ছেপেছেন :
প্রভাংশুরঞ্জন সাহা
ঢাকা প্রেস
৭৪ ফরাশগঞ্জ
ঢাকা—১
বাংলাদেশ

আমার বিগত বিপন্নদিনে সহায় ঃ

রেণু-সানু, চন্দন-দলিল, স্বপন, রহিমারহমান-আহমদুর রহমান, মানিক-বখতিয়ার, মাহমুদ নুরুল হুদা, আবু রশিদ মাহমুদ, আহমদ সোবহান, ইব্রাহিম হোসেন, মানিক-হাবিব, ডক্টর এ. বি. এম. হবিবুল্লাহ্, বোরহান-উদ্দীন খান জাহাঙ্গীর প্রমুখ স্বজন ও সুজনের কাছে আমার অপরিশোধ্য ঋণের কথা স্মরণ করছি।

কালিক ভাবনা

মাভৈঃ

সম্পদ ও শক্তির একটা মারাত্মক মাদকতা আছে। এই বিত্ত ও বল মানুষকে দাম্ভিক, উচ্ছৃঙ্খল, নির্ভীক ও বেপরোয়া করে তোলে। এরা কোন যুক্তিবুদ্ধির তোয়াক্কা করে না, গায়ের জোরেই সবকিছু জয় করতে চায়।

শক্তিমন্ত মানুষ চাওয়া ও পাওয়ার মধ্যে বাধা-ব্যবধান স্বীকারও করে না, সহ্যও করে না। এরা অন্ধ আবেগে চালিত এবং ঈর্ষা, অসূয়া ও লিপ্সা তাড়িত। ন্যায়নীতি, সত্য, বিবেকবুদ্ধি, বিবেচনা তাদের কাছে অবহেলিত। মনুষ্যত্ব তাদের কাছে মূল্যহীন আর মানবিকবোধ ও গুণ তাদের চোখে দুর্বলতা ও পৌরুষহীনতা। নির্মমতা ও নিষ্ঠুরতা, ছলচাতুরী ও বঞ্চনাই তাদের পার্থিব প্রভুত্বের পুঁজি। আর শক্তিমানের ইচ্ছাটাই আইন, তার কর্ম ও আচরণ মাত্রই বৈধ। কারণ King can do no wrong। ঐশ্বর্য যে মানুষকে কেমন অমানুষ বানিয়ে ছাড়ে, তার সুন্দর রূপক রয়েছে হিন্দু পুরাণে। সাগরকন্যা লক্ষ্মী হচ্ছেন পরমা সুন্দরী। ঐশ্বর্যের ঐ অপরূপা রূপসী দেবতার বাহন হচ্ছে কিন্তু কদাকার পেচক। সে দেহেমনে কুৎসিত। আলো ও সৌন্দর্য, রূপ ও রঙ সে সইতে পারে না। তাই সে নিশাচর। জীবনযাত্রায় সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে ধনসম্পদের প্রয়োজন, এ না থাকলে যেমন নিঃস্বের জীবন রিক্ত, দারিদ্র্যদুষ্ট ও ব্যর্থ, প্রয়োজনাতিরিক্ত ধনও আবার মানুষকে নীতি-নিষ্ঠাহীন ও সদাচারভ্রষ্ট করে। যেমন জল না হলে জীব বাঁচে না, তাই জলের নাম জীবন। জল জীবন রক্ষা করে বলে স্থলের প্রাণীকে জলে ডুবিয়ে রাখলে জীবন বাঁচে না—বরং চিরতরেই যায়। তেমনি লক্ষ্মীর প্রসন্ন দৃষ্টি সবারই কাম্য, সবার জীবনেই তাঁর দয়া দরকার। কিন্তু অতি স্নেহে তিনি যদি সিন্দবাদের ভূতের মতো কারো ঘাড়ে চাপেন, তাহলে তার মনুষ্যত্ব নষ্ট করে তাকে প্যাঁচা বানিয়েই ছাড়েন। শক্তিমান ও ঐশ্বর্যবানের মনুষ্যত্ব তাই দুনিয়ায় দুর্লভ।

অর্থের অনুষঙ্গী যেমন মদ ও মেয়ে মানুষ, শক্তির অনুষঙ্গীও তেমনি জোর ও জুলুম। শক্তি ও সম্পদ পরিমিতি মানে না। নিয়মনীতির বেষ্টনীর মধ্যে বিত্ত ও বলের বিভা ও বিকাশ প্রকটিত হয় না। তাই অনিয়মের লালন। অনীতিই এর অনন্যতা।

একটা কথা চালু আছে যে, শাসনের দায়িত্ব যার, তার নরম হলে চলে না। প্রভু স্বৈরাচারী না হলে মানায় না, কারণ প্রভুত্বের জন্যে প্রবল প্রতাপ প্রয়োজন। বিধিবিধানের মাধ্যমে প্রতাপের প্রকাশ সম্ভব নয়, স্বেচ্ছাচারিতাই দাপট দেখানোর প্রকৃষ্ট পন্থা। ছল-বল-কৌশল; জোর-জুলুম-বঞ্চনা, শঠতা-কপটতা, ক্রূরতা, নিষ্ঠুরতা, অমানুষিকতা প্রভৃতি পৌরুষ-লক্ষণ শাসক ও প্রভুর স্বভাবে থাকা আবশ্যিক। নইলে দুষ্ট লোক প্রশ্রয় পেয়ে পরপীড়নে উৎসুক হয়। এ জন্যেই সাধারণের পক্ষে যা গর্হিত, যা অন্যায় ও অমার্জনীয়, প্রভু ও শাসকের পক্ষে তা-ই বৈধ ও বরণীয়। দেশ-দুনিয়া জবরদখল করাই রাজনীতি। কাড়া-মারা সবই বৈধ। বস্তুত পরস্বাপহরণ ও অঙ্গীকারলঙ্ঘন, কাপট্য, ষড়যন্ত্র, প্রতারণা প্রভৃতি রাজধর্ম এবং একই নীতি ঘরে-বাইরে প্রযুক্ত। তার প্রীতিও "বালির বাঁধ, ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেক চাঁদ"। Ethical Code বা নৈতিক বিধি ও নীতিহীনতাই সরকারী নীতি। সেনাবাহিনীতো আসলে খুনী বাহিনী—নরহত্যা করার জন্যেই নিযুক্ত। হিটলার-পূর্ব যুগ অবধি পররাজ্য গ্রাসকারী খুনী-লুটেরাই জগতে শুধু জাতীয় নয়, আন্তর্জাতিক বীর। সাইরাস থেকে নেপোলিয়ন অবধি সব নরহন্তাই নরবন্দিত মহাবীর। কেবল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ থেকেই লোকে যুদ্ধবাজদের ঘৃণা করতে শুরু করেছে। হাদিস অনুসারে রাজনীতিতে, দাম্পত্যজীবনে এবং বিবাদ মীমাংসায় মিথ্যাভাষণে দোষ নেই।—(তিরমিজি)। শুধু শাস্ত্রের সম্মতি নয়, অন্য আপ্তবাক্যের সমর্থনও রয়েছে—'There is nothing unfair in love and war এবং in war Truth is the first casualty। সমরে সত্যই প্রথম শহীদ। আর কে না বোঝে যে শাসক ও শাসিতে ব্যক্ত কিংবা অব্যক্ত দ্বন্দ্ব, বাক্‌যুদ্ধ কিংবা সশস্ত্র অথবা নিরস্ত্র লড়াই সর্বদা চলছে। অতএব, সরকারকে মিথ্যাশ্রয়ী হবার জন্যে দোষ দেয়া যায় না। তাই ন্যায়নীতি ও রাজনীতি কখনো অভিন্ন নয়। সাধারণে যা দোষ, শাসকে তা-ই গুণ।

জানিনে এর মধ্যে হয়তো গভীর তত্ত্ব ও তথ্য রয়েছে। কারণ দেখা গেছে, ন্যায়নিষ্ঠ বিবেকবান হৃদয়বান সদাচারী সংযমী রাজা-বাদশাহ প্রায়ই দুর্বল বলে প্রমাণিত হয়েছেন; এবং রাজ্যে বিশৃঙ্খলা দমনে ব্যর্থ হয়েছেন এবং অনেক সময় রাজ্য হারিয়েছেন। হৃদয়বান লোক নিষ্ঠুর হতে পারে না, তাই ত্রাস সৃষ্টি করতে জানে না। বিবেকবান লোক শঠের মোকাবেলায় শঠ হতে অসমর্থ, তাই শঠের কাছে হারে, ন্যায়নিষ্ঠ লোক ছলচাতুরী প্রয়োগে কার্যসিদ্ধি করতে অক্ষম, তাই প্রবলের প্রতিপক্ষতার মুখে সে নিরুপায়। মিথ্যা তার মুখে আসে না, কাজেই মিথ্যা দিয়ে সে কারো মন ভুলাতে পারে না। সংযমী মানুষ সহিষ্ণু হয়, তাতে দুষ্ট লোক আসকারা পায়। তার সদাচার ভীরুতা, তার ক্ষমা দুর্বলতা, নরহত্যায় তার অনীহা অযোগ্যতা, তার নীতিনিষ্ঠা নির্বুদ্ধিতা বলে উপহাস পায়। কাজেই শাসক হওয়া তাকে সাজে না, প্রভুর আসনে তাকে মানায় না। এজন্যেই বোধ হয় সরকার মাত্রই সত্যভীরু! সরকার নিজেও সত্য বলে না। অন্যকেও বলতে দেয় না। সত্য গোপন ও মিথ্যাপ্রচার, দেদার আশা ও আশ্বাস দান, মনে মুখে অনৈক্য ও কথায় কাজে অসঙ্গতি এবং সরকারী স্বার্থে আইনের অপ্রয়োগ ও ক্ষমতার অপব্যবহারই হচ্ছে রাজনীতি বা শাসননীতি। সরকারী প্রয়োজন মাত্রই ন্যায় ও বৈধ। তার সাথে জনস্বার্থের যোগ থাকুক আর না-ই থাকুক।

সরকারী নীতিতে অযুক্তিই যুক্তি, অন্যায়ই ন্যায়, অসত্যই সত্য, তাই সরকারের সকাল-সন্ধ্যার কথায় কিংবা কাজে কোন পারম্পর্য, কোন সঙ্গতি সামঞ্জস্য থাকে না। কারো কাছে জবাব দিহি করতে হয় না। মুখের উপর কারো কথা বলবার অধিকার নেই, চোখে আঙুল দিয়ে কেউ দেখিয়ে দিতে সাহস পায় না, তাই রক্ষা। বরং চাটুকার দিয়ে বলিয়ে নেয়, হাঁ এ-ই সত্য, খাঁটি সহি কথা, কাজ ও ব্যবস্থা। সরকার যেখানে সদাচার ও সততা পরিহার করার নীতিই সুষ্ঠু শাসনের মোক্ষম উপায় বলে জানে, সেখানে সরকারী কর্মচারীরাও দুর্নীতিকে রেওয়াজ বলে মানে। অথচ এরাই জনসাধারণের তথা শাসন পাত্রের সততা দাবি করে। অসদুপায় ঢাকবার এ এক অদ্ভুত নমুনা। উৎকোচপ্রিয়, চোরাকারবারী যেমন গৃহভৃত্যের অসততা সহ্য করে না।

প্রতিবাদ মানে প্রভুর সার্বভৌম অধিকারে হস্তক্ষেপ, অমার্জনীয় ঔদ্ধত্য, মারাত্মক বিদ্রোহ, তাই সরকার সমালোচনা সহ্য করে না। মুখে বলে বটে, জনগণের জন্যেই সরকার, আসলে সরকারের জন্যেই জনগণের স্থিতি। আরো বলে, সরকার হচ্ছে জনসেবক, আসলে জনশাসক। বলে, জনগণই রাষ্ট্রের মালিক, আসলে সরকারই প্রভু। সরকারী চাকুরেরা নামে চাকর বটে, কাজে মনিব। সরকারে জনপ্রতিনিধিরা খাদেম বলে আত্মপরিচয় দেন বটে, কিন্তু কার্যত মখদুম হয়ে কাঁধে বসেন। সবটাই যেন একটা লুকোচুরির ব্যাপার, কাপট্যের খেলা। তাই মনুষ্য-বাঞ্ছিত নীতির সঙ্গে রাজনীতির মিল নেই। মনুষ্যনীতির লক্ষ্য মেষ-স্বভাব অর্জন, আর কুটনীতির উদ্দিষ্ট হচ্ছে শিয়াল-নৈপুণ্যের প্রয়োগ। সরকার হচ্ছে মানুষের জান-মাল গর্দানের মালিক। অতএব সেই সরকার-প্রভুর প্রশংসা কর—বন্দনা গাও, প্রয়োজন মতো সরকারের হয়ে রাতকে দিন, দিনকে রাত বল, তা হলেই তুমি অনুগত সুজন ও সুনাগরিক। খেতাব পাবে, চাকরি পাবে, পদোন্নতি হবে, আর অপকর্ম করবার, আইন ভঙ্গ করবার খোলা লাইসেন্স পেয়ে যাবে।

ঘরে বাইরে রাজনীতি হচ্ছে ধূর্ততার খেলা। জুয়ারীর ঝুঁকি নিয়ে নামতে হয় এ খেলায় ঘৃণা, লজ্জা, ভয়, ন্যায়, নীতি, সত্য— এই ষড়গুণাতীত হয়ে। 'হারি-জিতি নাহি ক্ষতি'র অঙ্গীকারে খেলা শুরু করতে হয়। মুখে রাখতে হয় মহৎ বুলি। ঠোঁটে মাখতে হয় মিষ্টি হাসি আর চোখ করতে হয় রাঙা।

কিন্তু তবু পতন রোধ করা সবার পক্ষে সম্ভব হয় না। রাজতন্ত্রের যুগে নয় কেবল, নায়কতন্ত্র কিংবা গণতন্ত্রের কালেও প্রভুর করুণ ও আকস্মিক পতন-ধ্বনিতে পৃথিবী প্রায়ই প্রকম্পিত হয়। মেষের অমায়িকতার আবরণে শিয়ালের ধূর্ততার পুঁজি নিয়ে বাঘের লিপ্সা পূরণের নৈপুণ্য না থাকলে এ খেলায় জেতা সহজ নয়।

মাষ্টার মাত্রই যেমন মেষ নয়, তাদের মধ্যে কেউ কেউ মোষও থাকে যারা স্ববলে পদোন্নতির পথ করে নেয়। তেমনি রাজনীতিক মাত্রই শিয়াল নয়, দৈত্যের সাহস ও বাঘের বল নিয়ে কেউ কেউ দিকে-বিদিকে ঝাঁপিয়ে পড়তে চায়। বলের সঙ্গে তাই বুদ্ধির ভারসাম্য রক্ষিত হয় না। ফলে পতন হয় অনিবার্য।

ইতিকথায় ও ইতিহাসে এমনি বেপরওয়া অকুতোভয় জালিমদের আকস্মিক পতনের চমকপ্রদ কাহিনী রয়েছে অনেক। তাতেই মনে হয়, প্রাকৃতিক নিয়মেই যেন উঠতির শুক্লপক্ষের পরে পড়তির কৃষ্ণপক্ষ অনিবার্য। চোখের সামনে দেখছি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর বিশ্বে নরত্রাস হয়ে উঠেছে। বন্ধুর বেশে আফ্রো-এশিয়া ও ল্যাটিন আমেরিকার বিভিন্ন রাষ্ট্রে হিতৈষী হয়ে প্রবেশ করে রক্তে আগুনে দেশটি রাঙা করে দিয়ে আততায়ী হয়ে ঘরে ফিরে। এ এক মায়াবী দানব। জানমাল দিয়ে তার হিতৈষণার দাম দিতে হয়। একবার ধরা দিলে তার ক্ষমতার অক্টোপাশ থেকে মুক্তি নেই। রক্ত বমি করিয়ে হাড়-মাংস গুঁড়ো করে দিয়ে ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের অবস্থা এমন করে দেয় যে যতই তার পীড়ন বাড়ে, ততই সে অপরিহার্য হয়ে উঠে। পঙ্গু করে দিয়ে প্রিয় হওয়ার এ এক অদ্ভুত মায়াবী নৈপুণ্য। তাকে ছাড়াও চলে না, সহ্য করাও যায় না। পৌরাণিক রাহুও বুঝি এমনি প্রাণঘাতী নয়, কেননা সেও এক সময় নিষ্কৃতি দেয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অজগরের গ্রাসে দুনিয়াটা ধীরে নীরবে ও নিশ্চিন্ত নির্লিপ্ততায় গ্রাস করিতে উন্মুখ। সাপের মতোই তেমনি শীতল মসৃণ মমতায় গভীর ও নিবিড় ভাবে প্যাঁচিয়ে প্যাঁচিয়ে বেষ্টন করে অঢেল পয়সা দিয়ে সে মিত্র কেনে, হৃদয় দিয়ে বন্ধু করে না। তার বেনে বুদ্ধি দেয়া-নেয়ার চোরা কারবারে তাকে দেউলে করবে। সে সবাইকে দান দিয়েছে, এবার তার দাগা পাবার পালা। আনুগত্যের অঙ্গীকারে অর্থদানের এই নীতি শেষাবধি মার্কিন সরকারকে প্রতারিত করছে।

সেই বিত্তধর বিশ্বমহাজন বীরবাহু বিশ্বত্রাস মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অতুল প্রভাবে ফাটল আজ প্রকট হয়ে উঠেছে। এবার বুঝি তার কৃষ্ণপক্ষ শুরু হল। প্রতাপের উত্তাপ এবার থেকে শীতল হতে থাকবে। কথায় বলে বাঘের বিক্রম বারো বছর। তা-ই বুঝি সত্য।

যে করেই হোক, প্রবল প্রতাপ পীড়ন-প্রবণ অত্যাচারী শক্তির পতন প্রায় ক্ষেত্রেই আকস্মিক ভাবে ঘটে। তার প্রতাপ বাষ্পের মতো উড়ে যায়, সাম্রাজ্য তাসের ঘরের মতো হয় বিলীন। নিদারুণ নির্যাতনের শিকার দাস ইসরাইলরা নিরস্ত্র মূসার হাতে পেল প্রবল প্রতাপ ফেরাউনের কবল থেকে ত্রাণ। ফেরাউনও সসৈন্যে ডুবে মরল। অমন অপরাজেয় বীর

গোলিয়থ প্রাণ হারাল ডেভিডের নিক্ষিপ্ত টুকরো পাথরের আঘাতে। পরাক্রান্ত আবরাহার চতুরঙ্গ বাহিনী ধ্বংস হল পাখীর ঠোঁট-নিঃসৃত নুড়ির ঘায়ে। দুনিয়া জোড়া পারস্য সাম্রাজ্য তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ল প্রজাপুত্র তরুণ আলেকজাণ্ডারের পদাঘাতে। দিগ্বিজয়ী বীর জুলিয়াস সিজার জবাই হল কেবল তার অসহ্য ঔদ্ধত্যের জন্যেই। তিনটি মহাদেশ জুড়ে যে তুর্কী সাম্রাজ্য অটল গিরির মতো স্থিতি পেয়েছিল, তা কোথায় যেন ফুঁয়ে উড়ে গেল। বিজয়ী হয়েও ব্রিটিশকে সাম্রাজ্য ছাড়তে হল। জার সাম্রাজ্য যখন কলেবরে স্ফীত হচ্ছে সেই সময়ে ঘটল তাঁর পতন। কে ভাবতে পেরেছিল অতুল বিক্রমশালী নেপোলিয়ন, হিটলার, মুসোলিনীর ঐ আকস্মিক পরিণাম! জাপান কি জানত তার স্বপ্নফল বিপরীত হবে!

আসলে বোধ হয়, শোষিত নির্যাতিতরা সয়ে সয়ে এবং সরে সরে যখন দেয়ালে পিঠ পেতে দাঁড়ায়, তখনই পায় তারা প্রতিহত করার শক্তি। সে মরিয়া হয়ে প্রত্যাঘাত করে বলেই তা সহ্য করার শক্তি হারায় পরপীড়ক দানব। নিপীড়িতের এ শক্তি জনবল কিংবা ধনবলের উপর নির্ভর করেনা, মনোবলই এ শক্তির উৎস। ঐ আকরিক শক্তি চিরকাল সুপ্তই থাকে—তার উপরে থাকে ভীরুতার ও অসামর্থ্যের আবরণ, কেবল চরম নির্যাতন মুহূর্তেই তা আগ্নেয়গিরির মতো উষ্ণ লাভা উদ্গীরণ করে ডুবিয়ে ভাসিয়ে দেয় পরিপার্শ্বকে। এই প্লাবনকে প্রতিহত করবার শক্তি কোন মর্ত্যমানবের কোন কালেই আয়ত্তে ছিল না, আজো নেই। তাই বোধ হয় বিসুবিয়াসের জ্বালা নিয়ে স্বল্প সংখ্যক মুক্তিকামী যখন রুখে দাঁড়ায় তখন প্রবল প্রতাপ সম্রাটের চতুরঙ্গ বাহিনীও রণে ভঙ্গ দেয়। জল স্থল আকাশের প্রভুও পালায়। মুক্তিসংগ্রামীর পরাজয় নেই। পাখীর ঠোঁট-নিক্ষিপ্ত পাথর কুচির ঘায়ে আবরাহার নিহত হাতীর মতোই দুরাত্মা দানব হয় পর্যুদস্ত, তার দৌরাত্ম্যের হয় অবসান। তখন জনজীবন হয় অর্থবহ। শিশুর হাসি, নারীর রূপ, ফুলের রূপ-রস-গন্ধ, কবিতার মাধুর্য হয় জীবনে তাৎপর্যময়।

আকাশ ও পৃথিবী, মাটি ও মানুষ তখন আপন হয়ে আশ্রয় হয়ে উঠে। তরুর ছায়া, নদীর মায়া হয়ে উঠে জীবনের পোষক। জল হয় জীবন, বায়ু হয় বুকের ধন। আলো হয় দৃষ্টি, আঁধার হয় নিভৃত নিলয়, পণ্য হয়

প্রাণ; প্রেম হয় পরশপাথর। প্রিয়া ও পৃথিবী, রূপ ও রূপসী, ভূমি ও ভূমা তখন একাকার। এ হচ্ছে স্বাধিকার ও স্বাধীনতার দান, মুক্তির প্রসাদ, আত্মত্যাগ ও রক্তের মূল্যে অর্জিত অক্ষয় ও প্রাণপ্রসূ সম্পদ, এজমালী হয়েও যা চাঁদ-সূর্যের মতোই প্রত্যেকেরই ব্যক্তিগত সম্পত্তি। প্রাণরস দিয়ে সৃষ্ট জীবনরসের উৎস, প্রাণপদ্মের রক্তলাল সূর্য। জাগ্রত জনতার জয় রুখবে কে?

গণমানবের আহবে দুরাত্মা দানবের পরাভব অবশ্যম্ভাবী। তার প্রভাব প্রতাপ খর্ব হবেই। মুক্তি আসন্ন। সামনে নতুনদিন, পলাশলাল অরুণ পূর্বাশা রাঙা করে তুলছে। অতএব, মাভৈঃ। নেপথ্যে নবসূর্যের আশ্বাস শোনা যাচ্ছে: ভয় নাই ওরে ভয় নাই, নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান, ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই। কাজেই নাহি ভয়, হবে জয়। অতএব তোরা সব জয়ধ্বনি কর।

৩০—১০—১৯৭১

নিষিদ্ধ চিন্তা

জীবনে সমাজে রাষ্ট্রে যা কিছু সুখের, স্বাচ্ছন্দ্যের ও আনন্দের তা দ্রোহেরই দান। দ্রোহী মানুষই নতুনের, কল্যাণের উদ্গাতা ও প্রবর্তক। আজ জীবন, সমাজ, ধর্ম ও রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে যে-সব অর্জিত সম্পদে আমরা আনন্দিত, যে-সব লব্ধ চিন্তা-গৌরবে গর্বিত, যে-সব আদর্শ-গর্বে আমরা ধন্য, যে-সব প্রাপ্তি সুখে আমরা তুষ্ট, যে-সব কৃতি সাফল্যে আমরা হৃষ্ট, তার সবগুলোই দ্রোহীর দান। আজ আমরা গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও জাতীয়তার আশু প্রতিষ্ঠা-স্বপ্নে বিভোর। মানব কল্যাণকর এ সব আদর্শের রূপায়ণ-প্রয়াসে উদ্যোগী। কিন্তু এর প্রত্যেকটিই এক কালের নিষিদ্ধ চিন্তার ফল। এ চিন্তা উচ্চারণ করতে যেয়ে কত মানববাদী মানুষকে লাঞ্ছিত ও নিহত হতে হয়েছে, তার হিসেব নেই।

সনাতনী প্রতিবেশে যারা সুখে ও স্বচ্ছন্দে থাকে, তারাই নতুন চিন্তার ও নতুন কথার বৈরী। গৃহপতি ও সমাজপতি, শাস্ত্রধর ও দণ্ডধরেরাই নিজেদের নিরাপদ নিশ্চিন্ত নির্বিঘ্ন জীবনের ও জীবিকার বিঘ্ন স্রষ্টারূপে লাঞ্ছিত ও নিহত করেছে নতুন চিন্তার জনককে। নয়া চিন্তার ধারক, বাহক ও কথকরাও নিষ্কৃতি পায় নি। তবু চিন্তাবিদ্‌কে হত্যা করে কিংবা ধারক বাহককে খতম করে চিন্তার বীজ নির্মূল করা যায়নি। সে বীজ দূর্বার মতো দুর্বার হয়েই বিশ্বময় ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছে। সে বীজ রক্তবীজ হয়ে তৈরী করেছে অসংখ্য মন। বায়ুর মতো প্রবিষ্ট হয়েছে অগণ্য বুকে, সাড়া জাগিয়েছে মুমূর্ষু প্রাণে। তবু উচ্চারিত চিন্তার যে মৃত্যু নেই, বরং তার প্রসার ও বিবর্তন আছে, —এ সত্য আজো স্বার্থ-সচেতন লোভী মানুষ গায়ের জোরেই অস্বীকার করে। এবং ঐ ঔদ্ধত্যের পরিণাম যে কখনো শুভ হয়নি, এ উপলব্ধিও লিপ্সাবশে ভুলে থাকতে চায়। তাই আজো জীবনে, সমাজে, ধর্মে, রাষ্ট্রে কোথাও স্বাধীন চিন্তা ও মত প্রকাশের ও প্রচারের অবাধ অধিকার স্বীকৃতি পায় না।

আগের যুগের যে-সব নিষিদ্ধ চিন্তা ও নীতি আজকের মানুষের দুঃখ-যন্ত্রণা ঘুচিয়েছে, সেগুলোর গুরুত্ব-চেতনা ও কল্যাণকরতা আজকের মানুষকে তাদের পূর্বপুরুষ—সেদিনকার গোঁড়া মানুষদেরকে অবজ্ঞা ও উপহাস করতে শেখায়। অথচ তারাই আবার ভবিষ্যতের মানুষের কল্যাণার্থে নতুন চিন্তার উদ্ভব ও লালন সহ্য করে না। অতীতের যে-মানুষের নির্বুদ্ধিতায় ও রক্ষণশীলতায় তারা বিস্মিত ও বিক্ষুব্ধ, তারা নিজেরা অতীতের নিষিদ্ধ চিন্তার প্রসাদভোগী হয়েও অবিকল সেই মানুষের মতোই আচরণ করে। ফলে আজো নতুন চিন্তার জন্ম, লালন, পোষণ, প্রকাশ ও প্রচারের জন্যে বহুকাল ধরে বহু মানবের ত্যাগ, নির্যাতন, নিধন বরণ আবশ্যিক হয়েই রয়েছে। কারণ দুনিয়ায় লিপ্সু ভোগী মানুষের সংখ্যাই সর্বাধিক। সুযোগ-সুবিধাকামী ও লাভ-লোভী মানুষ বিবেক-বুদ্ধির আনুগত্য করে না, তারা আপাত-লভ্য বা লব্ধ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও সম্পদ-সাচ্ছল্যের অনুগত হয়। তাই তারা সনাতনী ও স্থিতিকামী। পরিবর্তনকে তারা বিপর্যয় বলে মানে, তাই তারা নতুন, ভীরু ও প্রাচীন-প্রিয়। তারা আবর্তনকে নিয়ম ও নিয়তি বলে জানে, তাই বিবর্তনকে ভয় করে। তাই, তারা যা আছে, তাই নিয়ে কাড়াকাড়ি ও হানাহানি করে, যা নেই, তা পাবার প্রয়াস করে না, পেয়ে দুঃখ ঘুচাবার বাসনা রাখে না।

এরও কারণ মানুষও আর দশটি প্রাণীর মতো স্বভাবেই বেড়ে উঠে। মন-মানসের অনুশীলনে ও পরিচর্যায় প্রাণিশ্রেষ্ঠ যুক্তিবাদী বিবেক চালিত মানুষ হয়ে উঠবার জন্যে সচেতন প্রয়াস করে না। কাজেই রিপু-তাড়িত মানুষে সর্বজনীন শ্রেয়স্কর কিছু প্রত্যাশা করাই বিড়ম্বনাকে বরণ করার নামান্তর মাত্র।

রাষ্ট্রিক স্বাধীনতাকে মানুষ তাই অকারণে অমূল্য সম্পদ বলে মানে। নিরবধি কাল পরিসরে কখনো কখনো কোথাও কোথাও বিদেশী-বিজাতি-বিধর্মী-বিভাষীর শাসন কায়েম থাকলেও স্বদেশী স্বজাতি স্বধর্মী স্ব-ভাষী, স্বদলের ও স্বমতের লোক-শাসিত রাজ্য-রাষ্ট্র বিশ্বে কখনো বিরল ছিল না। তাই বলে মানুষ যে স্বাধীন স্ব-রাষ্ট্রে সুখে-স্বচ্ছন্দে, নির্দ্বন্দ্বে নির্ভয়ে বাস করতে পেরেছে, তেমন কথা ইতিহাস বলে না।

কারণ স্বাধীনতা স্বয়ং সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য নয়—সুখ, শান্তি, আনন্দ, আরাম অর্জনের উপায় মাত্র। স্বাধীনতার পুঁজি প্রয়োগে ঐ সব কাম্য সম্পদ অর্জন করতে হয়। দায়িত্ব জ্ঞান, কর্তব্য বুদ্ধি ও অধিকার-চেতনার উদ্ভব ঘটিয়ে সেই বোধগত জীবনের বিকাশ-প্রসার কামনায় উদ্যোগী মানুষই কেবল দায়িত্ব পালনে, কর্তব্য সম্পাদনে এবং অধিকার অর্জনে ও রক্ষণে সমর্থ। ঐ সব গুণের উন্মেষ ও বিকাশ সাধনের জন্যে ব্যক্তি-জীবনেও আত্মদ্রোহমূলক সংগ্রাম প্রয়োজন। সে সংগ্রামে জয়ী হয়ে আত্ম-বিধ্বংসী রিপুকে বশ করতে হয়, তা হলেই স্বাধীনতার প্রসাদ, লাবণ্য ও শ্রী নিজের আয়ত্তে আসে।

অবশ্য ব্যক্তিমানুষের অধীনতার সীমা-সংখ্যা-মাত্রা নেই। ব্যক্তিমানুষ স্বভাবতই হাজারো বাঁধনে বদ্ধ। সে মনের অধীন, মেজাজের বশ। সে বিশ্বাসের পুতুল, সংস্কারের পিঞ্জর। সে লোভের বশ, ক্ষোভের শিকার। সে ঈর্ষার দাস, হিংসার পোষ্য ও ঘৃণার অনুগত। সে কামে আসক্ত, মোহে মুগ্ধ। সে মদে মত্ত, মাৎসর্যে অন্ধ। সে লিপ্সা-তাড়িত ও লাভ-চালিত। সে ভয়ে ভীত, ত্রাসে ত্রস্ত এবং শঙ্কায় শঙ্কিত। সে লজ্জা-ভীরু ও ক্ষতি-কাতর। সে শাস্ত্রোক্ত পাপ-ভীরু, সে সামাজিক জীবনে নিন্দা-ভীরু; সে রাষ্ট্র-নির্দিষ্ট শাস্তি-ভীরু। সে রীতির বন্দী, নীতির অনুগত ও শরমে সংকুচিত। বন্দিত্ব, দাসত্ব ও দুর্বলতা রয়েছে তার দেহের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়িয়ে, রক্তে মাংসে জড়িয়ে। তাই সে স্বাধীন হতে পারেনা। কেননা কোন বন্ধন—তা 'নৈতিক, সামাজিক, রাষ্ট্রিক কিংবা বিশ্বাস-সংস্কার-শরম-সংকোচের' হোক, অথবা রুচি-আদর্শের হোক, তার থাকেই। এমন মানুষ কখনো গতানুগতিকতা পরিহার করে নতুন ভাব-চিন্তা-কর্মের অনুগামী হতে পারেনা। সযত্ন অনুশীলনে-পরিশীলনে-পরিচর্যায় ঐ সব বৃত্তি-প্রবৃত্তি দমন ও নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। যারা অবহেলাপরায়ণ, যারা আত্ম-দর্শনে অক্ষম, আত্ম-জিজ্ঞাসায় অসমর্থ, তাদের নাগরিক স্বাধীনতা আত্ম-কল্যাণে প্রয়োগ-মাত্রই তা সামাজিক-রাষ্ট্রিক অকল্যাণের নিমিত্ত হয়ে উঠে।

সদাচারী মানববাদীর চিন্তা ও কর্ম সব সময়েই সামষ্টিক কল্যাণমুখী, তাই তারা মানব হিত-কল্পে নতুন করে ভাব, চিন্তা ও কর্ম উদ্ভাবনে

নিষ্ঠ। মানুষের বৈষয়িক ও মানসিক উন্নয়ন উৎকর্ষ ওঁদেরই দান। জগতে চিরকাল ওঁদের সংখ্যা নগণ্য। জনবল ও গণসমর্থনের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে স্বার্থবাজ দুরাত্মারা তাঁদেরকে লাঞ্ছিত ও নিহত করে তাঁদের বাণী স্তব্ধ করে দেয়ার প্রয়াস পায়। চিন্তাবিদ মরে, কিন্তু উচ্চারিত বাণী মরে না। কৃতকর্মও তার প্রভাব রেখে যায়। তাই তার ক্রিয়া মনুষ্য মনে ও সমাজে অদৃশ্যে মন্থর ভাবে গভীর ও ব্যাপক হতে থাকে। একদিন সে-চিন্তা অধিকাংশকে আচ্ছন্ন করে এবং এমনি করেই নিষিদ্ধ চিন্তা স্বীকৃত তত্ত্ব, প্রমাণিত তথ্য ও গৃহীত সিদ্ধান্ত রূপে সমাজে, ধর্মে ও রাষ্ট্রে স্থিতি পায়। নির্বোধ গোঁড়া মানুষের ঔদ্ধত্যের জন্যেই মানব-মনীষা যুগে যুগে অপচিত হয়েছে ও হচ্ছে। তাই মনুষ্য-আরোপিত মানব দুর্ভোগ আজো অবসিত হয় নি। মনুষ্য সভ্যতা-সংস্কৃতি ও মানব-মনীষা অগ্রসর হয়নি আনুপাতিক হারে। অতএব, রাষ্ট্রিক স্বাধীনতার প্রসাদ পেতে হলে আগে বুনো মন-মেজাজকে পরিশীলিত বিবেকের অনুগত করতে হবে। তা হলেই দেশের মানুষ স্বাধীনতা-প্রসূত সুখ-সমৃদ্ধি লাভ করতে পারবে এবং তা উপভোগের যথার্থ যোগ্য হবে। ন'ইলে স্বাধীনতা তাৎপর্যহীন বুলি হয়েই থাকে। অন্ধ যেমন দিবা-রাত্রি বোধবিরহী, তেমনি বিবেকের প্রভাব মুক্ত মানুষও হিতাহিত বোধ বিহীন।

স্বাধীন রাষ্ট্রের নাগরিককে অবশ্যই মুক্তিকামী হতে হবে। সে মুক্তি চাইবে অশিক্ষা থেকে, সংস্কার থেকে, অন্ধতা থেকে, অজ্ঞতা থেকে, অকল্যাণ থেকে, লিপ্সা থেকে, স্বার্থপরতা থেকে, অনুদারতা থেকে, অতীত-প্রীতি থেকে, স্থিতির মোহ থেকে। তা হলেই কেবল সরকার ও সাধারণ মানুষ কল্যাণকর নতুন ভাব-চিন্তা-কর্ম—সহ্য করার, গ্রহণ করার যোগ্য হবে। এবং তেমনি অবস্থাতেই কেবল ব্যক্তিজীবনে মর্যাদা ও স্বাতন্ত্র্য, সামাজিক জীবনে সাম্য ও স্বাধীনতা, সাংস্কৃতিক জীবনে সংস্কার-মুক্তি ও গ্রহণশীলতা, আর্থিক জীবনে সমসুযোগ ও সুবিচার, রাষ্ট্রিক জীবনে দায়িত্ব-চেতনা ও অধিকার-বোধ, নাগরিক জীবনে পরমতসহিষ্ণুতা ও সৌজন্য প্রভৃতি কাম্য বস্তু অর্জন সম্ভব হবে। এর জন্যেও নাগরিকের নতুন ভাব-চিন্তা-কর্মের অধিকার স্বীকৃত হওয়া আবশ্যিক। চিন্তা করবার, চিন্তা প্রকাশ করবার এবং প্রচার

করবার অবাধ অধিকার যেখানে নেই, সেখানে রাষ্ট্রিক স্বাধীনতা থাকা না থাকা সমান। কেননা বদ্ধকূপের জিয়ল মাছ হয়ে বাঁচা মনুষ্যস্বভাব নয়। তার চোখ সুমুখে, তার পায়ের পাতা সামনে, তাই তার গতিও সামনের দিকে। তার জীবনও তাই চলমান। কৃত্রিম উপায়ে গতি থামিয়ে দিলে তার জীবনও লক্ষ্যচ্যুত এবং তাৎপর্যহীন হয়ে পড়ে। জীবনে চলমানতা আসে নতুন চিন্তার প্রভাবে ও নিয়ন্ত্রণে, নতুন অনুভবের প্রেরণায় এবং নতুন কর্মের উদ্যমে। সেই প্রেরণার উৎসমুখ বন্ধ করে দিলে বন্ধ্যা জীবন বিকৃত-বিশুষ্ক হয়ে বিড়ম্বিত হয়। সমকালীন ও ভাবী মানুষের এত বড় ক্ষতি আর কিছুতেই হয়না।

ইতিহাস-তত্ত্ব

মানুষের চিন্তা-ভাবনার কিংবা কর্মপ্রয়াসের উন্মেষ ও ক্রমবিকাশের বা ক্রমবিবর্তন ধারার তথ্যই ইতিহাস। এ দৃষ্টিতে মানব অভিব্যক্তির সব-কিছুরই ইতিহাস তথা ইতিবৃত্ত রয়েছে। এমনকি জগৎ সৃষ্টির এবং প্রকৃতির পুষ্টি ও বিবর্তনধারার ইতিহাসও আছে। কিন্তু আগের কালের মানুষের ইতিহাস সম্বন্ধে এই ব্যাপক ধারণা ছিল না। তাই আদিকালে মানুষ দেও-দেবতার কাল্পনিক ইতিবৃত্ত তৈরী করেছে। এবং সামন্তযুগে তারা রাজরাজড়ার সন্ধিবিগ্রহ ও জয়-পরাজয়ের কাহিনীকেই কেবল ইতিহাস বলে মানত। সামাজিক মানুষের সামগ্রিক জীবন প্রবাহই যে ইতিহাসের উপাদান ও উপকরণ, সে-বোধ জাগতে সময় লেগেছে কয়েক হাজার বছর। তারপর আধুনিক যুগে সর্বপ্রকার মানব অভিব্যক্তিকেই ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত করবার গরজ মানুষের বোধগত হয়। কেননা, ইতিহাস জানা মানার জন্যে নয়, প্রতিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে মানব-স্বভাব বোঝার জন্যে, শ্রেয়সকে আবিষ্কার করার জন্যেই। এর ফলে এযুগে কেবল দেশ-কাল-সমাজেরই ইতিহাস রচিত হয় না, জ্ঞান-বিজ্ঞানের, ধর্মদর্শনের, ভাবচিন্তার কিংবা কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য প্রভৃতি সর্বপ্রকার মানবিক প্রয়াসেরই ইতিবৃত্ত রচিত হচ্ছে। কিন্তু ইদানীং পূর্বযুগ অবধি মানুষ রাজরাজড়ার কাহিনী-মুখ্য ইতিহাসকে প্রেরণার উৎস বলে জানত। এই মারাত্মক ভুল ধারণার বশে দেশে দেশে মানুষ জাতীয় কিংবা স্থানীয় ইতিহাস বিকৃত তথ্যে পূর্ণ করে গৌরব-গর্বের আকর করবার চেষ্টা করেছে। ফলে সত্যসন্ধ মানুষের কাছে ইতিহাস 'legends agreed upon' বলে নিন্দিত ও অবজ্ঞাত হয়েছে।

ইতিহাস কিংবা ঐতিহ্য কখনো প্রেরণার উৎস হতে পারে না, যদি তাই-ই হত, তবে গ্রীস-রোম-পারস্যের পতন হত না। এবং ইতিহাস বা ঐতিহ্যের অভাবে দুনিয়ায় কোন নতুন সভ্যতা-শক্তির উন্মেষও ঘটতে পারত না।

প্রেরণার আকর হিসেবে ইতিহাস তৈরী করতে যেয়ে মানুষ কেবল আত্মস্বার্থে ও স্বপ্রয়োজনে তথ্যের বিকৃতি ঘটিয়েছে আর কামনা করেছে ঘটনার ও পরিণামের পুনরাবৃত্তি। কিন্তু তাদের সে-বাঞ্ছা কোনদিন সফল হয়নি। কেননা সত্য অতিরঞ্জিত হয়ে মিথ্যায় পরিণত হয় এবং বানানো তথ্য লোকপ্রিয় হলেও সত্য হয় না। কাজেই প্রতিজ্ঞা (Promise) যদি ভুল হয়, সিদ্ধান্ত (Inference) অসার অসত্য হতে বাধ্য। স্বার্থবশে এতোকাল মানুষ দেদার মিথ্যার বেসাতি করেছে, তাই ইতিহাস-পাঠ ফলপ্রসূ হয়নি। বরং ইতিহাস-পাঠে উত্তেজিত মানুষ কখনো কখনো কোথাও কোথাও ক্রোধবহ্নি ও অসূয়াবিষ ছড়িয়ে বৈনাশিক উল্লাসে মত্ত হয়েছে। তাই আজ অবধি মানুষের রাজনৈতিক ইতিহাস রিপুপরবশ মানুষের রক্তস্নানের ইতিকথারই নামান্তর মাত্র। আসলে ইতিহাস প্রেরণার উৎস নয়—প্রজ্ঞার আকর। ঘটনার ও পরিণামের পুনরাবৃত্তি ঘটানোর জন্যে নয় বরং তা এড়াবার জন্যেই ইতিহাস রচন ও পঠন প্রয়োজন। ইতিহাস-চেতনা জীবনে আবর্তন কামনা করে না, বিবর্তন ও অগ্রগতিই বাঞ্ছা করে। মানুষের জীবিকাগত ও রিপুগত দ্বন্দ্ব সংঘাতের কারণ নিরূপণ এবং মনুষ্য-স্বভাব সম্পর্কে সতর্কতার ও তার সংশোধনের এবং তার উৎকর্ষের ও উন্নয়নের বুদ্ধি ও পন্থা লাভ লক্ষ্যেই ইতিহাসের রচন ও পঠন নিয়ন্ত্রিত হওয়া কাম্য। এই বোধের অনুগত হয়েই আজকের জ্ঞানী মনীষীরা ইতিহাসকে 'বিজ্ঞান' রূপে গ্রহণ করেছেন এবং দেশকালগত মানুষের সামগ্রিক জীবন জিজ্ঞাসা, জীবিকা প্রয়াস ও জীবন প্রবাহগত আনন্দ ও যন্ত্রণাকে এবং সম্পদ ও সমস্যাকে ইতিহাসের অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। তাই আজকের ইতিহাস কেবল তথ্যের সংকলন নয়, শুধু লাভ ক্ষতির পরিসংখ্যানও নয়, এমনকি ভূত-ভবিষ্যতের তৌলে মূল্যায়নও নয়, বিশ্বমানবিক সমস্যার আলোকে আন্তর্জাতিক কার্য-কারণ সূত্রের নিরিখে বিশ্লেষণাত্মক সিদ্ধান্তও।

অতএব, এ যুগের কোন আঞ্চলিক ইতিহাসও বিশ্ব-বিচ্ছিন্ন তথ্যের আকর হিসেবে অবাঞ্ছিত—একে বিশ্বসংলগ্ন হতেই হবে। আজকের সংহত বিশ্বে মানুষের ব্যক্তিক চিন্তা এবং কর্মও আপেক্ষিক।

আজ তাই ইতিহাস রচকের বা পাঠকের কেবল ইতিহাসজ্ঞ হলেই

চলবে না। তাঁকে আনুষঙ্গিক তথা প্রাসঙ্গিক বিষয়েও অবহিত থাকতে হবে। কেবল সত্যসন্ধ ও তথ্যপ্রিয় হলেই ইতিহাস পড়ার বা লেখার যোগ্যতা বর্তাবে না, সে সঙ্গে তাঁকে দেশকালগত সামাজিক, ধার্মিক, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, আর্থিক, প্রশাসনিক চিন্তা-চেতনা এবং লৌকিক বিশ্বাস-সংস্কার ও নৈতিক নিয়ম-রেওয়াজ সম্পর্কেও সচেতন থাকতে হবে। এক কথায় সামগ্রিক জীবন প্রবাহের পটভূমিকায় সত্যসন্ধ তথ্যনিষ্ঠ প্রজ্ঞাবান ও কারণ-করণ বিশ্লেষণ-বুদ্ধি সম্পন্ন বিদ্বানই কেবল ইতিহাস রচনার ও আলোচনার যোগ্য। তেমন মানুষই শুধু ইতিহাস পাঠের ফলশ্রুতি মানবিক সমস্যার সমাধানে সুপ্রয়োগ করতে পারেন।

দেশের ইতিহাস-প্রিয় ও ইতিহাসবেত্তা জ্ঞানী-মনীষীরা নিজেদের উদ্যোগে ও যোগ্য নেতৃত্বে আমাদের দেশের প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগের বিস্মৃত, অর্ধ-বিস্মৃত, বিকৃত ও বিশৃংখল ইতিহাসের আলো-আঁধারি ঘুচাবেন, অপসারিত করবেন আমাদের বিভ্রান্তি ও বিমূঢ়তা এবং ইতিহাস-বিজ্ঞান ও ইতিহাস-দর্শন প্রয়োগে সুপরিকল্পিতভাবে সামগ্রিক সুসংবদ্ধ ও সুবিন্যস্ত জীবন প্রবাহের বিশ্লেষণমূলক যুগোপযোগী দৈশিক ইতিহাস রচনায় ব্রতী হবেন, তাঁদের কাছে এইটি আমাদের প্রত্যাশা নয় কেবল, দেশের গণমানবের স্বার্থে জাতীয় জীবনের স্বরূপ উপলব্ধির প্রয়োজনে আমাদের দাবিও। আজকের দিনে মানবিক সমস্যার সমাধানের জন্যেই, বিশ্বমানবের সহাবস্থান, সহযোগিতা ও সর্বাত্মক কল্যাণের জন্যেই যথার্থ ইতিহাস-চেতনার বড় প্রয়োজন।

জাতীয় জীবনে সংস্কৃতি ও কীর্তি সাফল্যের চিহ্ন এবং গৌরব-গর্বের অবলম্বন বলে ঐতিহ্য হিসেবে স্মরণীয় হয়ে থাকে কিন্তু জাতির নৈতিক ও চারিত্রিক দুর্বলতার কথাও স্মরণে না রাখলে কেবল গৌরব-গর্বের আস্ফালনের মধ্যে শক্তি ও প্রেরণা পাওয়া যায় না, ফাঁকি দিয়ে অন্যকে প্রতারিত করা গেলেও নিজেকে প্রতারণা করা চলে না। নিজের শক্তি ও দুর্বলতা সম্বন্ধে সচেতন না থাকলে আত্মোপলব্ধি ও আত্মপ্রত্যয় অকৃত্রিম হয় না, তাতে চোরাবালির উপর পা রাখার মতো জাতীয় জীবনে সঙ্কট ও সম্ভাবনার মুহূর্তে বিড়ম্বনার, বিপর্যয়ের ও অসাফল্যের শিকার হতে হয়। এই জন্যেই নবজাগ্রত স্বাধীন জাতি হিসেবে স্বদেশের

মাটি ও মানুষের প্রকৃত পরিচয় তার বক্র ও বিচিত্র বিকাশ ও বিবর্তন ধারার ইতিকথা জানা ও জানানো আবশ্যিক।

এই ইতিহাসই দেবে জাতিকে প্রজ্ঞা দৃষ্টি, দেবে আঁধার পথে আলোক-বর্তিকার মতোই নির্ভুল পথের দিশা। ইতিহাসে লভ্য প্রজ্ঞাই হবে জন ও জাতীয় জীবনের পাথেয়। আগের যুগে এবং এখনো অনেক দেশে শাস্ত্র, সমাজ ও সরকারের আপাত স্বার্থে ইতিহাসের ঘটনা ও পরিণামকে বিকৃত করার রেওয়াজ চালু ছিল ও রয়েছে, কিন্তু এ বৃথা প্রয়াসের ফল কখনো ভাল হয়নি। মহাকালের অমোঘ নিয়মেই শেষ অবধি সত্যকে মিথ্যার আবরণে গোপন করা যায়নি। আমরা আশা করব আমাদের দেশেও সমকালীন তথা বর্তমানের ইতিহাস রচনায় কোন সরকারী বাধা থাকবে না।

জিগির তত্ত্ব

জীবনের সর্বপ্রকার চেতনা জীবন-চাহিদা থেকেই যে উদ্ভূত, তা গোড়াতেই স্বীকার না করলে জীবন ও জগৎ-ভাবনা সম্পর্কে সর্বপ্রকার ধারণা ও সিদ্ধান্ত ভুল হতে বাধ্য।

মানুষ আত্মকল্যাণেই প্রতিবেশ-উদ্ভূত সর্বপ্রকার সমস্যার ও অভাবের আপাত সমাধান ও পূরণ প্রত্যাশা করে এবং সে-ভাবেই জীবন-যন্ত্রণার আশু উপশম কামনা করে। গণপতি ও দলপতিরা তাই লোক-মনোরঞ্জক বুলি ও জিগির তুলে জনমত ও গণশক্তিকে সংহত ও সুনিয়ন্ত্রিত করে উদ্ভূত সমস্যার আপাত সমাধান দিয়ে নিশ্চিন্ত হন। এবং আত্মম্ভর নেতা তাঁর মানস-প্রসূনকে চিরন্তন তত্ত্ব ও জীবন-সত্যের মর্যাদাদানে থাকেন উৎসুক। তাই কালান্তরেও বিভ্রান্ত জনতা মানসদ্বন্দ্বে ও বিমূঢ়তায় ভোগে।

ভারতের ইতিহাস থেকেই দু'চারটি দৃষ্টান্ত নেয়া যাক। মারাঠা অভ্যুত্থানে শঙ্কিত ও ঈর্ষান্বিত মুসলিম রাজন্য স্ব-স্বার্থেই একদিন আহমদ শাহ্ আবদালীর সহযোগিতা করেছিলেন। আপাতদৃষ্টিতে একে মুসলিম সংহতির নিদর্শন বলে ভুল করা সম্ভব। কিন্তু পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধের পরিণামে সুবিধে হল কেবল ব্রিটিশেরই। আত্মবিনাশী ঐ যুদ্ধের পরে হীনবল রাজন্য আত্মরক্ষার শেষ উপায় হিসেবে স্বদেশ, স্বধর্মী ও স্ব-জাতির স্বার্থ উপেক্ষা করে আত্মকল্যাণে ইংরেজ-ফরাসীর আশ্রয় ও প্রশ্রয় কামনা করে ত্বরান্বিত করেন নিজেদেরই বিনাশ। স্ব স্ব অস্তিত্ব রক্ষার প্রশ্নে কেউ তখন পারস্পরিক সমঝোতা কিংবা আপসের কথা চিন্তা করেননি। স্বদেশ-স্বধর্মী প্রীতিও গেল উবে। আবার উনিশ শতকে ব্রিটিশ প্রজা হিন্দু ও মুসলমান প্রথমে স্ব স্ব শাস্ত্রানুগত জীবনে চিত্তশুদ্ধির মাধ্যমে আত্মকল্যাণ কামনা করেছে। ফকির-সন্ন্যাসী-আর্যসমাজী-ব্রাহ্ম-ওহাবী-বিশ্বমুসলিম ভ্রাতৃত্ববাদ প্রভৃতি আন্দোলন তার সাক্ষ্য।

তারপর ব্রিটিশ রাজত্বে অভিন্ন শাসকের বিরুদ্ধে যখন সমস্বার্থে একত্রিত ও ঐক্যবদ্ধ হবার প্রয়োজন হল, তখন কিন্তু খাইবার পাস থেকে সিঙ্গাপুর

অবধি বিস্তৃত ভুবনে জাত, বর্ণ, ধর্ম, গোত্র, ভাষা প্রভৃতি কিছুই যেন সংহতির পথে বাধা হয়ে নেই। তখন কেবল একটি জিগির—"বিদেশী তাড়াও।" আরও পরে যখন শিক্ষালব্ধ চেতনা একটু গাঢ় হল, তখন আঞ্চলিক ও সাম্প্রদায়িক স্বার্থ-চেতনা প্রবল হয়ে ওঠে। এই সময়কার জিগির হল—"বিদেশীর সাথে বিধর্মীও তাড়াও।" হিন্দু মহাসভা ও মুসলিম লীগ এ ভূমিকাই নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছে।

তারপর পাকিস্তানে আবার একই আঞ্চলিক স্বার্থে জিগির উঠল—"বিভাষী তাড়াও।" ভারতের দাক্ষিণাত্যে ধ্বনিত হল নূতন জিগির—"হিন্দি হটাও, গোত্রীয় স্বাতন্ত্র্যে গুরুত্ব দাও।" আসামে, বিহারে জিগির উঠল—"বাঙাল খেদাও।" আর অন্য অঞ্চলে দাবি উঠল জাতি-সত্তার স্বাতন্ত্র্যে স্বীকৃতির।

অন্যান্য অঞ্চলেও আঞ্চলিকতা মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। ফলে, এক-কালের অখণ্ড ভারত ও অভিন্ন জাতি-চেতনা গেল মিলিয়ে। আর ঠাঁই নিল গোত্র-চেতনা, আঞ্চলিকতাবোধ, ভাষা-বিদ্বেষ ও স্বাতন্ত্র্য-প্রীতি। পাকিস্তানেও পাকতুন, বালুচ ও সিন্ধির ঐ একই দাবি। সবটাই জাগছে স্বার্থবুদ্ধি থেকে। সব বোধেরই উৎস হচ্ছে শাসন ও শোষণ শঙ্কা। সব প্রেরণার উৎস হচ্ছে লাভের লোভ। তাই পাক-ভারতে একই জিগির—"ভাষাভিত্তিক গোত্রগত রাজ্য চাই।" ভারতে তামিলনাড়ু, অন্ধ্র, কেরালা, হিমাচল, অরুণাচল, মেঘালয়, মিজোল্যাণ্ড, মণিপুর প্রভৃতি এভাবেই গড়ে উঠেছে। তেলাঙ্গান, বিদর্ভ প্রভৃতিও গড়ে উঠবে। পাকিস্তানেও একই সমস্যা।

কাজেই যে-পরিবেশে অভিন্ন জাতীয়তার অঙ্গীকারে অখণ্ড ভারত-চেতনা জেগেছিল, সেই পরিস্থিতির অনুপস্থিতি খণ্ডভারতে অসংখ্য জাতি চেতনা জাগিয়েছে। সম-স্বার্থে সহযোগিতা ও সহাবস্থানের ভিত্তিতে আপস না হলে বিচ্ছিন্নতা হবে অপ্রতিরোধ্য ও অবশ্যম্ভাবী।

ধর্মীয় অভিন্নতা ছিল বলে পাকিস্তানে শোষিত বাঙালীর জিগির ছিল—"বিভাষী হটাও।" তার আনুষঙ্গিক ধ্বনি বা যুক্তি এল—ধর্মবিশ্বাস ব্যতীত বাঙালীর জাতি-বর্ণ, ভাষা-সংস্কৃতি, রীতি-নীতি, আচার-আচরণ প্রভৃতি আর সব কিছুই স্বতন্ত্র। ব্রিটিশ ভারতে এই বাঙালী মুসলিমই

এইসব যুক্তিতে কখনো কান দেয়নি। কিন্তু ভিন্ন পরিবেশে ভাষিক ও গৌত্রিক চেতনায় বাঙালী হল উদ্বুদ্ধ। এ তাৎপর্যে ভারতীয় বাঙালীরা বাঙালী জাতিভুক্ত। কিন্তু স্বাধীনতা-উত্তর কালে আবার রাষ্ট্রিক প্রয়োজনেই, রাষ্ট্রিক জাতীয়তার অঙ্গীকারে জাতীয়তাবোধ সীমিত করা জরুরী হয়ে উঠল। যাঁরা দ্বি-জাতিভিত্তিক পাকিস্তান তত্ত্বটি ভুল বলেই ইদানীং উপলব্ধি করেছেন, তাঁরাও কিন্তু অখণ্ড ভারত আর কামনা করেন না। ধার্মিক দ্বি-জাতি তত্ত্বে আস্থা হারিয়েও তাঁরা ভাষিক জাতি-তত্ত্বে আস্থা রাখেননি। অর্থাৎ স্ব-স্বার্থেই তাঁরা নাম পাল্টে স্বাতন্ত্র্যই কামনা করেন। আগে যা কিছু করেছেন ধর্মের নামে, পরে যা করেছেন ভাষার নামে, তাই এখন রাষ্ট্রের নামে করছেন অর্থাৎ রাষ্ট্রিক জাতি-তত্ত্বের যুক্তিতে স্বতন্ত্র জাতীয়তার অনুগত করছেন জীবনকে। কালান্তরে আজকের পরিবেশে এটি অবশ্যই শুভবুদ্ধিপ্রসূত। কিন্তু স্বার্থপরবশ মানুষের বিবেককে এ অসংগতি পীড়িত করে না। এ ঘন ঘন জিগির বদলানোর বিড়ম্বনা বিচলিত করে না বুদ্ধিকে। অখণ্ড ভারতওয়ালারা যেমন এখন খণ্ড রাষ্ট্রের কামনায় উৎসুক, তেমনি সদ্য স্বাধীন বাঙলাদেশীরাও বিদেশী, বিধর্মী, বিভাষীর অভাবে আঞ্চলিক স্বার্থ ও সুবিধা-সচেতনতার প্রবণতা দেখাচ্ছে।

তার কারণ আসলে আর্থিক লাভ-লোভের ক্ষেত্রে মানুষ চিরকাল এমনি করে সজ্ঞানে কিংবা অবচেতন প্রেরণায় নতুন নতুন আবেগে তাড়িত হয়েছে। এবং তার অনুকূলে যুক্তিজাল রচনা করেছে—উদ্দেশ্য সাধনে ও সাফল্য বাঞ্ছায়। সম্পদ-নির্ভর জীবনে পাথেয়কামী পথিক কিংবা জীবিকা-সন্ধানী জৈব প্রবৃত্তিবশেই, প্রাকৃতিক নিয়মেই জীবনের দাবি স্বীকার করে। এবং উপযোগ-বুদ্ধির প্রয়োগে দ্বান্দ্বিক চেতনার টানাপোড়েনে বিক্ষত হয়েও আপাত প্রয়োজনে সাড়া দেয়। তাই চিরকাল মনুষ্যচিন্তা ও মনুষ্য-আচরণ দ্বন্দ্ব-সংলগ্ন, স্ববিরোধী ও বৈপরিত্যাভিসারী। একারণেই যে-কোন মনুষ্যচিন্তা কালিক ও স্থানিক এবং যুগান্তরে হৃত-উপযোগ আর স্থানান্তরে ও কালান্তরে সমস্যা ও যন্ত্রণার আকর। —কেবল এই প্রত্যয়েই মানুষের ইতিহাসের বিবর্তন ধারায় এবং সামগ্রিক জীবন-প্রবাহের ব্যাখ্যাদান সম্ভব।

অতএব প্রায় জৈবিক প্রয়োজনেই স্থান-কাল-প্রতিবেশের প্রভাবে মানুষ কখনো প্রেমিক, কখনো হিংসুক, কখনো উগ্র, কখনো উদাসীন, কখনো ত্যাগী, কখনো ভোগী, কখনো উদার, কখনো অসহিষ্ণু, কখনো গ্রহণোন্মুখ, কখনো বর্জনশীল; কখনো পোষক, কখনো শোষক। মনুষ্য-মনের ও আচরণের বিকাশ ও বিকৃতি—দু-ই অভিন্ন মূল। দ্বন্দ্ব-মিলন একই স্বার্থের প্রসূন। আজ অবধি জাত, বর্ণ, ধর্ম, গোত্র, শ্রেণী বা স্থানগত যত দ্বন্দ্ব-মিলন ঘটেছে, তার সবটাই জীবিকাগত—এ যুগের পরিভাষায় আর্থিক শোষণ বা পোষণগত। কোন না কোন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অজুহাতে অথবা কোন না কোন সচেতন বা অবচেতন জৈবিক প্ররোচনায় সন্ধি-বিগ্রহ জরুরী হয়েছে। যেমন একসময় 'বন্দে মাতরম' মুসলিম কণ্ঠেও ধ্বনিত হত। তারপরে রাজনৈতিক অভিসন্ধিবশে তা' ঈমানবিরুদ্ধ বলে পরিত্যক্ত হয়। এখন আবার রাষ্ট্রিক প্রয়োজনে দেশ ও দেশ-মাতৃকার বন্দনাগানে বাঙালী মুসলিম মুখর।

অতএব, যে-কোন জিগির বা যে-কোন দ্বন্দ্ব-মিলনের মূলে রয়েছে স্থানিক, কালিক, সামাজিক ও ব্যক্তিক প্রয়োজন ও সাময়িক যৌক্তিকতা। গণমনে আবেগ ও উত্তেজনা সৃষ্টির প্রয়োজনেই তাতে আত্মিক ও আদর্শিক মাহাত্ম্য, মহত্ত্ব ও গুরুত্ব দেয়া হয় মাত্র। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদীর চোখে তাই এগুলো ঐতিহাসিক বিবর্তন বা আবর্তনতত্ত্বরূপে গুরুত্বপূর্ণ হলেও মানব-মহিমার বা মানবিক মূল্য-চেতনার পরিচায়ক নয়। কাজেই স্থায়ী মানবকল্যাণ ও স্থায়ী মূল্যবোধ এতে অনুপস্থিত।

ইতিহাসে তাই আমরা বহু পুরোনো জাতি ও রাজ্যের জন্ম-মৃত্যু প্রত্যক্ষ করি। প্যাগান রোমক জাতি কিংবা হলি রোমান এম্পায়ার কাল-পবনে মিশে গেছে। বাবিল-আসীরীয়-কল্‌ডীয়-কপ্ট কিংবা শক-হুন-কুশান গোত্রের পরিচয় আজ নিশ্চিহ্ন। চোখের সামনে জার্মানী, কোরিয়া, ইন্দোচীন, মালয়, আরবভূখণ্ড খণ্ডিত বা দ্বিখণ্ডিত। আবার নাইজেরিয়া, ফরমোজা, আয়ারল্যাণ্ড, ইথিওপিয়া ও কাশ্মীরের বেলায় অন্য তত্ত্ব, ভিন্ন নীতি ও বিচিত্র যুক্তি স্বীকৃত।

কাজেই স্বার্থে স্বজাতিও শত্রু হয়, স্বদেশীয়ও হয় পর, স্বভাষী কিংবা স্বদেশীও হয় পরিহার্য। ব্যক্তিক, জাতিক কিংবা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে

তাই গরজ ও বিবেকের দ্বন্দ্বে, স্বার্থ ও যুক্তির সংঘাতে, লাভ ও ন্যায়ের মোকাবেলায় সাধারণত সামরিক গরজ, স্বার্থ ও লাভ-লোভেরই জয় হয়।

স্বদেশ থেকেই এবার গরজের দৃষ্টান্ত দেয়া যাক। পাকিস্তানে বাঙলা-ভাষাকে শব্দে, বানানে ও বর্ণে বিকৃত করে এবং রবীন্দ্রনাথকে বিতাড়িত করে বাঙালীর জাতি-চেতনা ভোঁতা করে দেয়ার চেষ্টা হয়েছিল ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণের প্রয়োজনে। এ নীতি নতুন ছিল না। গ্রীক সাম্রাজ্যবাদ কিংবা তারও আগে থেকেই সাম্রাজ্যবাদীরা এ নীতি-নিয়ম চালু করেছিল এবং শাসিতরাও দুর্বলতাবশে চিরকাল তা প্রায়ই মেনে চলেছে। শাসকের ভাষা চিরকালই শাসিতের উপর চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা হয়েছে। এতে কোন কোন শাসিতের দুর্বল ভাষা চিরকালের মতো লোপ পেয়েছে। যেমন লোপ পেয়েছে বাঙালীর গোত্রীয় অষ্ট্রিক ভাষা, যেমন নিশ্চিহ্ন হয়েছে কপ্ট ভাষা, যেমন দেশচ্যুত হয়েছিল হিব্রু ভাষা।

পাকিস্তান আমলে তাই আমাদের জাতিসত্তা অক্ষত রাখার গরজে আমরা রবীন্দ্রাশ্রয় কামনা করেছি। বিদেশী বিভাষীর হামলা এড়ানোর জন্যে রবীন্দ্রদুর্গ ছিল সেদিন প্রায় অভয়শরণ। সেজন্যে আমরা রবীন্দ্রনাথকে বাঙলাদেশে প্রতিষ্ঠিত রাখার সংগ্রামে নেমেছিলাম। আজ স্বাধীন বাংলা-দেশে পরিবর্তিত পরিবেশে আমরা সমাজতন্ত্রের অঙ্গীকারে জীবন শুরু করেছি। এ সময় আমাদের জীবনে ভাববাদী ও অধ্যাত্মসিদ্ধিকামী রবীন্দ্রনাথের প্রভাব আমাদের সামাজিক-বৈষয়িক জীবন-চেতনার ও প্রেরণার প্রতিকূল, অকল্যাণকর এবং প্রগতির পথে বাধাস্বরূপ। তাই রবীন্দ্রনাথকে জানতে ও মানতে হবে ঐতিহ্যরূপে—সম্পদ হিসেবে নয়। আমাদের চেতনায় রবীন্দ্রনাথ আকাশচুম্বী গৌরব-মিনার হয়ে, আত্মার সমুদ্রসম আধার হয়ে, হিমালয়সম দিগন্তবিসারী ঐতিহ্য হয়ে থাকবেন, কিন্তু সমাজবাদীর নিশ্চিত আশ্রয় কিংবা কেজো সম্পদ হয়ে নয়। আগেরও এরকম নজির রয়েছে।

বাঙলাদেশে রবীন্দ্রনাথ হঠাৎ আবির্ভূত নন। ১৮৬১ সনে তাঁর জন্ম। ১৯৪১ সনে তাঁর মৃত্যু। পাকিস্তান তৈরীর প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল ১৯৪০ সনে রবীন্দ্রনাথের সামনেই। ১৯৪৭ সনে প্রতিষ্ঠিত হল পাকিস্তান, তখন রবীন্দ্রসাহিত্য সামনে রেখেই রাম-রবীন্দ্রনাথের সঙ্গ পরিহার করার জন্যে

আন্দোলন-সংগ্রাম করেছিলাম আমরা। আবার ১৯০৫-১১-সনে বঙ্গভঙ্গ উপলক্ষে লিখিত রবীন্দ্রনাথের যে কবিতা প্রবন্ধ গান মুসলমানদের প্রভাবিত করেনি, ষাট-সত্তর বছর পরে তা' প্রেরণার উৎস হয়ে দাঁড়াল কেন—সে-রহস্য বিশ্লেষণ করলেও রবীন্দ্র-প্রাসঙ্গিকতা প্রমাণ করা দুঃসাধ্য হবে। আসলে বিভাষী শোষণে বিক্ষুব্ধ আমরা ভাষিক বা আঞ্চলিক জাতীয়তা-বোধে অনুপ্রাণিত হয়েই মনের ও বাঞ্ছার প্রতিচ্ছবি আবিষ্কার করেছি রবীন্দ্র-বাণীতে। যেমন এ সময় নিজেদের মনের কথা খুঁজে পেয়েছি জীবনানন্দ দাসের কবিতায়। তা ছাড়া সমাজবাদ অঙ্গীকার করে যে-স্বাধীনতা সংগ্রামের শুরু, তাতে রবীন্দ্র-প্রভাবই প্রবল ছিল বললে স্ববিরোধিতা প্রকট হয়ে উঠে। কারণ রবীন্দ্রনাথ সমাজতন্ত্রী ছিলেন না, রবীন্দ্রপ্রভাব স্বীকার করে মানুষ শাস্ত্রীয় সমাজের অনুগত হয়, আর্থনীতিক সমাজ কামনা করে না।

আজকের দিনে আমাদের সামনে এমনি বাধা আরও রয়েছে, তার মধ্যে ব্রিটিশ আমলের 'উপমহাদেশীয়' ধারণা অন্যতম। দেশী মুসলমানরা যেমন প্যান-ইসলামের মোহবশে আরব-ইরানের সীমা অতিক্রম করে স্বদেশের মাটিতে মানসপ্রতিষ্ঠা পায়নি, স্বঘরে চিরকাল ছিন্নমূল প্রবাসীর বিড়ম্বিত জীবন যাপন করেছে, তেমনি বাঙালীরাও দু'হাজার বছর ধরে উত্তর ভারতকেই তার শ্রেয়সের আকর বলে জেনেছে। ফলে সে কখনো স্বভূমে স্বস্থ হতে পায়নি। তার ঐ মিথ্যা জাতিত্ব-চেতনা তার পক্ষে কখনো কল্যাণকর হয়নি, মরীচিকা-প্রবঞ্চিতের বিড়ম্বনাই কেবল সে পেয়েছে। বাঙলাদেশ যে ভৌগোলিক অবস্থানে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্তর্গত, তা আজ আত্মকল্যাণেই স্বীকৃত হওয়া জরুরী। আমাদের সামাজিক-বৈষয়িক-আর্থিক-রাজনৈতিক কারণেও তা আবশ্যিক হয়ে উঠেছে। সুদূর অতীতেও বাঙালীরা ঐ দক্ষিণ-পূর্ব দিকেই আত্মকল্যাণ খুঁজেছে। আত্মবিকাশ ও বিস্তার কামনা করেছে ব্রহ্মদেশে-শ্যামে-মালয়ে শ্রীবিজয়ে বা ইন্দোনেশিয়ায়। অস্ট্রিক্‌রা বাঙলায় একদিন এসেওছিল ঐ পথ ধরেই। উত্তর-পশ্চিম ভারত বা এশিয়ার সঙ্গে আমাদের ধর্মীয়, প্রশাসনিক ও সাংস্কৃতিক যোগ চিরকালের বটে, সে ঐতিহ্য-চেতনা ও সংযোগসূত্র বৈষয়িক-রাজনৈতিক জীবনে আমাদের পক্ষে কখনো কল্যাণকর হয়নি। আমাদের জাতিসত্তা

সেই মোহবশে কখনো স্বতন্ত্র বিকাশের সুযোগ পায়নি। উত্তর-পশ্চিম এশিয়া আজ আমাদের আর কিছুই দিতে পারে না। বর্ধিষ্ণু জনতার এই দেশের স্বাতন্ত্র্য রক্ষার গরজে, এই দেশের মানুষের বেঁচে-বর্তে থাকার প্রয়োজনেই আমাদের মুসলিম আরব-ইরান মোহের মতো উপমহাদেশীয় জাতিত্ব ও অভিন্ন সত্তামোহ ত্যাগ করতেই হবে। সে-সুবুদ্ধি যত দ্রুত জাগে ততই মঙ্গল। প্রশ্ন উঠতে পারে নামে কি আসে যায়!

দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা চলে—নাম বদলের পরিণামও মারাত্মক কিংবা শুভঙ্কর হতে পারে। যেমন, ব্রিটিশ শাসনকে কেউ কখনো খ্রীষ্টান শাসন বলেনি, কিন্তু ইংরেজ আমলে তুর্কী-মুঘল শাসনকে মুসলিম শাসন বলে চিহ্নিত করার ফলেই হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক বিষময় হয়ে অনেক দুর্ভোগ ও রক্তস্নানের কারণ হয়েছে। তুর্কী-মুঘল নাম ব্যবহৃত হলে ওদের নিন্দা-কলঙ্ক দেশী মুসলিমের গায়ে লাগত না, হিন্দুরাও প্রতিবেশীর প্রতি প্রতিহিংসাপরায়ণ হত না, ব্রিটিশ আমলের পরে যেমন হইনি দেশী খ্রীষ্টানের প্রতি।

গোড়ায় গলদ

জীবন সম্পর্কে শ্রেয়স্কর মতবাদই ধর্ম। এবং এই মতবাদের তাত্ত্বিক ও আচারিক নির্দেশাবলীই হচ্ছে শাস্ত্র। কাজেই ধার্মিক মাত্রই সজ্জন হওয়ার কথা। কিন্তু বাস্তবে তাকে তেমন দেখিনে কেন? ধর্মবোধ যখন একটা মতবাদ, বোধ-বুদ্ধিই তার ভিত্তি হওয়া উচিত এবং আচারও শ্রেয়স্কর সচেতন লক্ষ্যে নিয়ন্ত্রিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কিন্তু মানুষের ধর্মাচার দেখে শেখা এবং ধর্মবোধও শুনে পাওয়া সংস্কার মাত্র। ক্বচিৎ কারো জীবনে ধর্মবোধ সাধনালব্ধ। ফলে অনুকৃত আচার ও শুনে-জানা তত্ত্ব ও জ্ঞান শৈবালের মতো কেবল বোধ-বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে রাখে। তাই আমাদের পরিচিত ধার্মিক মানুষ মাত্রই এক এক জন তোতাপাখি কিংবা কলের পুতুল। এই যান্ত্রিক মানুষ সমাজের সম্পদ নয়, সমাজের জগদ্দল পাথর। সমাজে তার অস্তিত্ব সর্বক্ষণ দৃশ্যমান কিন্তু তার অবদান অদৃশ্য। সমাজে মানুষে মানুষে ব্যবধান সৃষ্টিতে, স্বাতন্ত্র্যরক্ষায়, পুরোনো প্রীতিতে, নতুন ভীতিতে, স্থিতিকামনায়, গতিবিরূপতায় বলতে গেলে তার জুড়ি নেই। এই লক্ষ্যভ্রষ্ট পথিক, তত্ত্ববিচ্যুত মরমী ও রেওয়াজের অনুবর্তী আচারিক সমাজে বোঝা হয়ে, বাধা হয়ে কিন্তু মাকালের রূপ নিয়ে ও সজ্জনের মর্যাদা নিয়ে শোভা পায়। তার বহিরূপ আত্মিক স্বরূপের প্রতিরূপ বলে প্রতিভাত হয়। এই প্রতিভাসিক রূপটাই অকল্যাণের উৎস। কেননা এটিই সাধারণ্যে ধার্মিকতা বলে পরিচিত। তাৎপর্য ও ব্যঞ্জনাবিচ্যুত আচার যে পচা দ্রব্যের মতোই অস্বাস্থ্যকর, তা সাধারণের চোখে কখনো ধরা পড়ে না, বিশেষত, ধার্মিকে যখন নিষ্ঠার অভাব নেই এবং কাপট্য অনুপস্থিত, তখন তাকে অস্বীকার করবার কিংবা তার প্রতি শ্রদ্ধা হারাবার কারণ থাকে না। তার সব নিষ্ঠা, সাধনা ও সদিচ্ছা যে বোধের অভাবে অর্থহীন ও পণ্ড হয়, তা কখনো চক্ষুগ্রাহ্য করার জো নেই। তাই যুগ যুগ ধরে এই বিভ্রান্তি ও বিড়ম্বনা সগৌরবে চালু থাকতে পেরেছে এবং হয়তো চিরকাল পারবে।

যথার্থ ধার্মিক মানুষ মাত্রই পাপী-তাপী-ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে মানুষের বন্ধু ও অভয়শরণ হওয়ার কথা। কিন্তু আমরা তথাকথিত ধার্মিকদের এগুণ দেখিনে। ধার্মিকের দুর্বুদ্ধিপ্রসূত উত্তেজনা দুনিয়াতে মানুষের যত বুকের রক্ত ঝরিয়েছে, এমনটি কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগেও সম্ভব হয়নি। ধার্মিক জিতেন্দ্রিয় হবে, রিপুর প্রভাব সংযত রাখবে—এ-ই মানুষ আশা করে। কিন্তু অভিপ্রেত মানুষ চিরকালই দুর্লভ দুর্লক্ষ্য রয়ে গেছে। ধর্মনীতির তাৎপর্য ও ব্যঞ্জনা উপলব্ধি করবে তেমন মানুষের সংখ্যা সমাজে বৃদ্ধি পাবে তেমন ভরসা পাওয়ার কারণ বড়ো ক্ষীণ। বরং ভরসার ইঙ্গিত রয়েছে অন্যত্র। আজকের দিনে নাস্তিক, সংশয়বাদী ও মানববাদীর সহিষ্ণুতাই মনুষ্যসমাজে নিরাপত্তা ও স্বস্তি দান করেছে। এমন মানুষের সংখ্যাধিক্যেই মানুষের সাম্প্রদায়িক ও সমাজিক জীবনে সুদিন আসবে।

মগ্নচৈতন্যের এক কর্তব্য-বুদ্ধি মানুষকে শাস্ত্রের অনুগত করে। কিন্তু তা জীবনের তাৎপর্য-সচেতনতাবিরহী বলে যান্ত্রিক আচরণে পরিণতি পায়, ফলে তা অনুদারতা, অসহিষ্ণুতা ও ভেদ-বুদ্ধির জন্ম দেয়, ধর্মবুদ্ধির ও শাস্ত্রানুগত্যের এই গোড়ার গলদ মানুষের জীবনের সব বৃহৎ আদর্শ ও সম্ভাবনাকে বীজে বিনষ্ট করে। ধার্মিকের এই ত্রুটি অজ্ঞাত ও অনিচ্ছাকৃত বলেই তা কখনো সংশোধিত কিংবা বিমোচিত হবার নয়। তাই ধার্মিককে আমরা কখনো তার ঈপ্সিত ভূমিকায় ও অভিপ্রেত সত্তায় পাব না। ধার্মিকের মৌল লক্ষ্য—মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ। জীবনকে যথাসাধ্য পুষ্পিত ও ফলবন্ত করাই উদ্দেশ্য। মানুষের সমাজে তার স্থিতি মনুষ্যত্বের আদর্শরূপে। মানুষকে প্রীতিদান ও মানুষের প্রতি অকপট শুভেচ্ছাই তার ধার্মিকতার প্রসাদ। এমনি যথার্থ ধার্মিক সমাজের অভিভাবক এবং নিরাপত্তার ও শান্তি-স্বস্তির প্রহরী আর মনুষ্য-মহিমার প্রতীক। কিন্তু এমন ধার্মিক দুর্লভ। কেননা তারা ধর্মের আচারিক তাৎপর্য ও নির্দেশের ব্যঞ্জনা উপলব্ধি করতে অসমর্থ। তত্ত্ববিরহী আচার এবং আচারবিরহী তত্ত্ব-চেতনা—দু-ই বৃথা ও ব্যর্থ। প্রখ্যাত সাধক সন্ত কবীরের উক্তি এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য ঃ

প্রেমের রঙে মন না রাঙিয়ে কাপড় রাঙাল যোগী
আহার বিহার ত্যাগি তাহার সাজিল নেহাত রোগী।

জীবে'না তুষিয়া, শিবে না ভজিয়া পাথর পূজিল গৃহী
প্রেম না দিয়া দিল ধূপ দীপ, দিল ফলমূল ব্রিহী।

বলেছি, জীবন সম্পর্কে শ্রেয়স্কর মতবাদই ধর্মশাস্ত্র। এই মতবাদ নানা মানুষে নানারূপ। এই বিভিন্নতা সত্ত্বেও ধার্মিকে ধার্মিকে দ্বন্দ্ব হওয়ার কথা নয়। কারণ যথার্থ ধার্মিক প্রেমিক ও সহিষ্ণু না হয়ে পারে না। প্রসন্নদৃষ্টিতে বিধাতার সৃষ্টির বৈচিত্র্য ও আপাত-অসঙ্গতির অন্তর্নিহিত নিগূঢ় তত্ত্ব অনুধাবন ও উপলব্ধির চেষ্টাই হচ্ছে তার সাধনা। বিস্মিত মুগ্ধ আপ্লুত চিত্তে মহিমময় কুশলী বিধাতার প্রতি তার আত্মনিবেদনই তার উপাসনা। বিধাতার সৃষ্টিকে ধার্মিক প্রসন্নদৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করবে—এই প্রত্যাশাই করে মানুষ। সৃষ্টির সবটাই সুন্দর নয়, সুসমঞ্জসও নয়, এতে ভাঙা-মরা-শুকনা-পচা-বন্ধুর সবকিছুই রয়েছে। এই আপাত-অসঙ্গতি ও বৈপরীত্য বৈচিত্র্যের মধ্যে সঙ্গতির সামঞ্জস্যের ও কল্যাণের ইঙ্গিত আবিষ্কারই ধার্মিকের ব্রত ও লক্ষ্য। সমাজে তেমন স্রষ্টা ও সৃষ্টি প্রেমিক ধার্মিকই আবশ্যক। সাম্প্রদায়িক কিংবা দলীয় নেতারূপী শাস্ত্রবিদ ধার্মিক কখনো বাঞ্ছনীয় নয়। ধার্মিকের কাছে মানুষ করুণা ও মৈত্রীর প্রত্যাশী—ঘৃণা-বিদ্বেষ কিংবা পীড়ন নয়; অথচ ধার্মিকরা প্রায়ই অভিভাবক ও শাসকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়াতে উৎসাহী। বিভিন্ন ধর্মমতাবলম্বী হলেও যথার্থ ধার্মিকে ধার্মিকে বিরোধ থাকার কথা নয়, কেন না পথ ভিন্ন হলেও তাদের লক্ষ্য অভিন্ন, গন্তব্য এক। সবাই সেই পরমের কাঙাল,—তাঁর দয়ার ও দানের, তাঁর প্রীতির ও প্রসন্নতার প্রত্যাশী।

পৈশাচিক জিগীষা

মানুষের প্রবৃত্তির গভীরে নিহিত রয়েছে জিগীষা। সেই ভিনি-ভিডি-ভিচির প্রেরণা। আমি জানি, আমি পারি এবং আমি করি—এই গৌরব-গর্ব অর্জনে মানুষ সদা উন্মুখ। আবার জিগীষায় পরমাণুর মতো নিহিত রয়েছে অনন্যতার প্রশংসা প্রাপ্তির লিপ্সা। ঘরে বাইরে পরিবারে সমাজে সর্বত্র নানা ক্ষুদ্র, বৃহৎ, উচ্চ তুচ্ছ কর্মে ও আচরণে মানুষ এই কৃতি-গৌরব প্রশংসা-সম্পদ ও কৃতজ্ঞতা-সুখ-সন্ধানে ঘুরে বেড়ায়। এই সুখ-সম্পদ-গৌরব বিচিত্রভাবে অর্জিত হয় - কখনো প্রীতি দিয়ে, কখনো প্রীতি পেয়ে, এমনিভাবে সোহাগ করে, সোহাগ পেয়ে, কেড়ে নিয়ে, সেধে দিয়ে, আত্মসাৎ করে, আত্মত্যাগ করে, সেবা দিয়ে, সেবা পেয়ে, মার খেয়ে, মার দিয়ে, উপকার করে, অপকার করে, মরে, মেরে, হেরে, জিতে, উদ্দেশ্যভেদে ও স্থান-কাল ব্যক্তির পার্থক্যে, বিভিন্ন সম্পর্কে ও অবস্থায় এবং ভিন্ন ভিন্ন রিপুর প্রবলতায়। সুখ-সম্পদ-গৌরব সম্বন্ধে ধারণাও বহু এবং বিচিত্র। কাজেই জিগীষাও বক্র ও বিচিত্র রূপে মানবমনকে প্রভাবিত করে। বাহ্যত জরু-জমি-জওহর তজ্জাত ধন-মান-যশ প্রাপ্তির তথা আত্মপ্রতিষ্ঠার বাঞ্ছাই জিগীষা। কিন্তু এতো যথার্থই বাহ্য। এই সরল পথে যে স্থূল জয় সম্ভব, মানুষের অন্তরের চাহিদা তার চেয়ে অনেক সূক্ষ্ম, জটিল ও অধিক। হারিয়ে পাওয়া ও বিলিয়ে পাওয়ার তত্ত্ব আরো গভীরে নিহিত। এ তত্ত্ব স্বরূপে উপলব্ধি না করেও মানুষ এ পাওয়ার তাড়নায়ও প্রিয়-পরিচিতের কাজ করে চলেছে। কারো মুখে একটু হাসি ফুটাবার জন্যে, কারো মনে একটু স্বস্তি দেবার জন্যে, একটি হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা পাবার জন্যে মানুষ অন্যত্র ছলচাতুরী-কৌশল প্রয়োগে কিংবা জোর-জুলুম করে প্রয়োজনীয় বস্তু সংগ্রহে কিংবা কর্মসম্পাদনে অনুপ্রাণিত।

বাস্তবজীবনে এই জিগীষা চরিতার্থ করবার পথে বিধিনিষেধের বাধা আছে। শক্তি-সামর্থ্যেরও সীমা আছে, তাই মানুষ ক্রীড়ার মাধ্যমে এই জিগীষবৃত্তির চরিতার্থতা খোঁজে। প্রতিপক্ষ পরমাত্মীয় হলেও মানুষ নিজের জয়ই কামনা করে, আবার এমন কি, চিত্তের গভীরে প্রিয়জনের

অমঙ্গল কামনাও জাগে, তার ক্ষতির জন্যে নয়, কেবল প্রিয়জনের দুর্যোগ-দুর্ভোগের দিনে তার সেবা করে, তাকে সাহায্য করে, তার জন্যে ত্যাগস্বীকার করে কৃতজ্ঞতার ও কৃতার্থমন্যতার সুখ অনুভবের জন্যে। এই জিগীষার মধ্যে কোন মহৎ আদর্শ-উদ্দেশ্য নেই; আছে প্রবল আত্মরতি। এর প্রভাবে মানুষ অভিভূত, ফলে তার শ্রেয়বোধও হয় বিপর্যস্ত, অবলুপ্ত। তাই দুনিয়ায় সর্বত্র মানুষ এই জিগীষা বা দিশাহারা জয়ের মালা চেয়ে চেয়ে প্রায়ই হার মানছে। এতে তার মনের ভুবনে ক্ষয়-ক্ষতি যা-ই-হোক—ব্যবহারিক জগতে জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রে, সামাজিক রীতি-নীতির লঙ্ঘনে বহু মানুষের জীবনে বিপর্যয়ও সৃষ্টি করে। শ্রেয়-চেতনা ও সার্থকতাবোধের এই বিকৃতি ও বিপর্যয়ে মানুষের ইতিহাস দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও দুঃখ-যন্ত্রণার ইতিকথার অন্য নাম।

আত্মকল্যাণই এই পরপীড়নের কারণ। অথচ ব্যক্তিক জীবনে প্রায় সবাই আস্তিক। এবং তারা ধর্মশাস্ত্র মানে। শাস্ত্র হচ্ছে সার্বভৌম আসমানী শক্তির আনুগত্যের অঙ্গীকারে মানুষের পারস্পরিক ব্যবহার বিধি বা জীবন-যাত্রানীতি। স্ব স্ব দায়িত্ব, কর্তব্য ও অধিকারের সীমায় আঘাত না দিয়ে এবং আঘাত না পেয়ে স্বস্থে অটল থেকে নির্বিঘ্ন জীবনযাপনই লক্ষ্য। অর্থাৎ ব্যক্তির প্রথম ও প্রধান পরিচয় হচ্ছে—সে মানুষ। তার মানবিক দায়িত্ব গ্রহণ ও কর্তব্যকরণের প্রতিজ্ঞা পূরণার্থে স্বাধিকার সীমায় মানবিক গুণের ও বোধের বিকাশসাধন তথা মনুষ্যত্বে উত্তরণই সবার লক্ষ্য। অঙ্গীকার পূরণেরলক্ষ্যে উত্তরণের জন্যে কারো শাস্ত্রীয় নীতি ইসলাম, কারো মুসা-প্রদর্শিত পদ্ধতি, কারো গৌতম-নির্দেশিত উপায়, কারো যিশু-প্রবর্তিত পন্থা কারো বা ব্রাহ্মণ্য-বিধি। অতএব মানুষের নাম, নিবাস ও বৃত্তির মতো এক্ষেত্রেও তাঁর পরিচয়ের অভিজ্ঞান সে মানুষ, আর লক্ষ্য মনুষ্যত্ব এবং সে লক্ষ্য অর্জনে তার সম্বল হচ্ছে তার মনোনীত নীতি-পদ্ধতি। প্রাণীর মধ্যে সে মানুষ, গন্তব্য তার মনুষ্যত্ব এবং তার বাহন তার মনোনীত শাস্ত্রীয় নীতির-পদ্ধতি। অথচ উদ্দেশ্য তার কবে হারিয়ে গেছে, সে উপায়কেই উদ্দেশ্য বলে জানে এবংলক্ষ্য বলে মেনে নিশ্চিন্ত। তাই স্ব স্ব উপায়ের শ্রেষ্ঠত্ব, গৌরব ও গর্ব জাহির করার প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা চালু রাখাই তার জীবনের মহৎ আদর্শ ও উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ কারণেই ধর্মদ্বেষণা ও

বিধর্মী-বিদ্বেষের অবসান আজো দুর্লক্ষ্য। এর সঙ্গে জাত-বর্ণ দ্বেষণাও যুক্ত। এবং সমাজের সুবিধাবাদী সুযোগসন্ধানী মানুষেরা এই বিদ্বেষকে আর্থিক, বৈষয়িক ও রাষ্ট্রিক জীবনে পুঁজি হিসেবে কাজে লাগায়, আর রেষারেষি, কাড়াকাড়ি, মারামারি ও হানাহানি চিরকাল জিইয়ে রাখে।

ফলে সংখ্যালঘু দুর্বল পক্ষ চিরকাল বঞ্চনা ও পীড়নের শিকার হয়ে দুর্বহ অভিশপ্ত জীবন অতিবাহনে বাধ্য হয়। জ্ঞানে-বিজ্ঞানে বোধে-বুদ্ধিতে মানুষ এতো এগিয়েছে, জীবনে স্বাচ্ছন্দ্যের ও উপভোগের এতো সামগ্রী সৃষ্টি হয়েছে, সুখ-শান্তির জন্যে এতো আয়োজন রয়েছে, কিন্তু তবু দুনিয়ায় দুর্বল মানুষের দুঃখ ঘুচল না।

দৈশিক, সামাজিক, রাষ্ট্রিক জীবনেই জাত-জন্ম বর্ণ-ধর্ম-দ্বেষণা সীমিত নেই। আন্তর্জাতিক ও আন্তঃরাষ্ট্রিক জীবনেও তা তার নখদন্ত নিয়ে অনুপ্রবিষ্ট। এখানেও সেই আত্মরতি ও জিগীষা ঐ দ্বেষণা ও পীড়নের রূপ নিয়ে প্রকটিত। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে যদিও রাষ্ট্রনায়করা মুখে শ্বেতকপোত, কিন্তু স্বভাবে বাজ ও আচরণে বাঘ। তাই তাদের শাঠ্য-কাপট্য জোর-জুলুম কোন আবরণে ঢাকা থাকে না। এখানেও যার ধনবল ও অস্ত্রবল আছে তার অন্যায়, তার দুর্নীতি, তার জুলুমের সমর্থনে এগিয়ে আসে কৃপাজীবী-সুবিধাবাদী রাষ্ট্রগুলো—তাদের ভূমিকা সেই মোসাহেব চাটুকারের। জাতিসঙ্ঘ সংস্থার সভায় সেই সামন্ত যুগের দরবারী আবহই বর্তমান। সেখানেও প্রবল শক্তিগুলোর প্রতিবেশী-সুলভ দ্বেষ-দ্বন্দ্বের খেলা, ঈর্ষা-অসূয়ার সপিল প্রকাশ, সই আত্মরতি, সেই জিগীষার ক্রূর কুটিল অভিব্যক্তি। দলাদলিতে কুণ্ডয়নের মতো যেন একটি আপাতসুখ আছে, তাই মানুষ অনেক সময় ঈর্ষা-অসূয়া ও জেদের বশে দলাদলিতে মাতে। এটি রাষ্ট্রিক সম্পর্কেও সর্বত্র প্রকট। জাতিসঙ্ঘ সংস্থা গঠনে আদর্শিক সদুদ্দেশ্য থাকলেও আন্তরিক সদিচ্ছা সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাতা বৃহৎ শক্তিবর্গের যে ছিল না তা' গোড়াতেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল তাদের ভেটো প্রয়োগের অধিকার দাবিতে। সেই থেকে বিবদমান দুর্বল রাষ্ট্রগুলোর ব্যাপারে তারা যেরূপ বেদেরেক ব্যবহার করছে, তাতে অতি বড়ো আশাবাদীরও নিরাশ হতে হয়। পরিণামে তাদের এই নিষ্ঠুর খেলার শিকার হয় কোটি কোটি নিরীহ

মানুষ যারা আত্মীয়-পরিজন নিয়ে রোগশোক দুঃখদৈন্যের মধ্যেও স্নেহ-মমতার নীড়ে জীবনের তিক্তমধুর স্বাদ পাবার প্রত্যাশী। শক্তির দম্ভে মত্ত এইসব বৃহৎ রাষ্ট্রনায়করা বিনাদ্বিধায় ঘর ভাঙে, দেশ ভাঙে, সুখের নীড়ে বিভীষিকা জাগায়। হত্যা-পীড়ন-অনটন তাদের খেলার হাতিয়ার। দু'হাজার বছর ধরে দেশত্যাগী আওয়ারা ইহুদী এনে বসায় ফেলিস্তিনে হায়রে ইহুদীদের প্রতি মানবিক মমতার উচ্ছিলায়। আদর্শের প্রতি আনুগত্যবশে যেমন তারা জার্মানী, কোরিয়া, ইন্দোচীন আয়ার্ল্যাণ্ড, মেসোপটেমিয়া দ্বিখণ্ডিত করে, তেমনি ঐ নীতি আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাবশেই ইরাক-কঙ্গো-নাইজেরিয়া-ভারত-ইথিওপিয়া প্রভৃতি রাষ্ট্রের অসন্তুষ্ট মানুষের গোত্রীয় স্বাতন্ত্র্য স্বীকারে ও তাদের স্বাধীনতার দাবি সমর্থনে বৃহৎ শক্তিগুলো অসম্মত। আবার যুক্তরাষ্ট্রের কিংবা দক্ষিণ আফ্রিকার, রোডেশিয়ার সংখ্যাগুরু অধিবাসী কালো মানুষদের ন্যায্য অধিকার সম্বন্ধে তারা উদাসীন। মানবতার সেবায়ও অবশ্য তাদের আগ্রহ কম নয়। জল-ঝড়-খরা-কম্পন-বিধ্বস্ত কিংবা দুর্ভিক্ষ-মহামারী-কবলিত মানুষের সেবায় তারা এগিয়ে আসে। কিন্তু মানুষকে সুকৌশলে ক্রীড়ার আনন্দে দুঃস্থ বানিয়ে পরে দুঃস্থ মানবতার সেবায় ঝাঁপিয়ে পড়া যেন গরু মেরে জুতো দানের তত্ত্ব স্মরণ করিয়ে দেয়। আন্তরিকভাবে মানববাদী না হয়ে মানবতার প্রতি এই মমতা অভিনয়ের মতো দেখায়, এই প্রত্যয়হীন প্রয়াসে মানুষের স্থায়ী পরিত্রাণের কোন সম্ভাবনা নেই।

ইন্দোনেশিয়ায়, পাকিস্তানে সামরিক জান্তা দখলীকৃত সরকার বিদ্রোহ দমনের নামে পোকা-মাছি-পিপঁড়ে মারার মতো দানবীয় দাপটে গণহত্যা চালাল, কয়েক লক্ষ মানুষের রক্তে মাটি হল কাদা, নদী হল লাল, দেশ হল নরকঙ্কালে-করোটিতে আকীর্ণ। নারী-শিশু-বৃদ্ধ কেউ নিষ্কৃতি পেল না। নারীর উপর পাশবিক অত্যাচার করল, ঘরবাড়ি পোড়াল, কোটি লোক প্রাণ নিয়ে দেশান্তরে পালাল। এক কথায় রক্তে আগুনে প্রলয়কাণ্ড ঘটাল, তবু তা বিশ্ব-রাষ্ট্রগুলোর কাছে আভ্যন্তরীণ শাসন-শৃঙ্খলা রক্ষার নিয়ম-রেওয়াজ মাফিক ব্যবস্থা মাত্র। গণহত্যা কখনো কারো ঘরোয়া ব্যাপার হতে পারে! নিজের সন্তানকেও তো হত্যার অধিকার মা-বাপের নেই।

দেশের সরকার দেশের নাগরিকের শাসক বলে কি তার জানেরও মালিক! পরের ছেলেকে পথে পেয়ে সোহাগ করা চলে কিন্তু তাকে আঘাত করার অধিকার মেলে না। মঙ্গল করবার মানবিক আগ্রহ আর নির্যাতন-নিধনের দানবিক দৌরাত্ম্য দু'টোই কিন্তু জাতিসঙ্ঘের সমান সমর্থন পায়। জাতিসঙ্ঘ সংস্থা যেন বিশ্বের বৃহৎ রাষ্ট্রগুলোর রাজনীতি-কূটনীতি খেলার জন্যে তৈরী ক্লাব। অবশ্য রাজনীতিকদের নিষ্ঠুর খেলা চিরদিন এমনিভাবেই চলে। কিন্তু যখন মানববাদের মহৎ বুলি আওড়াচ্ছে সবাই, তখন মানুষের জানমাল নিয়ে এই দানবীয় দৌরাত্ম্যে মানববাদীর বেদনা বাড়ে। আমাদের আপত্তিও এ-জন্যেই। বাজের মতলব নিয়ে শ্বেত কপোতের ছদ্মবেশে বিচরণ করতে থাকলে আশ্বাস-প্রত্যাশী প্রতারিত মানুষের যন্ত্রণা অসহ্য হয়ে উঠে। জাতিসঙ্ঘ সংস্থা বাহত গড়া হয়েছে বিশ্বের রাষ্ট্রসমূহের শান্তি ও নিরাপত্তার তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে,—মানবজীবনের সর্বক্ষেত্রে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা, মানব-প্রয়োজন মিটানো ও মানব-কল্যাণ সাধনই এর লক্ষ্য। এজন্যে মানবাধিকার, সেবা, শিশু, স্বাস্থ্য, রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, কৃষি ও খাদ্য উৎপাদন, বিপদত্রাণ, শ্রমিকস্বার্থ রক্ষণ প্রভৃতি বিবিধ উপসঙ্ঘ, সংস্থা ও পরিষদ রয়েছে। সর্বপ্রকার সদুদ্দেশ্য, সৎকর্ম ও হিতচিন্তার ব্যবস্থা রয়েছে এখানে। বিশ্বরাষ্ট্রগুলোর সমঝোতার ভিত্তিতে সনস্বার্থে সহিষ্ণুতা, সহ-অবস্থান ও সহযোগিতার অঙ্গীকারে জাতিসঙ্ঘ সংস্থা গঠিত হয়েছে। কিন্তু পৃথিবীব্যাপী রাষ্ট্রগুলোর প্রতিযোগিতা চলছে অস্ত্রসংগ্রহের ও নির্মাণের—এ কোন্ মহৎ মতলবে! কার সঙ্গে দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হবার জন্যে! জাতিসঙ্ঘের সদস্যরা তো প্রতিদ্বন্দ্বিতা পরিহারের জন্যে অঙ্গীকারবদ্ধ। পয়োমুখ বিষকুম্ভের মেসাল বুঝি এ ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

মানুষকে ভালো না বেসে মানববাদী হওয়া যায় না। মানব-প্রেমই মানুষকে মানববাদী করে। আর মানববাদী না হলে কারো পক্ষে কম্যুনিস্ট হওয়া সম্ভব নয়। কেননা দুঃস্থ মানবের প্রতি দরদই মানুষকে সমাজবাদী ও সাম্যবাদী হতে অনুপ্রাণিত করে। বাঙলাদেশে গণহত্যার ব্যাপারে চীন যে কেবল উদাসীন ছিল তা নয়, সে জল্লাদ-সরকারকে হত্যাকাণ্ডে উৎসাহিতও করেছে সক্রিয়ভাবে। তা হলে কম্যুনিস্ট চীনের মানবদরদ কি

ছলনা মাত্র! তাও নয়, কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রেরও রাজনীতি-কূটনীতি আছে; এটি সে নীতিরই বাস্তবায়ন। ভারত-বিদ্বেষ বশেই মুখ্যত পাকিস্তানের জল্লাদ-সরকারের সমর্থনে ও সাহায্যে এগিয়ে এসেছে চীন। কিন্তু খুঁটিয়ে-খতিয়ে দেখলে বোঝা যায় হিতৈষীর বেশে দেখা দিলেও চীন পাকিস্তানেরও হিতকামী নয়। পাকিস্তানকে দিয়েই পাকিস্তান ভাঙার পথ তৈরী করেছে। কেননা তারা Self-help-এ স্বনির্ভরতার নীতিতে আস্থা রাখে, স্বাবলম্বনে ভরসা রাখে।

'তোমাকে বধিবে যে গোকুলে বাড়িছে সে' তত্ত্বে ও অঙ্গীকারে কংসের রাজ্যে ভগবান কৃষ্ণের মতো কিংবা ফেরাউন-ঘরে মুসার লালনের মতো তারা দেশেই সরকার-বৈরী তৈরী করায়। সরকার-অনুষ্ঠিত হত্যাকাণ্ডের পর বিক্ষুব্ধ বিদ্রোহী বাঙালী যে আপসহীন সংগ্রামের সঙ্কল্প ও শপথ গ্রহণ করবে, এবং তা যেমন গেরিলা পদ্ধতিতে হবে পরিচালিত, তেমনি তরুণ মুক্তিযোদ্ধারা হবে সমাজবাদের আদর্শে অনুপ্রাণিত। এ অনুমান করা অসঙ্গত ছিল না।

কাজেই বাঙলাদেশে কম্যুনিজমের দ্রুত প্রসার লক্ষ্যেই চীন পাকিস্তান সরকারকে সমর্থন ও সাহায্য দিচ্ছিল। তা ছাড়া গণহত্যা কিংবা রক্তের বন্যা দেখলে সাম্রাজ্যবাদীদের মতো কম্যুনিস্টরাও বিচলিত হয় না। এ রক্তে হোলিখেলার দীক্ষা নিয়েই তাদের যাত্রা হয় শুরু। নরহত্যার মাধ্যমে নর-সেবার স্থায়ী সুযোগ করে নেয়াই তাদের নীতি। বিরুদ্ধ শক্তিকে হত্যা করে উচ্ছেদ করার নীতিতে তারা আস্থাবান। কাজেই বাঙলাদেশে তাদের নীতি-আদর্শের খেলাফ হয়নি। এখানেও সেই আত্মরতি! জিগীষার এই-ও আর এক রূপ।

আসলে পুঁজিবাদী ও কম্যুনিস্ট বৃহৎ শক্তিগুলো নবতর সাম্রাজ্যবাদে আসক্ত। দুনিয়ার দুর্বল রাষ্ট্রগুলোকে তারা তাদের প্রভাবিত ও সংরক্ষিত তাঁবেদার রাষ্ট্রে পরিণত করতে সচেষ্ট, যাতে উপনিবেশ ও সাম্রাজ্যের মতোই আর্থিক শোষণ চালু রাখা যায়। আদর্শবাদের নামে পর-প্রীতির আবরণে বিশ্বমানব-কল্যাণের অজুহাতে আত্মপুষ্টির এ এক আধুনিক উপায়। দুর্বল রাষ্ট্রের মানুষ যে এ কপটতা না বুঝে তা নয়। কিন্তু তার দারিদ্র্য ও বলহীনতা 'রা' করার সাহস থেকেও তাকে বঞ্চিত রেখেছে। পৃথিবীর ঘরে

ঘরে মানববাদীর সংখ্যা না বাড়লে এই উপদ্রব থেকে মানুষের নিষ্কৃতি নেই, মুক্তি নেই দুর্বল দরিদ্রের। স্বার্থের ও লিপ্সার জগতে জিঘাংসা জিগীষায় প্রায়ই নিত্যসঙ্গী। তাই আজকের জগতে দানবিক জিগীষা ও পৈশাচিক জিঘাংসা সর্বত্রই সহচর। আর এ প্রবৃত্তির শিকার হচ্ছে দুনিয়ার দুঃস্থ মানবতা। যারা বিশ্বাস করে এবং বলে 'মানবের তরে মাটির পৃথিবী দানবের তরে নয়' 'তারা কিসের ভরসায় এবং কোন্ আশ্বাসে এ কথা বলে জানিনে। মানববাদী-সাম্যবাদী সাম্রাজ্যবাদী নায়কদের অন্তরের পৈশাচিক রূপ এবং আচরণের দানবিক দাপট দেখে মনে হয় না গণমানবের কখনো সত্যিকার জয় হবে, দেহে মনে সে মুক্তির স্বাদ পাবে। যে-সুন্দর বিশ্বে সুন্দর মনের ও সচ্ছল জীবিকার স্বচ্ছন্দ জীবনের উদ্রিক্ত কল্পনা ও স্বপ্ন নিয়ে দুনিয়ার দুঃস্থ মানুষ আশায় উদ্দীপ্ত হয়ে ও ভরসায় বুক বেঁধে দিন গুনছে, তা কি কখনো সত্য ও বাস্তব রূপ নেবে! স্বপ্নভঙ্গের বিড়ম্বনা ও আশাহতের বেদনা এড়ানোর জন্যে অন্তত প্রত্যয় ও প্রত্যাশা রাখা যাক— শতাব্দীর সূর্য আমাদের প্রতারিত করবে না।

বিড়ম্বিত প্রত্যাশা

বর্ষণের পূর্বে যেমন মেঘাড়ম্বর আবশ্যিক, গাওয়ার আগে যেমন রাগ ও সুর নিরূপণ করতে হয়, তেমনি সর্বপ্রকার কর্ম ও আচরণের পিছনে থাকে ভাব, চিন্তা, চেতনা ও পরিকল্পনা। আগে পরিকল্পনা পরে প্রকল্পের বাস্তবায়ন। আগে স্বপ্ন ও সাধ, পরে জীবনে তার রূপায়ন-প্রয়াস। স্বাধীনতাপ্রাপ্তির জন্যে যেমন প্রস্তুতি প্রয়োজন, তেমনি তা ভোগের জন্যেও যোগ্যতা দরকার।

আমরা যখন শোষণমুক্তি লক্ষ্যে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম করতে যেয়ে নানা কারণ-ক্রিয়ার যোগসাজসে স্বাধীনতাই পেয়ে গেলাম, তখন আমরা প্রায়ই দিশেহারা। একপ্রকারের বিমূঢ়তা বা অভিভূতি আমাদের পেয়ে বসল। এ অভিভূতি আনন্দের নয়, বেদনার নয়, বিক্ষোভেরও নয়। এ হচ্ছে আকস্মিকতার অনুভূতি, অপ্রত্যাশিতের বিমূঢ়তা। গোড়ায় আমরা শোষণমুক্তি চেয়েছি, ন্যায্য ভাগ ও অধিকার দাবি করেছি, স্বাধিকারের সংগ্রামে মেতেছি অসূয়াতপ্ত চিত্ত নিয়ে। তাতে উত্তেজনা ছিল, উদ্দীপনাও ছিল, ছিল না কেবল সৃষ্টি-সম্ভব কল্পনা। যে প্রলয় নূতন সৃজন-সম্ভব, তা 'জীবনহারা অসুন্দরে' লয় করেই নবজীবনের উন্মেষ ঘটায় এবং সে জীবন দূর্বার মতো প্রাণের ঐশ্বর্যে দ্রুত আত্মপ্রকাশ করে ও আত্ম বিকাশে চঞ্চল হয়ে উঠে। আমাদের যে-স্বপ্ন ও যে-সাধ ছিল না, যা কৃত্রিমভাবে চিত্তলোকে জাগিয়ে তোলার মুহূর্তেই সিদ্ধি অভাবিতরূপে হাতের মুঠোয় এসে গেল, তখন সে স্বপ্ন ও বাস্তব এবং সাধ-সাধ্য ও সাধিত একাকার। মানস-প্রস্তুতি ছিল না বলেই আমরা এমন অচিন্ত্য সৌভাগ্যের মুহূর্তেও আকস্মিকতার শিকার হয়ে স্বাধীনতার মতো দুর্লভ ঐশ্বর্যের চেতনা, বিরল সম্পদের প্রসাদ অনুভবগত করতে পারলাম না। চিত্তলোকে যখন আকাঙ্ক্ষা জাগে এবং যখন তা জীবনস্বপ্ন হয়ে দেখা দেয়, তখন তার বাস্তবায়নের সাধ জাগে, সে-সাধ ঐকান্তিক ও নিষ্ঠা হয়ে চরিত্রে সাংকল্পিক দৃঢ়তা আনয়ন করে। এমনিভাবে চরিত্র থেকে সংকল্প, সংকল্প থেকে শক্তি এবং

শক্তি থেকে সিদ্ধি আসে। এ'টি আমাদের ছিল না। তারই ফলে আমাদের উল্লাসের মুহূর্তগুলো দ্রুত উবে গেলেও বিমূঢ়তা বা অভিভূতির ঘোর দু'বছরেও কাটেনি।

যারা নিতান্ত অবুঝ সেই অকপট নিরক্ষর গণমানুষ কারো আহ্বানে কখনো ফেরুপালের মতো সমবেতকণ্ঠে উল্লাসধ্বনি তুলেই তুষ্ট ও তৃপ্তমন্য। কখনো বা কাকের মত প্রতিবাদে উচ্চকণ্ঠ। দু'টোই ক্ষণিক ও সাময়িক এবং নির্লক্ষ্য ও পরিণামশূন্য।

সাক্ষর-সরল সাধারণ লোকেরা ঘরে-ঘাটে কখনো বিস্মিত, কখনো বিক্ষুব্ধ, কখনো আশ্বস্ত, কখনো বা ভীত-শঙ্কিত হয়ে চারদিককার চালাকির লীলা প্রত্যক্ষ করেও প্রাত্যহিকতার চাকায় নীরবে ঝুলছে।

সাক্ষর চালাকেরা ঐকতানিক তত্ত্বে নিষ্ঠ। ওরা কুশলী বহুরূপী। সময়ও সুযোগ জ্ঞানে ওরা জ্যোতিষীর চেয়েও পাকা। ক্ষণ-তিথি-লগ্ন মাফিক ওরা ঝোপ বুঝে কোপ মারতে ওস্তাদ। লাভের-লোভের বশে ওরা প্রয়োজনমতো বোল ও ভোল পাল্টাতে পটু এবং ভেল্কীবাজিতে অনন্য। সমাজে এদের সংখ্যাই বেশী এবং এদেরই দুর্নীতির শিকার ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্র। এদের অনুচর-অনুসঙ্গী রয়েছে অনেক এবং প্রতিদিন এদের দল যারা ভারী করছে, তারা স্বভাবে তোতাপাখী—অনুকারী। এদের দেশ কাল-শাস্ত্র-সমাজ-রাষ্ট্র কোনটার প্রতিই কোন বিশেষ আগ্রহ নেই—আত্মরতি ও আত্মসুখের খাঁচার পোষমানা প্রাণ নিয়ে লাভ-লোভের উঞ্ছবৃত্তিতেই এরা তৃপ্ত। এরা ভয় দেখালে পিছু হটে, প্রশ্রয় দিলে আগ বাড়ায়।

মহৎ আদর্শ ও সুন্দর স্পৃহাহীন মানুষ এমনটিই হয়। সুষ্ঠু কল্যাণ-চেতনাবিরহী মানুষে অন্য কিছু প্রত্যাশা করাই বাতুলতা। কল্যাণমাত্রই যে সামগ্রিক, খণ্ড-কল্যাণ বলে যে কিছু হতেই পারে না—তা এ মানুষের বোধাতীত। তাই সব সাধারণ মানুষই আত্মকল্যাণে, আত্ম-সুখসন্ধিৎসায় ছুটছে, ঘুরছে, ছটফট করছে চিরকালই। কোন মানুষই অলস উদাসীন হয়ে বসে নেই। বৈরাগ্যও নেই কারো মধ্যে। কেবল রুচিভেদে পথ-পাথের ভিন্নমাত্র। ফলে ব্যক্তি-কল্যাণ-প্রেরণা-প্রসূত কাড়াকাড়িতে কেবল কল্যাণকর সম্পদ ছিঁড়ছে আর ভাঙছে, আর অকেজো হয়ে অপচিত হচ্ছে। ত্যাগের প্রেরণা আসে ভালোবাসা থেকে। ভালো না বাসলে সেবা ও

ত্যাগের যোগ্যতা জন্মায় না। যারা আত্মরতিবশে ত্যাগের ভান করে ভাবী-ভোগের পুঁজি বিনিয়োগ করে, তারাই সুযোগ বুঝে আত্মপক্ষ সমর্থনে ও আত্মস্বার্থ আদায় লক্ষ্যে বলে 'ত্যাগ করেছি বিস্তর, ভুগেছি অনেক—এখন জয়-অন্তে ভোগ করবার অধিকার আমারই।' সিদ্ধি যখন এসেছে আমারই সংগ্রামে, তখন সাধ মিটিয়ে ভোগ করার দাবি আমারই।' এমন মানুষ জয়ের শেষে লুট না করে পারে না। অথচ ত্যাগ যার চরিত্রের অঙ্গ, চিত্তের সম্পদ, ভোগ তার বিষবৎ। ভোগীর ত্যাগী হওয়া সম্ভব, কিন্তু যথার্থ ত্যাগীর ভোগী হওয়া অসম্ভব। সাগরে বিচরণ যার, পুকুরে তার আকর্ষণ জন্মানো দুঃসাধ্য।

অতএব স্বাধীনতাপ্রাপ্তির মুহূর্ত থেকে আজ অবধি আমরা সবাই আকস্মিকতার শিকার। অপ্রস্তুতিপ্রসূত বিমূঢ়তা বা অভিভূতি আমাদের কাকেও করেছে লুটেরা, কাকেও করেছে ফেরু, কাকেও করেছে মর্কট, কেউ হয়েছে বায়স আর অন্যরা রইল নিরীহ। তাই কেউ সুখ পাচ্ছেও না, কাকেও দিচ্ছেও না। দেশ জুড়ে লোফালুফি, কাড়াকাড়ি, ডাকাচুরি, হানাহানি চলেইছে। মার খাচ্ছে নিরীহরা। মানুষের প্রতি ভালোবাসা নেই, তাই সেবার ও ত্যাগের প্রেরণা নেই; দেশের মানুষের সামগ্রিক স্বার্থে কল্যাণকর কর্মের উদ্যোগ-আয়োজন নেই। খণ্ড ও ক্ষুদ্র স্বার্থে ততোধিক ক্ষুদ্র বুদ্ধি প্রযুক্ত হয়ে ব্যতিক্রম ঘটাচ্ছে প্রাকৃতিক নিয়মেও।

মানুষের মধ্যে যারা অর্জিত বিদ্যার জোরে বুদ্ধিজীবী আখ্যার দাবিদার তাঁরাও চরিত্রানুসারে বিভিন্ন মতলবের। এঁদের কেউ সুবিধাবাদী ও সুযোগসন্ধানী। বোল ও ভোল পাল্টাতে, শক্তের ভক্ত হতে, জনপ্রিয় বুলি কপচাতে, প্রভুর সুরে সুর মেলাতে ও চাটুকারিতার সুনিপুণ অনুশীলনে তাঁদের জুড়ি নেই। চালের ভুলে কখনো লাথি বা লাঠি খাওয়ার অবস্থায় পড়লেও হাসিমুখে অদৃষ্টকে সহ্য করে ও সারমেয়সুলভ উদারতায় আনুগত্য স্বীকারে তাঁরা আরো উৎসুক হয়ে ওঠেন। তাঁদের জীবনদর্শনে এটিই আত্মশুদ্ধির প্রকৃষ্ট পথ। তাঁদের আমরা ভদ্র ভাষায় বলি—'সরকার-ঘেঁষা।' আর একদল আছেন তাঁরা হচ্ছেন সরকার-ভীরু—তাঁরা গা-পা বাঁচিয়ে চলতেই ব্যস্ত। কোন ঝুঁকি নিতে নারাজ বলেই তাঁদের লাভের লোভও সামান্য। অনুগ্রহ পেলে বর্তে যান, না পেলেও যা আছে তার

নিরাপত্তার আশ্বাসেই তুষ্ট। তাঁরা নিরীহ সংজ্ঞায় পরিচিত। ক্ষতি করার সাহস তো নেই-ই, উপকার করার সামর্থ্যও তাঁরা রাখেন না। সে হিসেবে ওঁরা সমাজের দায়—অবাঞ্ছিত বোঝা। কেননা ওঁদের বহুল উপস্থিতি অন্যদের সাহস সঞ্চয়ে বাধাস্বরূপ। আর একদল আছেন, এঁরা সংখ্যায় চিরকালই নগণ্য। তাই বিরলতায় বিশিষ্ট। মনীষায় অনন্য না হয়েও এঁরা রেওয়াজ বিরুদ্ধ বেসুরো বেমক্কা কথা বলেন বলেই সহজেই সমাজ-সরকারের নজরে পড়েন, এবং তাতেই এঁদের প্রভাব প্রতাপ প্রবল হয়ে ওঠে। কিন্তু তবু এঁদের ভিন্ন চিন্তা ও অনন্য সাহসের দৃষ্টান্ত লোক-মানসে যে-আপাত দুর্লক্ষ্য প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, পরিণামে তা-ই সমাজে-রাষ্ট্রে পরিবর্তন আনে। এঁরা স্বকালে সমাজ, শাস্ত্র ও সরকার-শত্রু রূপে পরিচিত ও লাঞ্ছিত। কিন্তু কালান্তরে লোকবন্দ্য হয়েই লোক-স্মৃতিতে অমর হয়ে থাকেন। এঁরা সাধারণত ন্যায়-নিষ্ঠ ও জনকল্যাণকামী। কিন্তু বিদ্যাপুষ্ট এসব বুদ্ধিজীবী কখনো সমাজে, শাস্ত্রে ও রাষ্ট্রে বিপ্লব-বিবর্তন আনতে পারেন না। উত্তেজিত গণ-সমর্থন ভাঙতে সমর্থ হলেও গড়ার সাধ্য এঁদের থাকে না। কারণ এঁরা স্বদেশে ও স্বকালে স্বপ্রতিবেশ থেকেই চিন্তা-চেতনা লাভ করেন। অতীত এঁদের বিস্মৃত ঐতিহ্য, ভবিষ্যৎ এঁদের অজ্ঞাত-কামনা। যথার্থ মনীষাসম্পন্ন, বুদ্ধিজীবী বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞান ও চেতনাকে বোধিতে ও প্রজ্ঞায় উন্নীত ও সমন্বিত করতে সমর্থ। অবশ্য তেমন মানুষ কোটিকে গুটিকও মেলে না। হাজার বছরেও কোন দেশে বা সম্প্রদায়ে তেমন মানুষ না জন্মিতে পারে। কেবল তেমন মানুষই নিকট-অতীতের প্রভাবের নিরিখে অদূর-ভবিষ্যতের প্রয়োজনের আপেক্ষিকতায় বর্তমান সমস্যার কারণ-ক্রিয়া বিশ্লেষণ ও সমাধান নিরূপণ করতে পারেন। এই সীমিত অথচ প্রাগগ্রসর চিন্তা-চেতনার তথা প্রজ্ঞার প্রসূন হচ্ছে আজ অবধি অর্জিত তাবৎ মানব-প্রগতি। আবার প্রজ্ঞার এই দৈশিক ও কালিক সাফল্য ও সার্থকতাকে আত্মরতিবশে চিরকালীন ও সর্বজনীন মানবিক সমস্যার স্থায়ী সমাধান বলে চালিয়ে দেয়া ও গ্রহণ করার মধ্যেই রয়েছে মানব-দুর্ভাগ্য ও দুর্ভোগের বীজ। বিশ্বাস-সংস্কার ও রক্ষণশীলতার মূলে থাকে ঐ চিরন্তনতায় আস্থার অনপনেয় প্রভাব।

আমাদের এই মুহূর্তের বুদ্ধিজীবীরা নিতান্ত সামান্য চিন্তা-চেতনায় নিবদ্ধ তো বটেই, তা ছাড়া সরকার-ঘেঁষা এবং সরকার-ভীরুও। আর সরকার-শত্রু তো বিরল বটেই। কিন্তু এতেও নিয়মের ব্যতিক্রম উৎকট ও নৈরাশ্য-জনক ভাবে দৃশ্যমান। সবাই আকস্মিকতা ও অপ্রস্তুতির কবলগ্রস্ত। তাই বিলাপে, স্মৃতির রোমন্থনে, কৃতিত্বের আস্ফালনে, ভুলভাষণে, সত্য গোপনে, বিকৃত তথ্য পরিবেশনে কিংবা চাটুকারিতায় অথবা শঙ্কা-ত্রাসে তাঁরা দু'বছর কাটিয়ে দিয়েছেন। যাঁরা নিজেদের স্বপ্ন ও সুবিজ্ঞ দ্রষ্টা বলে জানেন, তাঁরা গতানুগতিক স্বরে ও সুরে পুরোনো চিন্তা-চেতনা নতুন করে পরিবেশনে ব্যস্ত। কেউ কেউ বিষয়বুদ্ধি বশে মামার জয়গানে মুখর। কেউ কেউ পর-প্রবঞ্চনার লোভে আত্মহননে লিপ্ত। আবার কেউ কেউ রুচিবিকারের শিকার। অনেকেই বক্তব্য নেই জেনেও বলতে উৎসুক। ক্বচিৎ কেউ বিক্ষুব্ধচিত্তে গালি পাড়তে আগ্রহী। কিন্তু কোথাও নতুন দিনের সংবাদ, নতুন মনের পরিচয়, নতুন প্রতিবেশের প্রসাদ লভ্য নয়। এ নিশ্চিতই দু'দিন। এ যেন রুগ্নদেহে জীর্ণবস্ত্রে স্বাস্থ্য ও সজ্জার গৌরব অনুভব করার মিথ্যা প্রয়াস।

প্রবুদ্ধ জাতির নবজাগ্রত আত্মসম্মানবোধই জাতীয় জীবনের নির্দ্বন্দ্ব-নির্বিঘ্ন বিকাশ লক্ষ্যে স্বাধীনতা অর্জনে মানুষকে অনুপ্রাণিত করে। কাজেই নবতর চিন্তা-চেতনা, উদ্যোগ-আয়োজন স্বাধীনতার নিত্যসঙ্গী। উচ্ছল প্রাণময়তা, তীব্র বিকাশ-বাঞ্ছা, উজ্জ্বল দৃষ্টি, সামগ্রিক কল্যাণ-চেতনা, মনন-বৈচিত্র্য ও চিত্ত-চাঞ্চল্যই সদ্যস্বাধীন জাতির বৈশিষ্ট্য। এসব গুণ আমাদের মধ্যে অনুপস্থিত। অর্জিত সম্পদের গৌরব-গর্ব থেকে আমরা বঞ্চিত, প্রাপ্ত ঐশ্বর্যের দাপটদম্ভ আমাদের অবলম্বন। তাই আমরা মনে-মেজাজে একটুও বদলাইনি। নিকট-অতীতে যেমন আমরা আগে মুসলমান, আগে পাকিস্তানী ছিলাম, এখন হয়েছি আগে বাঙালী। কখনও একাধারে ও একই সময়ে বাঙালী মুসলমান ও মানুষ হবার ইচ্ছা আমাদের জাগেনি। মানুষ হবার ব্রত কিংবা সাধনা আমাদের নয়। আমরা লাটিমের মত আবর্তিত হচ্ছি—এগুচ্ছিনা মোটেই। তবু মনে করছি বাঁকা রাস্তায় হলেও আমাদের অগ্রগতি অব্যাহত থাকছে। আমাদের বুদ্ধিজীবী সংস্কৃতিজীবীরা এক সময় মুসলমান হবার তীব্র উৎসাহে ভাষায়-সাহিত্যে-সংস্কৃতিতে-চিন্তায়-

চেতনায় সাহারার চমক ও গোবির মায়াঞ্জন প্রলিপ্ত করে ইসলামী লাবণ্য সৃষ্টির প্রয়াসী ছিলেন। তারপর তাকেই পাকিস্তানী সুরমার প্রলেপে বর্ণাঢ্য করার অপপ্রয়াস চলে। এখন আবার সেই একই স্থূল বিষয়-বুদ্ধিবশে তারা একান্ত বাঙালী হবার উগ্র উত্তেজনায় চঞ্চল। এবং সেই সিদ্ধি লক্ষ্যে আরবী-ফারসী নাম-শব্দ-চিহ্ন বা তৎসম্পৃক্ত জ্ঞান-বিদ্যা-সংস্কৃতি বিমোচনে তারা তৎপর। এর মধ্যে কোন কল্যাণবুদ্ধি কিংবা নবচেতনা নেই। সুবিধাবাদীর চাটুকার চরিত্র-লক্ষণই মাত্র সুপ্রকট। ফেরু-স্বভাব এমনি ভাবেই অভিব্যক্তি পায়। তাদের সারমেয়-স্বভাব আরো প্রবল। নতুন প্রভুর মেজাজ-মর্জির অনুগত করে নিজেদের তৈরী করার সেই পুরোনো ফন্দি-ফিকির কৃত্রিম আনুগত্যের অঙ্গীকারে অনুগ্রহলাভের প্রয়াসে অবসিত হয়। আত্মপ্রত্যয়ী বিশ্বের দিকে দিকে আত্মপ্রসারে হয় উন্মুখ, স্বাতন্ত্র্যের নামে আত্মসংকোচনের মাধ্যমে আত্মরক্ষার নির্বোধ গৌরবে অভিভূত হয় না। স্বাতন্ত্র্য ভিন্নতায় নয়, উৎকর্ষে ও বৈচিত্র্যে—এ তত্ত্ব তাঁহাদের বোধগত নয়। রুগ্ন দেহের স্ফীতি যে মৃত্যু-লক্ষণ, শয্যাশায়ী রোগীর অস্থিরতা যে প্রাণবন্ত সুস্থ শিশুর চাঞ্চল্য থেকে প্রকৃতিতে পৃথক, সে বোধ আমাদের নেই। আমরা যে এখনো মানস জরা-জীর্ণতার শিকার, তা আমাদের সার্বক্ষণিক মননে-আচরণেও সুপ্রকট। নইলে আমাদের নিষ্ঠ রাজনীতিকরা এখনো দিল্লী-মস্কো-ওয়াশিংটনে মানস-ভ্রমণ করেই আনন্দিত ও নিশ্চিন্ত কেন? স্বদেশের ও স্ব-সমাজের প্রতিবেশে মানবিক সমস্যার সমাধান সন্ধানে নিরত নন কেন? আমাদের স্বাধীন বাঙলার নাগরিকরা বিজয়-সংগ্রামে নিহত আত্মীয়-বন্ধুর জন্যে দু'বছর ধরে বিলাপ-বিলাসে নিষ্ঠ কেন? লড়তে গেলে মরতেও হয়; রক্ত-সাগরেই স্বাধীনতা-সূর্য উদিত হয় জেনেও স্বাধীনতার গৌরবানন্দ ভুলে হৃতসর্বস্ব কাঙালের মতো কিংবা অনাথা বিধবার মতো বিলাপানন্দে আমরা কৃতার্থমন্য কেন? আমাদের সৃজনশীল আঁকিয়ে-লিখিয়েরা এখনো বালসুলভ স্বদেশপ্রেমের গানে, মুক্তি-যোদ্ধার বীরত্বকথনে, ধর্ষিতা নারীর চণ্ডীরূপ অঙ্কনে কিংবা বেদনা-করুণ কাহিনী নির্মাণে, রাষ্ট্রনীতির স্তাবকতায়, ব্যক্তি-পূজায় অথবা স্বাধীনতা-স্বাপ্নিকের নৈরাশ্যের ও হতবাঞ্ছার চিত্রদানে নিরত। মন যার বিমূঢ়, মননে তার দ্বিধা-বাধা থাকবেই। জীবনের সর্বক্ষেত্রে পুচ্ছগ্রাহিতায়, পৌনপুনিকতায়,

যান্ত্রিকতায় ও পল্লবগ্রাহিতায় আমাদের প্রয়াস সীমিত। আঁকা-লেখার ক্ষেত্রে একটা পরিবর্তন বিশেষ প্রকট—তা হচ্ছে অশ্লীলতাকে পরম উদারতায় আর্টের উদার অঙ্গনে নিঃসংকোচে প্রতিষ্ঠা দান। এ-ও মুক্তি বটে, তবে এ বন্ধনমুক্তি—মনের না রসলিপ্সার সেটাই প্রশ্ন। এ প্রশ্ন করার সঙ্গত কারণও রয়েছে, যেমন, ছাড়া-বউ ও বিধবা বিয়ে করতে মুসলমানদের অনীহা দেখা যায় না। এমন কি পর-স্ত্রীকেও বশে এনে ঘরে তোলে। এতে বোঝা যায় পুরুষকে স্বেচ্ছায় দেহদানের পরেও কোন নারীতে মুসলমানের অবজ্ঞা নেই। অথচ সেই মুসলমানই ধর্ষিতা নারীকে ঘরে তুলতে, সমাজে ঠাঁই দিতে, স্ত্রীরূপে গ্রহণ করতে এগিয়ে এল না। কিমাশ্চর্য অতঃপরম! এর পরেও কি বলা চলে আমাদের মানসিকতায় পরিবর্তন হয়েছে, কিংবা স্বাধীনতা আমাদের যোগ্যতালব্ধ সম্পদ!

এসব কিছুর মূলে রয়েছে একটা তত্ত্বকথা। আমাদের অজ্ঞাতেই শ্রেণী-স্বার্থচেতনা আমাদের মর্মমূলে ক্রিয়াশীল থাকে। তাই আমরা যখন সচেতন-ভাবেই গণ-প্রীতি বশে ও সদুদ্দেশ্যে এবং আন্তরিকতার সঙ্গে কিছু ভাবতে-বলতে-করতে চাই, তখনো কিন্তু এক অতিসূক্ষ্ম অবচেতন প্রেরণায় ও প্রভাবে নিজেদের অজ্ঞাতেই শ্রেণী-স্বার্থানুগ তত্ত্বই ভাবি ও বলি এবং কাজও করি সেভাবে। আমরা গণমানবের দোহাই দিয়ে সব কথা বলি ও সব কাজ করি বটে, কিন্তু আসলে আমরা যা ভাবি, বলি ও করি তা কেবল শিক্ষিত উঠতি বণিক্‌, মধ্যবিত্তের তথা ভদ্রলোকের স্বার্থেই। কার্যত আমরা দেশ, সমাজ, রাষ্ট্র বলতে ঐ ভদ্রলোকদেরই বুঝি। তাই গাড়ী-বাড়ী, ফ্রিজ-ফ্যান-ফোন, বিমান-সিট্রাক, কেবিন, রেডিও, টিভি, শিক্ষা-স্বাস্থ্য, চাকরি, কমিশন-পরিকল্পনা প্রভৃতির বেলায় কেবল ভদ্রলোকের স্বার্থ ও স্বাচ্ছন্দ্য প্রভৃতিই মনকে প্রভাবিত করে। শিল্প-সাহিত্য, দর্শন-বিজ্ঞান, নাচ-গান, নাটক-সংস্কৃতি, সংবাদপত্র, নাগরিক অধিকার, বাক্-স্বাধীনতা, রাজ-নৈতিক মুক্তি, রাষ্ট্রিক স্বাধীনতা প্রভৃতি সবকিছুই ভদ্রলোকদের জন্যেই প্রয়োজন। আমাদের চিন্তা-চেতনায় কেবল আমরা রয়েছি বলেই আমরা অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান, প্রদর্শনী, সম্মেলন জলসা, আলোচনা-চক্র করি। সব কিছুর স্রষ্টা এবং ভোক্তা শিক্ষিত মধ্যবিত্তই। অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে

পরোক্ষে উপকৃত হয় গণমানবও। কিন্তু কোন সরকারী বা সামাজিক চিন্তায় ও কর্মে তারা প্রায় কখনোই উদ্দিষ্ট নয়।

যেমন নিরক্ষর গণমানব বিনা দাবিতে ভোটাধিকার পায় ভদ্রলোকের সর্দারীর তৃষ্ণা মিটাইবার এবং শাসনক্ষমতা লাভের উপায় বলেই। দেশের গণ-মানবের প্রায় সবাই নিরক্ষর চাষী-মজুর। আঞ্চলিক বুলি ছাড়া দুনিয়ার কোন ভাষাতেই তাদের অধিকার নেই। তাই লিখিত বাঙলাভাষাতেও নেই। তাদের পক্ষে রাষ্ট্রভাষা বাঙলা হওয়াও যা, উর্দু, ইংরেজী, ফরাসী হওয়াও তা। কাজেই ভাষা-সংগ্রামও ভদ্রলোকের স্বার্থ ও সম্মান-বোধের প্রশ্ন। দেশের সাত কোটি মানুষ যে-ভাষার প্রসাদ থেকে বঞ্চিত, সে-ভাষার জন্যে প্রাণ দেয়ার গৌরব এবং সে ভাষায় মর্যাদা দেয়ার গর্ব তাই গণমানবের পক্ষ থেকে করা চলে না। আজ যে মোহররমের মতো সপ্তাহ-পক্ষ-মাস-ব্যাপী সর্বজনীন পার্বণ চলছে ও ইমামবাড়ার মতো বারোয়ারী শহীদ মিনারে ফুল-চন্দন-আলিম্পন পড়ছে তা কাদের উৎসব? এর সঙ্গে সাতকোটি নিরক্ষর মানুষের সম্পর্ক কি? শিক্ষিতদের মধ্যে ইংরেজীর বদলে বাঙলা চালু হলে গণমানবের কি লাভ? তাদের ভাত-কাপড়-আশ্রয়ের কিংবা নিরক্ষতার সমস্যা কি এতে মিটবে? কিংবা দেশের আথিক, নৈতিক, চারিত্রিক, সাংস্কৃতিক, শৈক্ষিক, কৃষি-শৈল্পিক বা বাণিজ্যিক কি উন্নতি হবে? এমনি করে নিরক্ষরতা বিমোচনের কিংবা গণশিক্ষাদানের জন্যে ভদ্রলোকেরা প্রাণপণ সংগ্রামে নামে না কেন? শিক্ষিত বেকারের জীবিকা সংস্থানের জন্যে সমাজ-সরকার মাথা ঘামায়, গণমানবের ভাত-কাপড়ের নিশ্চয়তা-দানের চেষ্টা হয় না কেন?

এই যে জাতীয় সাহিত্য সম্মেলন, বহু অর্থব্যয়ে মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হল, তা কাদের বিলাসবাঞ্ছা পূরণের জন্যে, কাদের স্বার্থে ও প্রয়োজনে? অন্যভাবেও দেখা যেতে পারে। অন্য সব বিদ্যা হচ্ছে, তথ্য তত্ত্ব ও জ্ঞানগর্ভ আর সাহিত্য হচ্ছে অনুভবের প্রশ্ন। জীবনের জন্যেই জীবন নিয়ে সাহিত্য —যে জীবনে রয়েছে শাস্ত্র-সমাজ-সরকার-সংস্কৃতি, নিয়ম-নীতি, অর্থবাণিজ্য, কৃষি-শিল্প এবং তজ্জাত শাসন ও শোষণ, পীড়ন ও পোষণ, আনন্দ ও যন্ত্রণা, সম্পদ ও সমস্যা। কাজেই সাহিত্য সম্মেলন কখনো জীববিদ্ উদ্ভিদবিদ কিংবা পদার্থবিদ্‌দের সম্মেলনের মতো জ্ঞান-বিদ্যা-আবিষ্কার-

উদ্ভাবনের প্রদর্শনী হতে পারে না। সেখানে থাকে কেবল জ্ঞান-চর্চা, —জীবন-জীবিকা সম্পৃক্ত কোন অনুভব বা নীতি আদর্শ নয়।

কিন্তু সাহিত্য জীবন-জীবিকা সংক্রান্ত সর্বপ্রকার চিন্তা-চেতনাকে প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত করে। কেননা, সাহিত্যের কোন নির্দিষ্ট অবলম্বন নেই। শাস্ত্র, সমাজ, সরকার এবং আর্থিক, নৈতিক, শৈক্ষিক, জৈবিক, প্রাযুক্তিক, মানবিক, সাংস্কৃতিক, বৈষয়িক, বাণিজ্যিক প্রভৃতি সর্বপ্রকার সমস্যা ও সম্পদ তার অনুভব ও বক্তব্যের অবলম্বন। তাই জাতীয় সাহিত্য সম্মেলনের উদ্দিষ্ট হওয়া উচিত ছিল রাষ্ট্রিক চারনীতির সাহিত্যে রূপায়ণ সম্ভাব্যতা, তার সুফল-কুফল, ঔচিত্য-অনৌচিত্য প্রভৃতি বিবেচনা করা ও লোকহিতে দিশা ও সিদ্ধান্তদান করা। জীবনাশ্রয়ী সাহিত্যের তো তাই লক্ষ্য হওয়া উচিত। কিন্তু তার বদলে অধ্যাপক-সাংবাদিকদের একত্রিত করে সাহিত্যের উরস কিংবা সর্বজনীন বারোয়ারী বাণী-অর্চনার নামে বিভিন্ন ও বিচিত্র কণ্ঠের যে হট্টগোল সপ্তাহব্যাপী চালু রাখা হল, তার থেকে কি দিশা বা ধারণা পেল লিখিয়ে-পড়িয়েরা?

শিক্ষিতমনকে প্রভাবিত করার জন্যেই আমরা গণসাহিত্য সৃষ্টি করি—দুঃস্থ নিরক্ষর চাষী-মজুররূপী গণমানবের দুঃখ-দুর্দশার কথা লিখি এবং বলেও বেড়াই। অথচ আমাদেরও মনে মেজাজে ও আচরণে পরিবর্তন দুর্লক্ষ্য। অঙ্গীকৃত সমাজতন্ত্র বিড়ম্বিত হচ্ছে তো এ কারণেই! সাত কোটি নিরক্ষর বাঙালীর লোক-জীবনে লোকসাহিত্য-সংস্কৃতি-ঐতিহ্য তো রয়েইছে। তা, ভদ্রলোকের বিদ্যা-জ্ঞান অর্জনের জন্যে নিশ্চয়ই চর্চারও প্রয়োজন। কিন্তু ভৌতিক বিশ্বাস-সংস্কারের দুর্গে আবদ্ধ অজ্ঞ-অশিক্ষিত অপটু মানুষের সাহিত্য-সংস্কৃতি-ঐতিহ্য নিয়ে গৌরব ও গর্ব করার কি আছে? বরং দুঃখ লজ্জা ও ক্ষোভের বিষয় এই যে, শিক্ষার মাধ্যমে জ্ঞানের আলো দেয়া যায়নি বলেই ওদের মধ্যে আমরা কত সক্রেটিস, প্লেটো, গেলিলিও-কপার্নিকাস, হোমার-কালিদাস, ফেরদৌসী-খৈয়ামকে হারিয়েছি, এখনো হারাচ্ছি; কত সম্ভাব্য রবীন্দ্রনাথ লালন ফকিরই থেকে যাচ্ছেন। শিল্পে-সাহিত্যে-দর্শনে-বিজ্ঞান-প্রকৌশলে সভ্যতা-সংস্কৃতির এ স্তরে উঠে, আবার সেই অজ্ঞতার ও অসামর্থ্যের অপটুতা ও স্থূলতাকেই আমাদের রুচি-সংস্কৃতির উৎস ও অবলম্বন বলে জানতে এবং মানতে হবে? লোকজীবন ও লোকসংস্কৃতি

গৌরবের ও গর্বের হলে দুনিয়ার মানুষ কেন জ্ঞান ও নৈপুণ্যসুন্দর পরিশীলিত জীবন কামনা করছে ?

আগেই বলেছি দেশমাত্রেই ভদ্রলোকের। সেই ভদ্রলোকদের নেতৃত্ব দেন বুদ্ধিজীবীরা,—যাঁরা আঁকিয়ে-লিখিয়ে-বলিয়ে-করিয়ে লোক হিসেবে পরিচিত ও সম্মানিত। তাঁদের নেতৃত্ব যখন বন্ধ্যা হয় অর্থাৎ তাঁরা যখন সময়োপযোগী নতুন ভাব, নতুন চিন্তা, নতুন উদ্যোগ কিংবা নতুন কর্মের দিশা দিতে ব্যর্থ হন, তখনই তাঁরা পুরোনো গৌরব-গর্বের, পুরোনো সাফল্যের, বিজয়ের, সুকৃতির রোমন্থন-সুখে অভিভূত থাকতে চান এবং লোকজীবনেও তার আবর্তন কামনা করেন।

তাই গত দু'বছরের অনুষ্ঠানে, পার্বণে, স্মৃতিসভায়, সম্মেলনে, আলোচনা-চক্রে এবং গল্পে-উপন্যাসে-গানে-কবিতায়-নাটকে-প্রবন্ধে-স্মৃতিকথায় শোকের, কৃতির, বীরত্বের, বিজয়ের রোমন্থন-সুখ আস্বাদনের প্রয়াস দেখতে পাই। এ ক্ষেত্রে হিন্দু ও ভারতবিদ্বেষী কট্টর তমদ্দুনওয়ালাও ঘোর পাকিস্তানওয়ালা বুদ্ধিজীবীদের ভাষা ও জাতি-প্রীতি এবং বিলাপনৈপুণ্য সঙ্গতকারণেই মাত্রা ছাড়িয়েছে।

এসব কারণে ভাবী বিপদ-সম্পদ-সম্ভাবনার প্রতি দৃষ্টি রেখে বর্তমানের চলতি সম্পদ-সমস্যা নিয়ে ভাবনাচিন্তা করার লোক দেশে সত্যই বিরল। তাই আমরা আজ অদূর অতীতাশ্রয়ী। কাজেই আমাদের সাহিত্য-সংস্কৃতি-চিন্তাও লাটিমের মতো কেবলই আবর্তিত হচ্ছে, কাঙ্ক্ষিত বিবর্তন পাচ্ছে না, এবং আমাদের আনুষ্ঠানিক-প্রাতিষ্ঠানিক কথায়-কাজে যেমন, তেমনি আমাদের সাহিত্যেও চলতি সমস্যার কিংবা অন্যায় পীড়নের প্রতিকার-প্রতিবাদ-প্রতিরোধের সংকেত সুস্পষ্ট নয়।

অতএব আকস্মিকতার অভিভূতি সযত্নে ও সচেতনভাবে পরিহার করে এই স্বাধীনতা-উত্তরকালেই আমাদের স্বাধীন নাগরিকের যোগ্য মন-মেজাজ তৈরী করতে হবে। এর প্রধান শর্ত ও ভিত্তি হচ্ছে চরিত্র। লক্ষ্যে উত্তরণের সংকল্প আসে চরিত্র থেকেই এবং সংকল্প থেকে আসে শক্তি, শক্তিপ্রয়োগে আসে সাফল্য। আমাদের আজকের সবচেয়ে বড়ো অভাব চরিত্রের। আজ চরিত্র-সঙ্কটই বড়ো সঙ্কট। চরিত্রবান মাত্রই সদাচারী ও কল্যাণ-কামী—সে-কল্যাণ সর্বজনীন। এ মানুষের সংখ্যা সমাজে বাড়লে 'দাও

দাও, পাই পাই, খাই খাই' জাতের মানুষ কমবে এবং স্বাধীন দেশের বাঞ্ছিত সুনাগরিকের দায়িত্ব, কর্তব্য ও অধিকারের সীমা-সচেতন মানুষ দেশের সর্বাঙ্গীন ও সর্বজনীণ কল্যাণে তথা বহুজনহিতে ভাব, চিন্তা ও কর্ম নিয়োজিত করবে।

আমাদের বৈদেশিক ধারণায় আষাঢ়ের বৃষ্টিপাতে ধরণী সৃষ্টিসম্ভব হয়। প্রকৃতির জগতে আসে জীবনের জাগরণ। প্রাণের ঐশ্বর্যে ও স্বাস্থ্যের লাবণ্যে প্রকৃতি তখন ধীরে ধীরে হয়ে উঠে যৌবনবতী, নিরুপমা ও ফলসম্ভবা। তখন সবুজের সমারোহে পৃথিবী ভরে উঠতে থাকে। তেমনি স্বাধীনতা-প্রাপ্তির পর আমরাও সকারণেই প্রত্যাশা করেছিলাম সৃষ্টিসম্ভব নতুন চেতনা, নতুন চিন্তা, নতুন দৃষ্টি, নতুন জিগির, নতুন তত্ত্ব, নতুন ভাব, নতুন উদ্যোগ, নতুন আয়োজন ও নতুন যুগ। আমাদের সেই প্রত্যাশা আজ আহত। তাই আমাদের মতো শত-সহস্র প্রত্যাশী আজ বিড়ম্বিত।

তবু দেশের মানুষের উপর বিশ্বাস রাখব, তবু প্রত্যাশায় থাকব। কারণ, নিশ্চয়ই জানি-'এদিন যাবে, রবে না।' কেননা 'কোনদিন যাহা পোহাবে না, হায় তেমনি রাত্রি নাই।' খণ্ড ও ক্ষুদ্র স্বার্থে ব্যক্তিক প্রচেষ্টায় কেবল দ্বন্দ্ব-কোন্দল বাড়ে। কেননা তাতে ঈর্ষা-অসূয়া-প্রতিদ্বন্দ্বিতা এড়ানো অসম্ভব। সেঁচা জলের শরিক অনেক। আকাশের বৃষ্টি থেকে যেমন কেউ বঞ্চিত হয় না, তেমনি সমস্বার্থে সামগ্রিক কল্যাণ-লক্ষ্যে সমবেত প্রয়াসের প্রসাদ থেকে কেউ বঞ্চিত হবে না। অতএব, আত্মপ্রত্যয় ও সদ্বুদ্ধি সম্বল করে বহুজন-হিতে বহুজনসেবায় ভাব, চিন্তা-কর্ম-নিয়োজিত করলে পর-কল্যাণের সঙ্গে আত্মকল্যাণ আপনিতেই হবে।

আজকের ভাবনা

জীব-উদ্ভিদ—দুনিয়ার তাবৎ প্রাণীই জীবনকে ভালোবাসে এবং জীবনের নিরাপত্তা, স্বাচ্ছন্দ্য ও বিকাশ কামনা করে। আর সব জীব-উদ্ভিদের জীবন প্রকৃতিনির্ভর। তাই তাদের জীবন প্রকৃতির নিগড়েই আবর্তিত হয়। আত্মিক-উৎকর্ষের দৌলতে মানুষ প্রকৃতিকে কৌশলে বশ করে বান্দার মতো তার ইচ্ছার অনুগত করেছে। তাই মানুষ প্রকৃতি ও প্রবৃত্তিবিরুদ্ধ কৃত্রিম জীবন রচনার ও জীবিকাসৃষ্টির সামর্থ্যগৌরবে গর্বিত। সে জীবশ্রেষ্ঠ, মন ও মননধনে ধনী। তার সমাজ ও শাস্ত্র, সভ্যতা ও সংস্কৃতি তার চিন্তা-চেতনার প্রসূন—তার জীবনের নিরাপত্তা, স্বাচ্ছন্দ্য ও বিকাশলক্ষ্যে নিয়োজিত তার জীবিকা-পদ্ধতির ফসল। জীবনটাই তার এক পরম ঐশ্বর্য। পৃথিবীর ব্যক্ত ও গুপ্ত সব পদার্থই তার সম্পদ। সৃষ্ট সম্পদ ও শক্তির উপযোগ সৃষ্টি করে সেও স্রষ্টার মতো আনন্দিত।

এ সবকিছু সম্ভব হয়েছে জিজ্ঞাসা ও আকাঙ্ক্ষার অশেষতায় ও অপরিমেয়তায়। জিজ্ঞাসা ও কৌতূহল অভাব ও বাঞ্ছা জাগায়। তা-ই আশা ও আকাঙ্ক্ষা হয়ে উদ্যম, উদ্যোগ ও প্রয়াস সৃষ্টি করে। জীবনে মন-মননের বিকাশ ও বিস্তার ঐ আকাঙ্ক্ষা এবং প্রয়াসেরই প্রসূন। ভাব-চিন্তার প্রয়োগে পাই কর্ম। সে-কর্মের ফসলই জীবনের পাথেয়। ভাব-চিন্তা-কর্ম তাই জীবনের পুঁজি। জীবনটাই একটা অসীম সম্ভাবনা-প্রসূ সম্পদ। ঐ ঐশ্বর্য-চেতনাসম্পন্ন মানুষই জীবনের মুহূর্তগুলো সম্পদ-সৃষ্টিতে ও বৃদ্ধিতে নিয়োগ করে। জীবন-জমি আবাদ করলেই ফলে সোনা। জীবনেও থাকে চাষের মৌসুম, বোনার ঋতু আর ফসল তোলার কাল। আবাদের অতিক্রান্তকালে ফুল ফোটাবার, ফল ধরাবার প্রয়াস ব্যর্থ হবেই। এ-বোধ যাদের আছে, তারাই আবিষ্কারে-উদ্ভাবনে-অর্জনে-সঞ্চয়ে-রক্ষণে সদা-সচেতন। সফল ও সার্থক জীবনের প্রসাদ তাদেরই প্রাপ্য। জাতীয় জীবনেও এ তথ্য ও তত্ত্ব প্রযোজ্য। কিন্তু এর জন্যে নতুন চেতনার প্রয়োজন। কেননা নতুন চেতনাতেই নতুন স্বপ্নের, সাধের ও আকাঙ্ক্ষার জন্ম।

পুরাতনের প্রতি অবজ্ঞা, অবহেলা, সন্দেহ ও অনাস্থাই নতুন চেতনার লক্ষণ। তৃপ্ত ও তুষ্ট হৃদয়ে দ্রোহ নেই। দ্রোহবিরহী প্রয়াস-প্রযত্ন অসম্ভব। কেননা দ্রোহ ব্যতীত পুরাতন-পরিহারের প্রেরণা এবং নতুন-বরণের বাঞ্ছা জন্মায় না। তৃপ্তি ও তুষ্টি জড়তা ও জীর্ণতার শিকার। তৃপ্তি ও তুষ্টি তাই বন্ধ্যা ও বৈনাশিক। পুরোনো জীবননীতি ও জীবিকারীতির মধ্যে স্থিতি-কামীর আপাতসুখকর নিশ্চিন্ত ও নিষ্ক্রিয় জীবন পরিণামে বৈনাশিক বীজের আকর হয়ে উঠে। তাই স্থিতিতে মরণ। অতৃপ্তি ও অসন্তোষ নিগড় ভাঙার উদ্যম ও উদ্যোগের জনক, প্রয়াস-প্রযত্নের প্রসূতি, সৃষ্টিশীলতার ও সৃষ্টির উৎস। এজন্যেই গতিতে জীবন।

জিজ্ঞাসার, আকাঙ্ক্ষার ও চেতনার কথা এতো করে বলতে হচ্ছে এজন্যে যে, আমরা আকস্মিকভাবে এক অনাস্বাদিতপূর্ব অনভ্যস্ত সম্পদ সম্প্রতি পেয়ে যেন দিশেহারা হয়ে পড়েছি।

এর জন্যে যে আমাদের মানস প্রস্তুতি সম্যক ছিল না, তা সততার সঙ্গে স্বীকার করা কল্যাণকর। কেননা আমাদের যোগ্যতা অর্জনে ঐ স্বীকৃতিই প্রবর্তনা দেবে। এই নতুন ও সুদুর্লভ সম্পদটি হচ্ছে স্বাধীনতা। শশাঙ্ক ও গণেশগোষ্ঠীর কথা বাদ দিলে বাঙালী জীবনে এই প্রথম স্বাধীনতা-সম্পদ অর্জিত হল। স্বাধীনতা কি সূর্য-প্রতিম! হয়তো তা-ই। কেননা পার্থিব প্রাণ সূর্য-সম্ভব এবং এর লালনও সূর্য-নির্ভর। আজকের দিনে দৈশিক ও জাতিক জীবনও তেমনি স্বাধীনতা-সূর্যমুখী। কারণ একালে মানুষের জীবন-জীবিকার নিরাপত্তা, স্বাচ্ছন্দ্য ও বিকাশ দৈশিক বা জাতিক স্বাধীনতাভিত্তিক। আগের কালের বোকা মানুষেরা স্বদেশী, স্বধর্মী ও স্বজাতি রাজা পেলেই স্বাধীনতার গৌরব-গর্ব-সুখ অনুভব করে তৃপ্ত থাকত। এযুগ রাজার রাজত্বের নয়,—গণমানবের সমবায়-সংস্থার। তাই এ যুগে স্বাধীনতার তাৎপর্য ভিন্ন। এ যুগে সামরিক স্বনির্ভরতা ও আর্থিক স্বয়ম্ভরতার নামই স্বাধীনতা ও সার্বভৌমতা। গণমানবের জীবন-জীবিকার বিকাশ-বিস্তারই হচ্ছে স্বাধীনতার প্রসাদ।

নতুন চেতনাতেই নতুন ভাব-চিন্তা-কর্মের জন্ম, নতুন নীতির উদ্ভব এবং নতুন বস্তুর আবিষ্কার ও উদ্ভাবন সম্ভব। আবার নতুন চেতনার অনুকূল প্রতিবেশেই নতুনের লালন ও বৃদ্ধি সহজ ও স্বাভাবিক হয়।

রাম না জন্মিতেই না কি রামায়ণ রচিত হয়েছিল। লোকে তা বিশ্বাস করে না। কিন্তু আমরা করি। কেননা মনোজগতে মানস-প্রতিমা রচিত না হলে বাহ্যজগতে মূর্তি তৈরী হতে পারে না। চিৎ না থাকলে চিত্র আসবে কোথা থেকে! কল্পলোকে কল্পনা চাই, পরিকল্পনা চাই তবেতো তার বাস্তবায়ন! স্বাধীনতা অর্জনের আগেও তেমনি স্বাধীনতার কাঙ্ক্ষা চাই, স্বাধীনতা উপভোগের নীতিরীতি জানা চাই, স্বাধীনতা অনুভবের জন্যে চিৎ-প্রকর্ষ চাই। স্বাধীনতা প্রয়োগের নৈপুণ্য চাই। যে-কোন বস্তু ও শক্তির উপযোগ বুদ্ধি থাকা চাই, নইলে সুলভ বা লব্ধ হলেও তা কখনো সম্পদ হয়ে উঠে না। উপযোগ-বুদ্ধিই বস্তু ও শক্তিকে কেজো করে—জীবিকানুগত করে। অন্যায়, অসুন্দর ও অকল্যাণ-দ্বেষী-না হলে কেউ কখনো বিবেক-বুদ্ধির আনুগত্য স্বীকারে সমর্থ হয় না। তেমন মানুষ নাগরিকত্বের অযোগ্য। দায়িত্ববোধ, কর্তব্যবুদ্ধি, দাবি ও অধিকার-চেতনা কখনো বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্র হতে পারে না, তাদের সম্পর্ক বলতে গেলে অঙ্গাঙ্গী কিংবা ঐকান্তিক।

সমস্বার্থে সহযোগিতা ও সহাবস্থানের অঙ্গীকারে সহিষ্ণু মানুষের সঙ্ঘশক্তির প্রয়োগে দৈশিক জীবনে গণমানবের জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রে সামগ্রিক কল্যাণ ও স্বাচ্ছন্দ্য লক্ষ্যে মানবিক বিকাশ ও বিস্তার কামনায় আনুপাতিক সাম্যের ভিত্তিতে বণ্টনে বাঁচার ব্যবস্থা করা ছাড়া আজকের দুনিয়ায় মানবিক সমস্যার সমাধানের বোধগত অন্য কোন উপায় আপাতত নেই। বহু-পরীক্ষিত কাড়াকাড়ি, বঞ্চনা, ষড়যন্ত্র, মারামারি ও হানাহানিতে এ যুগে যে সমাধান কিংবা কারো কল্যাণ নেই, তা আশুউপলব্ধ হওয়া উচিত। নির্ভয়ে নির্বিরোধে সহাবস্থান করবার জন্যে আজকের মানুষকে মানববাদী হতে হবে এবং আত্মকল্যাণেই পড়শী-প্রীতির অনুশীলন করে সেবা, সততা ও ত্যাগপ্রবণতার বিস্তার ঘটাতে হবে। এ না হলে কেউ স্বাধীনতা অর্জনের ও অনুভবের এবং রক্ষণের ও উপভোগের যোগ্য হয় না।

প্রকৃতির জগতে দেখা যায় বুনোপাখী খাদ্যরূপেই ঠোঁটে কিংবা পেটে করে দূরদূরান্তরের নানা বৃক্ষবীজ স্থানান্তরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ফেলে। এতে ভাগ্যবলে কোন বীজ প্রাণ পায়, অনুকূল পরিবেশে মহীরুহ

হয়ে ধন্ত হয়। কিন্তু সব বীজ সে সুযোগ পায় না, হতভাগ্যের সংখ্যাই অধিক। মনুষ্যজীবনেও ভাগ্য কচিৎ প্রসন্ন হয়। ভাগ্যের বরাত দিয়ে বসে থাকলে ভাগ্য প্রায়ই প্রতারিত করে।

ভাগ্যবিড়ম্বিতের কাছে জীবনটা কখনো মরীচিকা, কখনো মরুমায়া এবং কখনো বা মরুশিখাও। জাতীয় জীবনেও তেমনি দায়িত্ব ভুলে কর্তব্য এড়িয়ে ভোগ করতে উৎসুক হলে, ভাগ্যের হাতে মার খেতে হবে। কাজেই অর্জিত স্বাধীনতা উপভোগের যোগ্যতা অর্জনই আমাদের আশু কাম্য। অন্যায়-অসততা-অকর্মণ্যতা অনুরোধে-প্রতিবাদে-প্রতিরোধে প্রতিকার করার যোগ্যতাই হবে প্রাথমিক লক্ষ্য। এবং তার জন্মে দরকার মন-জাগানো ও মন-বানানো।

স্বাধীনতার দায়

First deserve then desire—'আগে যোগ্য হও, পরে কামনা কর'—বলে একটি আপ্তবাক্য চালু রয়েছে। এর তাৎপর্য হচ্ছে কোন নতুনকে, কোন বাঞ্ছিতকে পেতে হলে, তা পাবার জন্যে যোগ্যতা অর্জন করতে হয়। কেন না, অকালে ও অপাত্রে প্রকৃতি কিংবা বিধাতা কিছুই দান করে না। জিজ্ঞাসা থেকে অভাববোধ, অভাবচেতনা থেকে প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা, আকাঙ্ক্ষা থেকে আসে প্রয়াস, জাগে উদ্যম, শুরু হয় উদ্যোগ। জিজ্ঞাসা জাগে তখনই, যখন পুরোনো নীতির দুর্গে ফাটল ধরে, পুরোনো রীতি উপযোগ হারায়, পুরোনো বিশ্বাস জীর্ণতা পায়, পুরোনো সংস্কার নিগড়রূপে প্রতিভাত হয়, পুরোনো পাথেয় অকেজো হয়ে যায়, পুরোনো জীবিকা-পদ্ধতি অভাব পূরণে ব্যর্থ হয়, পুরোনো সম্পদ বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। অতএব, পুরোনো জীবননীতি ও জীবিকারীতির প্রতি সন্দেহ, অশ্রদ্ধা ও অবিশ্বাস না জাগলে নতুনের আকাঙ্ক্ষা জাগে না, আর আকাঙ্ক্ষা না জাগলে, প্রাপ্তির প্রয়াসও থাকে অনুপস্থিত। পুরোনোতে আস্থা হারালেই প্রাপ্তির প্রয়াস প্রাকৃতিক নিয়মেই হয় শুরু। এটি কোন বিশেষ মানবিক গুণ নয়, নিতান্ত জৈবিক প্রয়োজন। ইতিহাস বলে, মানবিক প্রয়াস মাত্রেরই পেছনে রয়েছে প্রাণী হিসেবেই মানুষের জৈবিক চাহিদা। বিদ্বানেরা বলেন, মানুষের যাবতীয় বিকাশ জীবিকাসংপৃক্ত। অর্থাৎ জীবনের নিরাপত্তা ও স্বাচ্ছন্দ্য লক্ষ্যে মানুষ জীবিকার ক্ষেত্রে অনবরত যে অনলস প্রয়াস চালিয়েছে বা আজো চালিয়ে যাচ্ছে, তারই ফলে সমাজে ও শাস্ত্রে, সভ্যতায় ও সংস্কৃতিতে মানুষ আজকের এই মুহূর্তের বিকাশের স্তরে উন্নীত। যে-মানুষের জিজ্ঞাসা নেই—কৌতূহল নেই, সে-মানুষ কেবল পোষা প্রাণীর মতো পরান্নজীবী ও পরবুদ্ধি-নির্ভর হয়ে যান্ত্রিক-ভাবে জীবনের দিনগুলো নষ্ট করে মৃত্যুর শিকার হয়। গোত্র বা জাতির সম্পর্কেও এ তথ্য প্রযোজ্য, তাই দুনিয়ায় আজো আদি আরণ্যমানব সুলভ এবং একদা-বর্দ্ধিষ্ণু বহু গোত্র আজ নিশ্চিহ্ন।

চেতনায় নতুন স্বপ্ন না জাগলে, নতুন কিছু চাওয়া কিংবা পাওয়া অসম্ভব। আগে অভাব-বোধ, পরে প্রাপ্তি-প্রয়াস, আগে পরিকল্পনা, পরে বাস্তবায়ন। চাওয়া-বিরহী পাওয়া-বস্তু সম্পদ নয়, কেননা উপযোগ-বুদ্ধি বিজড়িত নয় বলে তা আকেজো।

জীবনকে ঐশ্বর্য বলে যারা জানে, স্বাধীনতাকে তারাই সম্পদ বলে মানে। জীবনবৃক্ষে ফুল ফোটাবার জন্যে, ফল ফলাবার জন্যে স্বাধীনতা দরকার। বিকাশ কেবল স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বাধীনতার মধ্যেই সম্ভব। এ ব্যক্তিক জীবনে যেমন, জাতীয় জীবনেও তেমনি প্রয়োজন। অতএব, স্বাধীনতাকে যারা সম্পদরূপে আবিষ্কার করে না, অর্জন করে না, তাদের কাছে স্বেচ্ছাচার-স্বৈরাচারের অধিকারই স্বাধীনতা। তেমন মানুষের পক্ষে স্বাধীনতা অর্জন কিংবা রক্ষণ সম্ভব নয়, কেন না স্বাধীনতার উপভোগ-সামর্থ্য তার নেই বলেই স্বাধীনতার মূল্য-মহিমাও তার অজ্ঞাত এবং সে-কারণে স্বাধীনতার প্রসাদ তার অনায়ত্ত ও অনাস্বাদিত।

স্বাধীনতা অনুভবের ও উপভোগের সম্পদ। এর জন্যে যোগ্যতা প্রয়োজন, বাষ্টি মনে ব্যক্তিক, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রিক ও নৈতিক দায়িত্ব-চেতনা এবং কর্তব্যবুদ্ধি স্পষ্ট হয়ে না জাগলে এবং ব্যক্তি-মানুষ তা পালনে নিষ্ঠ না হলে প্রাপ্তির ও ভোগের দাবি ও অধিকার জন্মায় না, দাবির সঙ্গে দায়িত্ব ও অধিকারের সঙ্গে কর্তব্য বর্তায়।

অন্যায়, অসুন্দর ও অকল্যাণের প্রতি ঘৃণা, বিবেক-বুদ্ধির আনুগত্য, দায়িত্ববোধ ও কর্তব্য-বুদ্ধি, দাবি ও অধিকার-চেতনা প্রভৃতিই নাগরিকের যোগ্যতার নিদর্শন। এমনি মানুষই কেবল স্বাধীনতা অর্জন, রক্ষণ ও উপভোগের যোগ্য। মানুষের প্রতি ভালোবাসাই সব কল্যাণ-চিন্তার ও সুফলপ্রসূ কর্মের উৎস। সেবা, সততা ও ত্যাগবৃত্তি ঐ ভালোবাসারই প্রসূন।

আগের যুগে স্বদেশী, স্বধর্মী ও স্বজাতি দেশের শাসক হলেই লোকে নিজেদের স্বাধীন বলে গর্ববোধ করত।

আদিকালে স্বাধীনতা ছিল কেবলই গৌরব-গর্বের বিষয়, গণমানবের তেমন কোন বৈষয়িক সুখ-সুবিধা প্রত্যক্ষভাবে কিংবা লক্ষণীয়ভাবে স্বাধীনতা-সংলগ্ন ছিল না। এ যুগে রাষ্ট্রিক স্বাধীনতা সামগ্রিকভাবে প্রতি

মানুষের জীবন-জীবিকা বিজড়িত। আজকের দিনে স্বাধীনতা ব্যষ্টি-মানুষের অস্তিত্বেরই অপরিহার্য অঙ্গ। এই নতুন তাৎপর্যে স্বাধীনতা মানুষের জীবনে জীবিকায় নিরাপত্তার, স্বাচ্ছন্দ্যের ও বিকাশের ভিত্তি ও অবলম্বন। এ কারণেই সামরিক স্বনির্ভরতা ও আর্থিক স্বয়ম্ভরতাই হচ্ছে এ যুগের স্বাধীন সার্বভৌম তথা অনপেক্ষ শক্তির প্রতীক।

তাই স্বাধীনতা উপভোগের জন্যে অনুকূল প্রতিবেশ সৃজন করতে হয়—যে-প্রতিবেশে থাকবে ব্যক্তি-জীবনে মর্যাদা ও স্বাতন্ত্র্য, সামাজিক জীবনে সাম্য ও স্বাধীনতা, সাংস্কৃতিক জীবনে শ্রেয়ঃ বরণের ও সংস্কার বর্জনের প্রবণতা, জীবিকার ক্ষেত্রে সমসুযোগ ও সুবিচার, রাষ্ট্রিক জীবনে দায়িত্ব-নিষ্ঠা ও অধিকার-চেতনা। আমাদের চেতনার মধ্যে স্বাধীনতার এ গুরুত্ব সম্যকস্বরূপে ধারণ করা আশু-প্রয়োজন। তা'হলেই দুর্লভ চরিত্র ও সুদুর্লভ স্বাচ্ছন্দ্য আমাদের আয়ত্তে আসবে।

একগুচ্ছ প্রশ্ন

পাকিস্তান আমলে ২১শে ফেব্রুয়ারী তথা ভাষা আন্দোলনের শহীদদের স্মৃতিচারণ আমাদের আত্মসম্মানবোধ জাগ্রত করার, জাতিসত্তার স্বাতন্ত্র্য রক্ষার, স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার ও সংগ্রামী-চেতনা অর্জনের জন্যে বিশেষ প্রয়োজন ছিল। সে-দিন তা ছিল উদ্দীপনার, উত্তেজনার ও স্বাতন্ত্র্য-চেতনার উৎস। স্বাধীন বাঙলাদেশে সে-সব চুকে গেছে। আজ একুশে ফেব্রুয়ারীর পার্বণিক উদ্‌যাপন আমাদেরকে কেবল বিজয়ী ও কৃতার্থম্মন্যের আত্মপ্রসাদ দিতে পারে। এই ঐতিহ্যস্মৃতির রোমন্থন-সুখ নতুন কোন লক্ষ্যের সন্ধান কিংবা আকাঙ্ক্ষার জন্ম দেবে না। দেশে আজ ২১শে ফেব্রুয়ারী মোহররমের মতো তাৎপর্যহীন পার্বণে এবং শহীদমিনারগুলো পৌরাণিক পবিত্রতায় ইমামবাড়া বা বুদ্ধস্তূপের মতোই শোভা পাবে। এই নির্লক্ষ্য আচরণের নাম আচার, তাৎপর্যভ্রষ্ট অনুস্মৃতির নাম প্রথা। দুটোই বন্ধ্যা এবং জীবনে বোঝা ও বাধা। অতীতাশ্রয়ী মনে অর্থাৎ ঐতিহ্যের গৌরবগর্বী মনে একপ্রকার তৃপ্তম্মন্যতা আসে, তার অনুভব-সুখ মানুষকে উদ্যমহীন ও উদ্যোগ-বিরহী করে তোলে। যেমন, ধনীর সন্তান আলস্যসুখে অভিভূত থাকে। অর্জনে সম্পদবৃদ্ধির আন্তঃপ্রেরণা সে অনুভব করে না অভাবজাত যন্ত্রণাবোধ থাকে না বলেই।

কাজেই যার এগিয়ে যেতে হবে, তার সুখস্মৃতির জন্যে কিংবা গৌরব-গর্বের জন্যে বারবার ও ঘনঘন পিছু তাকালে চলে না। রক্তক্ষরা লড়াইয়ের ভেতর দিয়ে স্বাধীনতা এসেছে, লোক তো মরবেই, কিন্তু স্বাধীনতাও চাইব আর লড়িয়ে মৃতের জন্যে বারোমাস অনিবার নানা ছলে কাঁদব—এ বীরধর্ম তো নয়ই, স্বস্থ ও সুস্থ মানব-স্বভাবও নয়। প্লেটোর রিপাবলিকে এ বিলাপের কুফল সম্বন্ধে উচ্চারিত বাণী স্মর্তব্য।

গৃহগত জীবনে মানুষের মা-বাপ, ভাইবোন, ছেলেমেয়ে মরে, তাই বলে কি তারা সারাজীবন ধরে প্রিয়জনের জন্যে কাঁদে, না সর্বক্ষণ তাদের স্মরণ করে কাজে ও কর্তব্যে অবহেলা করে?

বিগত দুই বছর ধরে আমরা যে উৎসাহে প্রায় প্রত্যহ জাতীয় বিলাপ-ব্রত উদ্‌যাপন করছি, তাতে আমাদের বিমূঢ় বন্ধ্যা মন ও অসুস্থ জীবন-দৃষ্টির পরিচয় মেলে।

তাও আমরা সব নিহত মানুষের জন্যে দুঃখ করিনে। কেবল 'বুদ্ধিজীবী' সংজ্ঞাভুক্ত শিক্ষিত লোকদের জন্যেই সভা করে কাঁদি। তাদের পরিবার-পরিজনদের কথাই ভাবি। আফসোসটা যেন এই—ওরা বাঙালী মারবেই যদি, তা'হলে মুটে-মজুর-চাষীদের মেরেই সাধ মিটাল না কেন, ভদ্দর লোকের প্রাণে হাত দিল কেন? এ-ই হচ্ছে শিক্ষিত ও সমাজতন্ত্রী বাঙালী-মনের স্বরূপ! সারা দেশে ভদ্রলোক মরেছে কয় জন; আর অশিক্ষিত বলি হয়েছে কত? তাদের খবর নিল কে? তাদের বউ কি বিধবা হয় নি? তাদের সন্তান কি এতিম হয়নি? তারা কি সরকারী-বেসরকারী বৃত্তি পেয়েছে? তারা কি করে খায় জানবার কৌতূহল আছে কি কারো?

সৈনিকের নারীধর্ষণ কি অভিনব উপসর্গ, দেশে নারীসঙ্গ সহজলভ্য না হলে কিংবা বেশ্যালয় না থাকলে জৈব প্রয়োজনেই মানুষ কি ব্যভিচারের পথ করে নেয় না? হোটেলে ক্যাবারে বারবনিতা যোগাড় হয় না? তালাক দেয়া নারী বা বিধবা বিয়েতে যে-মুসলমানের কোনকালেই অরুচি ছিল না, সে-মুসলমান অনিচ্ছায় ধর্ষিতা নারীকে স্ত্রীরূপে-বধূরূপে গ্রহণ করতে এগিয়ে এল না কেন? কাজ দিয়ে অশন বসনের সমস্যা মিটিয়ে দিলেই কি নারীর সামাজিক মর্যাদা রক্ষিত হয় কিংবা যৌবন-জাত জীবন-সমস্যা মেটে? গৃহগত জীবনে জায়া-জননীর অধিকার-বঞ্চিতা নারীর ভাত-কাপড়ে কি সুখ?

তিথি স্নান, রথযাত্রা, উরস প্রভৃতি নানা উপলক্ষে যেমন আমাদের দেশে এক থেকে এক সপ্তাহব্যাপী পার্বণিক মেলা বসে, তেমনি ২১শে ফেব্রুয়ারী উপলক্ষেও জানুয়ারী থেকেই উৎসবের উদ্যোগ-আয়োজন চলতে থাকে। নিয়মিত পত্র-পত্রিকা ছাড়াও অসংখ্য পার্বণিক পত্রিকা বের হয়। তাতে ভাষা আন্দোলন ও শহীদ-সংপৃক্ত গল্প কবিতা নাটক প্রবন্ধ যা ছাপা হয়েছে, তা দিয়েই একটা ছোটখাট গ্রন্থাগার ভর্তি করা যাবে। তা ছাড়া ওয়াজী মৌলবীর মতো এসময় একদল বক্তা সর্বত্র অগ্নিগর্ভ জ্বালাময়ী ভাষায় ও বজ্রকণ্ঠে বক্তৃতা দিয়ে বেড়ান। এসব লিখিয়ে-বলিয়েরা সারাবছর

বাঙলা ভাষার উন্নতির জন্যে কিংবা গণহিতে কি কাজ করেন, সে-বিষয়ে কেউ প্রশ্ন তোলে না। তাঁরা নিজেরা কোন দায়িত্ব গ্রহণ কিংবা কর্তব্যপালন করেন না, কেবল উপদেশ খয়রাত করেন। এ করেই তাঁরা লোক-প্রিয় ও প্রখ্যাত।

আবার সাত কোটি অশিক্ষিত মানুষ যেখানে লিখিত ভাষার সঙ্গে সম্পর্কহীন, বাঙালীমাত্রেই যেখানে ঘরে বাইরে বাঙলা বুলিতে কথা বলছে, সেখানে নানা কারণে কয়েক হাজার বাঙালী অফিসের ফাইলে ও নিজেদের মধ্যে সরকারী বিষয়ে চিঠিপত্রে ইংরেজী লিখলে বাঙালীর সামাজিক, আর্থিক, কৃষি-শৈল্পিক, বাণিজ্যিক, নৈতিক ও বৈষয়িক জীবনে কি বৈনাশিক ক্ষতি হয়, আর বাঙলা সর্বকাজে ব্যবহৃত হলেই বা সামাজিক, আর্থিক ও বৈষয়িক জীবনে কোন্ সমস্যা মিটবে, কি পরমার্থ লাভ হবে, তা কেউ খুলে বলে না। এসব লিখিয়ে বলিয়ে বুদ্ধিজীবীরা গণ ও বয়স্কশিক্ষার কথা, নতুন কলকারখানা স্থাপনের কথা, কোন সমবায় প্রতিষ্ঠানের কথা, কোন যৌথ খামারের প্রস্তাব, এমনকি ভাগচাষীর তেভাগার কথাও উত্থাপন করেন নি। 'নাঙল যার জমি তার' ধ্বনি শুনলে তো তাঁরা ক্ষেপে যান। দেশ বলতে, জাতি বলতে, মানুষ বলতে কেবল মধ্যবিত্তকেই বোঝায়। ভাব-চিন্তা-কর্ম, শিক্ষা-সংস্কৃতি, শিল্প-বাণিজ্য, রাজনীতি-অর্থনীতি-বিদেশনীতি সবটাই শিক্ষিত মধ্যবিত্তের স্বার্থেই নিয়োজিত ও নিয়ন্ত্রিত। মধ্যবিত্তের জাগ্রত আত্মসম্মানবোধ অনাহত রাখবার জন্যেই স্বাধীনতা কাম্য হয়। তাদের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য-সাচ্ছল্যের জন্যেই বিদেশী শোষণ-মুক্তি জরুরী হয়ে উঠে। সমাজে তাদের প্রতিপত্তি লাভের জন্যেই মাথাগুন্‌তি ভোটের প্রয়োজনে গণতন্ত্র তাদের বাঞ্ছিত হয়। জনগণের প্রয়োজনের নামে তারা মেডিক্যাল-ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার প্রসার দাবি করে, কিন্তু গাঁয়ে যেতে চায় না, আত্মসুখ সন্ধানে বিদেশে পাড়ি জমায়। শহরের হাসপাতালে ভদ্রলোকদের সুবিধার জন্যে কেবিন বৃদ্ধির দাবি জানায়, বড় ডাক্তারের উপস্থিতি চায়, কিন্তু গাঁয়ে হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার দাবি জানায় না। স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসার কামনা করে, কিন্তু লোকশিক্ষার ব্যবস্থা বা বিস্তার দাবি করে না। মধ্যবিত্তদের কর্মসংস্থান ও বেতনবৃদ্ধির কথা বলে, গণমানবের কর্ম-সংস্থান কিংবা খোরপোষের কথা চিন্তা করে না। ভদ্রলোকের ছেলেরা নকল

করে বয়ে যাচ্ছে— সে-দুশ্চিন্তায় সবাই জর্জরিত ; গণমানবের শিক্ষার যে কোন ব্যবস্থাই নেই, সে কথা কেউ ভাবে না, শিক্ষিতদের বেকারত্ব ঘুচানোর জন্যে সমাজ-সরকারের মাথাব্যথার অন্ত নেই। অশিক্ষিত বেকারদের প্রাণে বাঁচিয়ে রাখার গরজও কেউ বোধ করে না। রেডিও-টি-ভি-ফোন-ফ্যান-ফ্রিজ-গ্যাস-সি-ট্রাক-মোটর-কোচ, আভ্যন্তরীণ বিমান পরিবহন প্রভৃতি কাদের প্রয়োজনে আসে! জাপানী টেট্রন কার জন্যে, বিলাস সামগ্রী কার ভোগের জন্যে, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান কিংবা প্রদর্শনী কার মনোরঞ্জনের তাগিদে, পনেরোখানা খবরের কাগজ কাদের স্বার্থে, সিমেন্ট-পেট্রোল আমদানী কাদের প্রয়োজনে, শিল্প-সাহিত্য-দর্শন-সংস্কৃতি সম্মেলন ও ক্রীড়া অনুষ্ঠান কোন্ শ্রেণীর মানুষের জন্যে, এমন কি কলকারখানা-ব্যবসা-বাণিজ্য চলে মুখ্যত কাদের স্বার্থে? গণমানবেরা কোন কোনটি থেকে পরোক্ষে উপকৃত হয় বটে, কিন্তু গণমানবের স্বার্থে একান্তই তাদের জন্যে সরকারও সহজে কিছু করে না। এভাবে দেখলে বোঝা যাবে, জীবনের সর্বক্ষেত্রে গণস্বার্থ গৌণ ও পরোক্ষ, আর মধ্যবিত্ত স্বার্থই মুখ্য ও প্রত্যক্ষ।

শহরে ভদ্রলোকের জন্যে এক বিঘার বাড়ি, চওড়া রাস্তা, পার্কের ব্যবস্থা রয়েছে, আর বস্তির এক বিঘা জমিতে গড়ে আড়াইশ' মানুষ বাস করে গেরস্থের বাথানের চেয়েও ছোট এবং নিকৃষ্ট ঘরে। চাকুরেদের জন্যে সরকার-নির্মিত বাসগৃহও থাকে, কিন্তু বস্তিবাসীর পক্ষে বিনে পয়সার প্রাকৃতিক আলোবাতাসের এক কণাও দুর্লভ। মধ্যবিত্তরা কি ওদের অধিকার ও দাবি স্বীকার করে? অতএব দেশের নামে, জাতির নামে এবং জনগণের নামে সমাজে সরকারে যা কিছু করা হয়, তা আসলে মধ্যবিত্তের স্বার্থে মধ্যবিত্তরাই করে। জমির খাজনা মাফ হয় মধ্যবিত্তেরই স্বার্থে। তেভাগার সুবিধেও যারা পেল না, সেই ভূমিহীন ভাগচাষীর কিংবা ক্ষেত মজুর কল-শ্রমিকের এতে কি লাভ হল? জমিদারি উঠে গেছে বটে, কিন্তু খাস জমি নামে-বেনামে রাখার ব্যবস্থা হল কাদের স্বার্থে? শহরে বাড়িভাড়া দিয়ে জমিদারের চাইতেও বড় ধনী হয় কারা? স্বস্বার্থেই এরা গণমানবকে উত্তেজনা দিয়ে দাঙ্গা বাধায়, ওদের দিয়ে সভা-মিছিল করিয়ে ওদের বাহুবলে ও ভোটবলে প্রতাপ-প্রতিপত্তি অর্জন করে। আর চিরকাল অজ্ঞ অসহায় মানুষকে প্রতারিত-প্রবঞ্চিত করে। শিক্ষার মাধ্যমে ওদের চোখ ফুটিয়ে না দিলে

স্বার্থসচেতন ও লাভ-ক্ষতির হিসেব নিপুণ হয়ে ওরা আপন প্রাপ্য কখনো দাবি করতে জানবেও না, পারবেও না। জাতীয় বাজেটের কয় পয়সা একান্তই ওদের স্বার্থে ব্যয় হয়? মধ্যবিত্ত শহুরেদের হল-হোস্টেল-ক্লাব-স্টেডিয়াম-জিমনেসিয়াম-সাঁতার সরঃ-সরোবর তৈরী করতে ও টিকিয়ে রাখতে যত খরচ হয়, তার সিকিভাগ অর্থে একটা জিলার বয়স্কশিক্ষা সম্পন্ন হতে পারে। দেশ গরীব বটে, কিন্তু ক্ষুদ্র-বৃহৎ যে-কোন কাজ শুরু করার আগে ইমারত চাই, ধনে কাঙাল হলে কি হয়, সরকার কিন্তু মনে-মেজাজে সামন্ত। অল্পে ও অনাড়ম্বরে তার সুখ নেই। সে তার সাধ ও সাধ্যের অসঙ্গতিকে মনে ঠাই দেয় না। তাই লক্ষ্য 'মারি তো গণ্ডার, আর লুটি তো ভাণ্ডার।' এজন্যে কোন এক গাঁ, ইউনিয়ন, থানা বা মহকুমা পর্যায়েও কোন জনকল্যাণমূলক কাজ করা সম্ভব হলেও গোটা দেশে করা সম্ভব নয় বলে, তাও করে না।

মধ্যবিত্তরা দেশ, জাতি ও জনগণের স্বার্থের জিগির সর্বক্ষণ মুখে জিইয়ে রাখে বটে, কিন্তু কর্ম ও আন্দোলন সবটাই স্বস্বার্থ লক্ষ্যেই করে। তারা এমন বিবেকহীন অমানুষ যে, ঝড়-বন্যা-মারীগ্রস্ত মুমূর্ষু গণমানবের ত্রাণের জন্যেও গাঁটের পয়সা ছাড়তে চায় না। নাচ-গান-নাটক-সিনেমা-ক্রীড়ার চ্যারিটি শো' করে তাদের থেকে পয়সা আদায় করতে হয়। কি বর্বর মন ও অমানবিক রুচি তাদের! ক্ষুধিত মুমূর্ষু মানবতা তাদের বিবেক বিচলিত করে না, ত্রাণ তহবিলে স্বেচ্ছায় পয়সা দেয় না – প্রভুর মনোরঞ্জনের জন্যে প্রতীকি প্রণামী রাখে। লক্ষ কোটি মানুষের যন্ত্রণার সময়েও তাদের আনন্দ-আমোদ উপভোগে লজ্জা হয় না।

স্বাধীনতা-উত্তরকালেও আমাদের ভাব-চিন্তা-কর্ম পুচ্ছগ্রাহিতা দুষ্ট, আবর্তনক্লিষ্ট ও অনুকৃতিপ্রবণ। নতুন কিছু আগে ভাবার, আগে বলার ও আগে করার সাধ-সাধ্য যেন কারো নেই, সবার যেন বন্ধ্যা মন ও ভোঁতা রুচি, সবাই যেন কৃতার্থম্মন্য ও অতীত স্মৃতিরোমন্থন সুখে অভিভূত। জাগরণের, উদ্যমশীলতার, কল্যাণবুদ্ধির, মানবপ্রীতির, গণদরদের, উন্নয়নকামীর ও উঠতি-বাঞ্ছার লক্ষণ এ নিশ্চিতই নয়।

বাঙালীর মনন-বৈশিষ্ট্য

সমবেত দর্শনবিৎ ও সুধীবৃন্দ

দর্শন আমার অধীত বিষয় নয়। দর্শনচর্চায় আমি অনধিকারী। কিন্তু ক্রিয়া বিশ্লেষণ করে কারণ আবিষ্কার কিংবা লক্ষণ বিচার করে রোগ নির্ণয় ও নিদান নিরূপণ যেমন সম্ভব, তেমনি বাঙালীর আচার-আচরণে যে নীতি-আদর্শ অভিব্যক্তি পেয়েছে, তার বৈশিষ্ট্য অনুধাবন করে বাঙালী-য়ানার বা বাঙালীত্বের স্বরূপলক্ষণ জানা যাবে,—এ বিশ্বাসে আমি বাঙালীর ঐতিহাসিক আচরণের ধারা অনুসরণ করছি। এ বাঙালীর কোন্ জীবন-দৃষ্টির ও জগৎভাবনার ইঙ্গিত বহন করে—তার দার্শনিক স্বরূপ নিরূপণের দায়িত্ব দর্শনশাস্ত্রবিদ্‌দের।

প্রাণী মাত্রই বাঁচতে চায়, আর বাঁচার প্রয়োজনেই আসে আত্মরক্ষা ও আত্মপ্রসারের বুদ্ধি ও প্রয়াস। অন্য প্রাণীর কাছে তা সহজাত বৃত্তি-প্রবৃত্তিমাত্র, মানুষের তা-ই জীবনসাধনা।

যেখানে অজ্ঞতা সেখানেই ভয়-বিস্ময়-অসহায়তা। তাই জীবনের নিরাপত্তার জন্যে জীবনকে ও জীবনপ্রতিবেশকে চেনা-জানার মানবিক প্রয়াসও শুরু হয়েছে মানুষের আদিম অবস্থাতেই। মানব শিশুর মতো মানবিক প্রয়াসও হাত-পা নাড়ার, হামাগুড়ির ও হাঁটতে শেখার স্তর অতিক্রম করে আজকের অবস্থায় উন্নীত হয়েছে। যেখানে উদ্যোগী-উদ্যমশীল বুদ্ধিমান মানুষ সুলভ ছিল, সেখানকার সমাজের বিকাশ হয়েছে দ্রুত। এভাবে কেউ সৃজন করে আর কেউ অনুকরণ করে এগিয়েছে। যারা সৃজনও করতে পারেনি, গ্রহণও করেনি, সেই আরণ্য-মানব আজো প্রায় আদিম স্তরেই রয়ে গেছে।

মানুষের মন-বুদ্ধি-প্রয়াস নিয়োজিত হয়েছে দুই ভাবে—ব্যবহারিক জীবনের প্রয়োজন মিটানোর কাজে এবং মননের উৎকর্ষসাধনে। মূলত সবটাই ছিল জীবন-জীবিকা সংপৃক্ত। বিকাশের ধারায় জীবন যখন বিস্তৃতি ও বৈচিত্র্য পেয়ে পেয়ে জটা-জটিল হয়ে উঠল, তখন তনু-মনের চাহিদা

বাস্তব ভিন্ন হয়ে দেখা দিল। একদিকে আজ গ্রহাভিসারী যন্ত্র যেমন দেখছি, অন্যদিকে অস্তিত্ববাদাদি নানা তত্ত্ব-চিন্তারও তেমনি উদ্ভব হয়েছে। অজ্ঞতাপ্রসূত ভয়-বিস্ময়-কল্পনাই ক্রমে মানুষকে কারণ-ক্রিয়া সচেতন করে তোলে। ভয়-বিস্ময় থেকে যে-জিজ্ঞাসার উৎপত্তি এবং অজ্ঞের কল্পনা দিয়ে তার উত্তরস্বরূপ যে-জ্ঞান লব্ধ, তা কখনো যথার্থ হতে পারে না। তবু কৌতূহলী মন বুঝ মানে না। তাই চাওয়া ও পাওয়ার, সাধ ও সাধ্যের, প্রয়াস ও প্রাপ্তির অন্তরায়রহস্য মানুষকে ভাবিয়ে তুলেছে। সেই ভাবনা সর্বপ্রাণবাদ, যাদুবিশ্বাস, টোটেম-টেবু তত্ত্ব প্রভৃতির জন্ম দিয়েছে। তার বিশুদ্ধ ও পরিশীলিত রূপ পাই পুরাতত্ত্বে বা Metaphysics-এ। অদৃশ্যকে দেখার, অধরাকে ধরার, অচিন্ত্যকে চিন্তাগত করার, অজ্ঞেয়কে জানার এই প্রয়াস নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে অসাফল্যে বিড়ম্বিত। তবু 'নিশি-পাওয়া' লোকের মতো কিংবা বিবাগীর মতো পথ চলে পথের দিশা খুঁজে অনিঃশেষ পথে বিচরণের আনন্দটাকে বিশ্বাসীজন জীবনের পরম সার্থকতা বলেই মানে।

জ্ঞানের অনুপস্থিতিতে বিশ্বাসের জন্ম। বন্ধ্যা মনেই বিশ্বাসের লালন, যুক্তিহীনতায় বিশ্বাসের বিকাশ। কাজেই যুক্তি দিয়ে বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা পুতুলে চক্ষু বসিয়ে দৃষ্টিশক্তি দানের অপপ্রয়াসেরই নামান্তর।

কিন্তু চিরকাল অজ্ঞ-অসহায় মানুষ বিশ্বাসকে আশ্রয় করে জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রে ভরসা পেতে চেয়েছে, চেয়েছে নিশ্চিন্ত হতে। তাই তার কল্পনালব্ধ জ্ঞান তাকে চিরকালই আশ্বস্ত করেছে।

এই জ্ঞানই তাৎপর্যমণ্ডিত হয়ে প্রজ্ঞা নামে হয়েছে পরিচিত। এবং জ্ঞান-প্রজ্ঞাশ্রয়ী শাস্ত্রই ধর্ম ও ধর্মবোধ রূপে সমাজে পেয়েছে স্থিতি। শাস্ত্র অবশ্য সেদিন গোত্রীয় দ্বন্দ্ব ঘুচিয়ে বৃহত্তর গণসমাজ গড়ে তুলে মানুষের বিকাশ ত্বরান্বিত করেছিল। তাই তখনকার শাস্ত্রের কালিক উপযোগ অবশ্য স্বীকার্য। এই Metaphysical জ্ঞান-তত্ত্ব বিশ্বাসের অঙ্গীকারে দৃঢ়মূল হয়ে আচার-সংস্কারে পরিণতি পায়। তখন লালিত বিশ্বাস-সংস্কারই মানুষের জীবনযাত্রার ভিত্তি ও জীবন যাপনের দিশারী হয়ে উঠে। তখন বিশ্বাস-সংস্কারের নিয়ন্ত্রণেই মানুষের জীবন যান্ত্রিকভাবে হয় চালিত। তখন তনুর জীবন ও মনের জগৎ হয়ে পড়ে আলাদা। এবং মানুষ তখন তনুকে

তুচ্ছ জেনে মনকে করে তোলে উচ্চ। তেমন স্তরের মনের প্রেরণায় উচ্চারিত হয়—

> "বিনা-প্রয়োজনের ডাকে
> ডাকব তোমার নাম
> সেই ডাকে মোর শুধু শুধুই
> পুরবে মনস্কাম।"

এই Metaphysical তত্ত্বের প্রসারে পাই Philosophy. Philosophy'র সাধারণ অভিধা হচ্ছে 'প্রজ্ঞা-প্রীতি', 'দর্শন'-এর সাধারণ লক্ষ্য অদৃশ্যকে দেখা। দুটোই মূলত এক,—চেতনার গভীরে জীবন সংপৃক্ত জগৎকে কিংবা জগৎ-প্রতিবেশে জীবনকে তার সামগ্রিক স্বরূপে ও তাৎপর্যে উপলব্ধি বা ধারণ করার চেষ্টা।

সাধারণভাবে দর্শন শাস্ত্রাশ্রয়ী অর্থাৎ শাস্ত্রের তাত্ত্বিক তাৎপর্য সন্ধানই ছিল দার্শনিকদের লক্ষ্য। এতে যে প্রত্যয়ানুগত্য, প্রতিজ্ঞানুসরণ ও লক্ষ্য-নির্দিষ্টতা ছিল, তাতে সংকীর্ণ-সরণীতে মানস-বিচরণ সম্ভব ছিল বটে, কিন্তু নিরপেক্ষ, অনপেক্ষ কিংবা সার্বিক শ্রেয়সের তত্ত্ব থাকত অনায়ত্ত। বলতে গেলে পুরোনো কালে কেবল গ্রীসে ও ভারতেই বিশুদ্ধ তত্ত্বচিন্তা কিছুকাল প্রশ্রয় পেয়েছিল।

কোন সীমিত চিন্তাই অখণ্ড তত্ত্ব বা সত্যের সন্ধান পায় না। শাস্ত্রীয় দর্শনও তা-ই দেশ-কাল-জাত বর্ণ-গোত্রের ছাপ এড়িয়ে সর্বজনীন হতে পারেনি। আবার বিশুদ্ধ তত্ত্ব-চিন্তাও শাস্ত্রানুগত বিশ্বাসী মানুষকে তার সংস্কার-লালিত পুরোনো প্রত্যয়ের দুর্গ থেকে মুক্ত করতে পারে না। তাই দর্শন-চর্চা ব্যক্তিক রুচি, মন ও মনন যতটা উন্নত ও প্রসারিত করে, সমাজ-মনে তার প্রভাব ততটা পড়ে না। তবু একসময় আচার-সংস্কাররূপে তার তাত্ত্বিক প্রভাব গোটা সমাজ-মানসকে চালিত করে। দর্শনের গুরুত্ব ও সার্থকতা তাই অপরিমেয়। বলা চলে মনুষ্য সংস্কৃতির উৎকর্ষ পরোক্ষে দর্শন ও দার্শনিকেরই দান।

ভূমিকা না বাড়িয়ে এবার বাঙলার ও বাঙালীর দর্শনের কথা বলি।

বাঙালীরা রক্তসঙ্কর জাতি। বিভিন্ন গোত্রীয় রক্তের আনুপাতিক হার অবশ্য আজো অনির্ণীত। তবু প্রমাণে-অনুমানে বলা চলে শতকরা সত্তরভাগ

অষ্ট্রিক, বিশভাগ ভোট চীনা, পাঁচ ভাগ নিগ্রো এবং বাকী পাঁচভাগ অন্যান্য রক্ত রয়েছে বাঙালী-ধমনীতে। বাঙলাদেশও ভারতের প্রত্যন্ত অঞ্চল এবং ভৌগোলিক বিচারে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ারই অন্তর্গত। বাস্তত প্রায় আড়াই হাজার বছর ধরে শাস্ত্র, শাসন ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে উত্তর ভারত-প্রভাবিত হলেও অন্তরে এর মানস-স্বাতন্ত্র্য এবং স্বভাবের বৈশিষ্ট্য কখনো হারায়নি। মিশ্ররক্তপ্রসূত স্বভাবের সাঙ্কর্যই হয়তো বাঙালীর এই অনন্যতার কারণ। অবশ্য তার সবটা কল্যাণপ্রসূ হয়নি কখনো।

জৈন-বৌদ্ধ-ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্র বরণের মাধ্যমে বাঙালীর সঙ্গে উত্তর-ভারতীয় ভাষা-সংস্কৃতি-সভ্যতার পরিচয় ঘটে। এভাবেই বাঙালীর আর্যায়ন সম্ভব হয়। এতে বর্বর যুগের বাঙালীর ভাষা-পোশাক, বিশ্বাস-সংস্কার, নিয়মনীতি, প্রথা-পদ্ধতির প্রায় সবখানিই বাহ্যত পরিত্যক্ত হয়। তবু থেকে গেছে বিশ্বাস-সংস্কারের অনেকখানি—যার স্থিতি বাঙালীর মর্মমূলে। এই থেকে-যাওয়া অবিমোচ্য স্বাতন্ত্র্য ও স্ব-ভাবই তার অনন্যশক্তির উৎস এবং স্বতন্ত্র-স্থিতির ভিত্তি।

বাঙালী বিদেশী ধর্ম গ্রহণ করেছে বটে, কিন্তু কোন ধর্মই সে অবিকৃত রাখেনি। জৈন, বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও ইসলামকে সে নিজের পছন্দমতো রূপ দিয়ে আপন করে নিয়েছে। নৈরাত্ম্য নিরীশ্বর বৌদ্ধধর্ম এখানে মন্ত্রযান, কালচক্রযান, বজ্রযান-সহজযানে বিকৃতি ও বিবর্তন পায়। বৌদ্ধ চৈত্য হয়ে উঠে অসংখ্য দেবতা-অপদেবতার আখড়া। জৈনধর্ম পরিত্যক্ত হয়, ব্রাহ্মণ্যধর্মও স্থানিক দেবতা-উপদেবতা-অপদেবতার প্রবল প্রতাপের চাপে পড়ে যায়। ইসলামও ওয়াহাবী-ফারায়েজী আন্দোলনের আগে পীরপূজায় অবসিত হয়। বিদ্বানেরা এর নাম দিয়েছেন লৌকিক ইসলাম। উল্লেখ্য যে, এসব দেবতা-পীর ঐহিক জীবনেরই ইষ্ট বা অরিদেবতা—পারত্রিক পরিত্রাণের নয়। এতেই বোঝা যায় বাঙালী ঐহিক জীবনবাদী অর্থাৎ জীবন-জীবিকার নিরাপত্তা ও স্বাচ্ছন্দ্যকামী—ভোগলিপ্সু। অবশ্য সব ধর্মই কালে কালে স্থানে স্থানে বিকৃত হয়, কিন্তু বাঙালীর ধর্মের বিকৃতিতে বাঙালী-স্বভাব ও মনন যত প্রকট, এমনটি অন্যত্র বিরল। বাঙালী তার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করতে পেরেছে, তার কারণ বাঙালী কখনো তার অনার্য সাংখ্য, যোগ ও তন্ত্র নামের দর্শনে ও চর্যায় তার আস্থা ও

আনুগত্য হারায়নি। ঐ নিরীশ্বর তত্ত্বে ও চর্যায় তার নিষ্ঠা কিছুতেই কখনো বিচলিত হয়নি। তার কারণ বাঙালী মুখে মহৎ বুলি আওড়ায় বটে, কিন্তু আসলে সে এ জীবনকেই সত্য বলে মানে এবং পারত্রিক সুখকে সে মায়া বলেই জানে। তাই সে এই মাটির মায়াসক্ত জীবনবাদী। সে বস্তুতান্ত্রিক, ভোগলিপ্সু, তাই সে সশরীরে অমরত্বকামী। এ জন্যেই সাংখ্যের প্রাণ-রসায়নতত্ত্ব, আয়ুবর্ধক যোগ ও শক্তিদায়ক তন্ত্র তার প্রিয় হয়েছে। চিরকালই তার সর্বপ্রকার জিজ্ঞাসা ও প্রয়াস জীবনভিত্তিক ও জীবনকেন্দ্রী। তার সাধনা বাঁচার জন্যেই। তাই সে দেহাত্মবাদী। সে জানে দেহাধারস্থিত চৈতন্যই জীবন। দেহ ও আত্মার আধার-আধেয় সম্পর্ক, একের অভাবে অপরের অস্তিত্ব অসম্ভব। তার কাছে ভবসমুদ্রে দেহ হচ্ছে মন-পবনের নাও। মন-পবনের সংস্থিতি ও সহস্থিতিই রাখে দেহ-নৌকা ভাসমান ও সচল। তবে যৌগিক চর্যার মাধ্যমে দেহবলে বায়ু সঞ্চালন আয়ত্তে রাখতে হয়। আর ভূতসিদ্ধির জন্যে তান্ত্রিক সাধনা। স্ব-স্ব আঙুলের মাপের চৌরাশি অঙুলি পরিমিত দেহ-নৌকাকে কাণ্ডারীর মতো স্বেচ্ছা-পরিচালনার শক্তি যে অর্জন করে সে-ই হচ্ছে চৌরাশি-সিদ্ধা। এ সাধনা ভোগলিপ্সুর দীর্ঘ-জীবনোপভোগের সাধনা। আত্মরতিই তার মূল জীবন-প্রেরণা। তাই স্ব-স্বার্থেই সে নিঃসঙ্গ সাধনা করে। আ . কল্যাণেই সে সদ্‌গুরুর দীক্ষা কামনা করে বটে, কিন্তু তার আত্মিক কিংবা অধ্যাত্ম-সাধনায় সমাজ-চেতনা নেই। এই জীবনতত্ত্ব তার বৈষয়িক জীবনকেও গভীরভাবে করেছে প্রভাবিত। বজ্রযানী ও সহজযানীরা ছিল যোগতান্ত্রিক—তাদের লক্ষ্যই ছিল আত্মকল্যাণ ও আত্মমোক্ষ। বজ্র-সহজযানীর উত্তর-সাধক সহজিয়া বৈষ্ণব কিংবা বাউলেরা আজো তাই ভোগমোক্ষবাদী। শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত প্রেমমোক্ষবাদও কোন পার্থিব কিংবা সামাজিক শ্রেয়সের সন্ধান দেয়নি। সবাই আত্মকল্যাণেই বৈরাগ্যবাদী। বাস্তব ও বৈষয়িক জীবনকে তুচ্ছ জেনে ঐসব পরান্নজীবী মোক্ষকামীরা বাঙালীর সমাজে-সংসারে বৈরাগ্য মাহাত্ম্য প্রচার করে বাঙালীর ক্ষতি করেছে অপরিমেয়। কেননা, যে মানুষ ভোগলিপ্সু অথচ কর্মকুণ্ঠ তার জীবিকা অর্জনের পথ দুটো—ভীরুর পক্ষে ভিক্ষা এবং সাহসীর জন্যে চুরি। বৈষয়িক দায়িত্বে ও কর্তব্যে ঔদাসীন্য ও ভিক্ষাজীবিতা এদেশে অধ্যাত্মসিদ্ধির রাজপথ বলে অভিনন্দিত

হয়েছে সেই ব্রাহ্মণ্য-বৌদ্ধ-জৈন মুনি-ঋষি-যোগী-শ্রমণদের আমল থেকেই। ফলে আজো ভিখিরীরা সাধু-ফকির রূপে সম্মানিত। এদেশের বামাচারী-ব্রহ্মচারী যোগী-সন্ন্যাসী কিংবা পীর-ফকিরেরা পারত্রিক শ্রেয়সের নামে মানুষকে দায়িত্ব ও কর্তব্যভ্রষ্ট করে বৈষয়িক জীবনকে বন্ধ্যা করে রাখতে চেয়েছে চিরকাল। জাগতিক কর্মে ও কর্তব্যে কখনো তাদের অনুপ্রাণিত করেনি কেউ। কিন্তু তত্ত্বকথা শুনতে ভাল হলেও তাতে জৈব প্রয়োজন মেটে না, তাই মানুষ প্রবৃত্তিবশেই জীবন ও জীবিকার ক্ষেত্রে আত্মকল্যাণ খুঁজেছে। বহুজন-হিতে বহুজন-সুখে যেহেতু কখনো সংঘবদ্ধ প্রয়াসের প্রেরণা মেলেনি, সেহেতু বাঙালীমাত্রই ব্যক্তিক লাভ ও লোভের সন্ধানে ফিরেছে কালো পিঁপড়ের মতো। সামাজিক কিংবা রাষ্ট্রিক জীবনে সামগ্রিক কল্যাণলক্ষ্যে যে যৌথ প্রয়াস আবশ্যিক, তার অভাবে বাঙালী কখনো মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেনি স্বতন্ত্র কিংবা স্বাধীনভাবে। তাই সে চিরকাল বিদেশী-বিভাষী-শাসিত ও শোষিত। বিরুদ্ধ পরিবেশে তার বুদ্ধি ধূর্ততায়, তার উদ্যম স্বার্থপরতায়, তার শক্তি ঈর্ষায়, অসূয়ায় ও পরস্বাপহরণে অবসিত। এবং সে আত্মপ্রত্যয়হীন হয়ে দেবানুগ্রহে ও পরানুগ্রহে বাঁচতে অভ্যস্ত হয়েছে। তাই জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রে সে স্বস্পষ্ট দেবাশ্রিত। লৌকিক দেবতা ও কাল্পনিক পীরপূজার উদ্ভব ও প্রসার বাঙলাদেশে এভাবেই ঘটেছে এবং ঘটেছে অন্তত ঐতিহাসিকভাবে বৌদ্ধযুগ থেকে। জীবন-জীবিকার অনুকূল ও প্রতিকূল শক্তিকে তোয়াজে-তোষামোদে তুষ্ট রেখে দেবানুগ্রহে নিশ্চিন্ত-নিষ্ক্রিয় জীবনোপভোগকামী বলেই কর্ম ও কর্তব্যের ক্ষেত্রে আত্মশক্তির ও পৌরুষের প্রয়োগ বাঙালী জীবনে বিরলতায় দুর্লভ।

অতএব কর্মকুণ্ঠ ভোগলিপ্সু বাঙালীর জীবনচেতনা ও জগৎভাবনা দু'ভাবে প্রকটিত হয়েছে : এক, দীর্ঘজীবনলাভ ও জীবনকে নির্বিঘ্নে উপভোগ-বাঞ্ছায় অলৌকিক শক্তিধর হবার জন্যে দেহাত্মবাদী বাঙালীর যোগতান্ত্রিক সাধনায় এবং তুক-তাক, বাণ-টোনা, ঝাড়-ফুঁক, দারু উচাটন, যাদুমন্ত্র, কবজ-মাদুলী, মারণ-বশীকরণ প্রভৃতির অনুশীলনে ও প্রয়োগে ; দুই, বিভিন্ন শক্তি ও ফলপ্রতীক স্বস্পষ্ট লৌকিক দেবতা ও পীরের স্তুতি-স্তাবকতায়। এবং সবটাই চলেছে বিদেশাগত বৌদ্ধ-ব্রাহ্মণ্য ও ইসলামী শাস্ত্রের নামে।

যদিও তখনো মূল শাস্ত্রগুলোও শাস্ত্রবিদ ও সমাজপতির স্বার্থে ক্ষীণভাবে চালু ছিল।

ধর্মদর্শনের ক্ষেত্রে বাঙলায় স্মরণীয় পুরুষ বিরল ছিলেন না। মীননাথ-গোরক্ষনাথ--শীলভদ্র-দীপঙ্কর--অম্বরনাথ হাড়িপা-কানুপা-রামনাথ--রঘুনাথ-রঘুনন্দন-চৈতন্য-রামমোহন-রামকৃষ্ণ প্রমুখ অনেকেই বাঙালী মনীষার প্রমূর্ত প্রতীক। কিন্তু এঁদের দেহাত্মবাদ, নির্বাণবাদ, মোক্ষবাদ, প্রেমবাদ, সেবাবাদ কিংবা শাস্ত্রানুগত্য মাটির মানুষের কোন জাগতিক কল্যাণ সাধন করে নি।

মধ্যযুগে বিজাতি-বিদেশী-বিভাষী বিধর্মীর ধর্ম-সমাজ-সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয়ের ফলে ব্রাহ্মণ্য সমাজের নিজিত শ্রেণীর মধ্যে যে চেতনা, চাঞ্চল্য ও দ্রোহ দেখা দিল, উত্তর-ভারতীয় আদলে ইসলামী সাম্য ও সুফীতত্ত্বের অনুসরণে বৌদ্ধ ঐতিহ্যের দেশ বাঙলায় চৈতন্যদেবের প্রেমধর্ম প্রচারের মাধ্যমে তা রূপ পেল। এই বৈরাগ্যপ্রবণ প্রেমবাদ সেদিন ব্রাহ্মণ্য সমাজের ভাঙন এবং ইসলামের প্রসার রোধ করেছিল বটে, কিন্তু তা পরিণামে বাঙালীর পক্ষে কল্যাণকর হয়নি, আবার উনিশ শতকে কোলকাতার ম্লেচ্ছস্পর্শ দোষে সমাজ পরিত্যক্ত ভদ্রলোকদের হিন্দু রাখার প্রত্যক্ষ প্রেরণায় রামমোহন প্রবর্তন করেন ব্রাহ্মমত। উভয়ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছিল বটে, কিন্তু কোনটাই সমাজ-বিপ্লবের রূপ নিয়ে বাঙালী জীবনে সামগ্রিক প্রভাব বিস্তার কিংবা চেতনায় নবরাগ সৃষ্টি করতে পারে নি।

বাস্তব ও বৈষয়িক জগৎকে আড়াল করে দেহাত্মবাদী বাঙালী নিঃসঙ্গ-ভাবে যে আত্ম ও আত্মিক উন্নয়ন কামনা করেছে, প্রাচীন ও মধ্যযুগে তা মনন ও অধ্যাত্মক্ষেত্রে গৌরব-গর্বের বিষয় ছিল। তার মনন ও জীবনদৃষ্টি ঐহিক-পারত্রিক সুখলোভী আস্তিক মানুষের আত্ম-প্রীতিপ্রবণ চাহিদা মিটিয়েছিল। এদেশে আজীবিক ছিল, কপিল চার্বাকচেলা নাস্তিক ছিল, বৌদ্ধ নির্বাণবাদপ্রসূত উচ্চ দার্শনিক চিন্তার প্রসূন শূন্য ও বজ্রতত্ত্ব উদ্ভূত হয়েছিল। গুণরত্ন-চেলাদের লোকায়তিক দর্শন বিকাশ পেয়েছিল। প্রতিবেশী ভোট-চীনার প্রভাবে যোগ-তান্ত্রিক সাধনাও প্রাধান্য পেয়েছিল। আজো বাঙালীর অধ্যাত্মসাধনামাত্রই যোগ-তন্ত্রভিত্তিক। শ্রীচৈতন্যের অচিন্ত্যদ্বৈতাদ্বৈতবাদ, গৌড়ীয় ন্যায়, গৌড়ীয় স্মৃতি, পীর-নারায়ণ সত্যের

অভিন্ন অঙ্গীকারে মানুষের মিলনসাধনা, শাক্তদের নবমাতৃতত্ত্ব—রাম প্রসাদ-রামকৃষ্ণে যার বিকাশ, রামমোহনের ব্রহ্মবাদ প্রভৃতি মননক্ষেত্রে বাঙালীর বিক্রত ও অক্ষয় কীর্তি।

আধুনিক সমাজ-বিজ্ঞানীরা হয়তো বাঙালী মননের ঐ ধারায় ত্রুটি আবিষ্কার করবেন। তাঁরা বলবেন, চিরশোষিত দারিদ্র্যক্লিষ্ট লোকজীবনের যন্ত্রণামুক্তির অবচেতন অপপ্রয়াসে অসহায় মানুষ অধ্যাত্মতত্ত্বে স্বস্তি ও শক্তির, প্রবোধ ও প্রশান্তির প্রশ্রয় কামনা করেছে। এভাবে পার্থিব পরাজয়ের ও বঞ্চনার ক্ষোভ ও বেদনা ভুলবার জন্যে আসমানী চিন্তার মাহাত্ম্য-প্রলেপে বাস্তবজীবনকে আড়াল করে ও তুচ্ছ জেনে মনোময় কল্পলোক রচনা করে সেই নির্মিত ভুবনে বিহার করে সার্থককাম ও আনন্দিত হতে চেয়েছে পৌরুষহীন, কর্মকুণ্ঠ, দুস্থ ও দুঃখী মানুষ। কিন্তু রক্তসঙ্কর বাঙালীর মন ও রুচি আলাদা। কবির ভাষায় তার বক্তব্য হয়তো এরূপ :

এ ধরার মাঝে তুলিয়া নিনাদ
চাহিনে করিতে বাদ প্রতিবাদ
যে কদিন আছি মানসের সাধ
মিটাব আপন মনে।
যার যাহা আছে তার থাকা তাই
কারো অধিকারে যেতে নাহি চাই
শান্তিতে যদি থাকিবারে পাই
একটি নিভৃত কোণে।

দেহতাত্ত্বিক বাঙালীর বিশ্বাস 'যা আছে ব্রহ্মাণ্ডে, তা-ই আছে দেহভাণ্ডে'। তাই আজো সে দেহাধারে সব-পাওয়ার সাধনা করে। তাই রবীন্দ্রনাথও বলেন—

আপনাকে এই জানা আমার
ফুরাবে না
এই জানারই সাথে সাথে
তোমায় জানা।

এটি এদেশের সুপ্রাচীন উচ্চারিত আকাঙ্ক্ষা। মর্ত্যজীবনের মাধুর্যে আকুল, দেহাধারে অমৃত সন্ধানী বাঙালী বলে—

কিংতো দীবে কিংতো নিবেজ্জঁ
কিংতো কিজ্জই মন্তহ সেব্বঁ।
কিংতো তিত্থ-তপোবন জাই
মোক্খ কি লব্ভই পানী ন্হাই।

—কি হবে তোর দীপে আর নৈবেদ্যে? মন্ত্রের সেবাতেই বা কি হবে তোর? তীর্থ-তপোবনই বা তোকে কি দেবে? পানিতে স্নান করলেই কি মুক্তি মেলে?

আজকের বাউল সাধকেরও সে-বিশ্বাস অটুট :

সখীগো জন্মমৃত্যু যাঁহার নাই
তাঁর সনে প্রেম গো চাই।
উপাসনা নাই গো তাঁর
দেহের সাধন সর্ব সার
তীর্থ ব্রত যার জন্য—
এ দেহে তার সব মেলে।

দেহাত্মবাদী নিরীশ্বর বাঙালী বিদেশী শাস্ত্রের প্রভাবে আস্তিক হলেও তার দেহভিত্তিক সাধনা ও দেহানুরাগ বিচলিত হয়নি কখনো। তাই লালন কিংবা রবীন্দ্রনাথের মুখে একই ব্যাকুলতা ধ্বনিত হয়।

লালন বলেন— আমার এ ঘরখানায় কে বিরাজ করে
তারে জনমভর একবার দেখলাম নারে
ধরতে গেলে হাতে পাইনে তারে।

অথবা— এই মানুষে সেই মানুষ আছে
আমার হল কি ভ্রান্ত মন
আমি বাইরে খুঁজি ঘরের ধন।

এবং একবার আপনারে চিনলে পরে
যায় অচেনারে চেনা।

রবীন্দ্রনাথও বলেন :

আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়েছিলে
দেখতে আমি পাইনি
বাহির পানে চোখ মেলেছি
হৃদয় পানে চাইনি।

কাজেই বাঙালী মননের তথা জীবন-চেতনার ও জগৎভাবনার গতি-প্রকৃতিই আলাদা এবং তা দু'হাজার বছর ধরে মূলত অভিন্নই রয়েছে। আদিকালের বাঙালীমাত্রই দেহাত্মবাদী ও নিরীশ্বর। সাংখ্যই তার দর্শন, যোগ-তন্ত্রই তার চর্যা। এবং বিদেশীতত্ত্ব প্রভাবিত অধ্যাত্মবাদী বাঙালীমাত্রই অদ্বৈতবাদী ও কায়াসাধক।

বাঙালী মুসলিমের ক্ষেত্রেও এ তথ্য প্রযোজ্য। মধ্যযুগের মুসলিম কবি-সাধকরাও ছিলেন যোগপ্রিয় ও অদ্বৈতবাদী। এমন কি বামাচারও কেউ কেউ পছন্দ করতেন। সৈয়দ সুলতান, হাজী মুহম্মদ, শেখ চান্দ, মীর মুহম্মদ শফী, আলী রজা, শেখ মনসুর, শেখ যাহিদ, নেয়াজ, মোহসিন আলী, শেখ জেবু, রমযান আলী, রহিমুল্লাহ, সিহাজুল্লাহ প্রভৃতি তো যোগ ও অদ্বৈততত্ত্ব সম্বন্ধে গ্রন্থই রচনা করেছেন। রহিমুল্লাহর গ্রন্থের নাম তনতেলাওৎ মানে কায়াসাধন। গর্ভলক্ষণ, প্রাণ-সঙ্কলি, শুক্রতত্ত্ব, নাড়ীতত্ত্ব ও মৃত্যুলক্ষণ প্রায় সব গ্রন্থেরই মুখ্য আলোচ্য বিষয়।

বাঙালী চিরকাল দেহতত্ত্ব দিয়েই জীবন রহস্য ও জগৎ-তত্ত্ব বুঝবার সাধনা করেছে। এভাবেই তার আনন্দিত জীবন-স্বপ্ন রূপ পেয়েছে। সবটাই অবশ্য আত্মরতি প্রসূত আত্মসাধন সংপৃক্ত। তবু সংকীর্ণ সরণীতে হলেও সে উচ্চমার্গের সূক্ষ্ম ও জটিল চিন্তায় সমর্থ হয়েছে। মানব-মনীষার ক্ষেত্রে প্রাচীন ও মধ্য যুগের বাঙালীর এ অবদান চিন্তাজগতে তথা বিশ্বের মনন সাহিত্যে আমাদের কীর্তিমিনার।

বাঙালীর জীবন-দৃষ্টি এরূপ ভিন্ন ছিল বলেই সে অতীতে কখনো রাজ্য-গৌরব, শাসনদণ্ড, ধনগর্ব, ক্ষমতার দাপট কিংবা বাহুবলের প্রতাপ কামনায় বা অর্জনে উৎসাহ বোধ করেনি। সে নিজের মতো করে নিজেকে জেনেই তৃপ্ত থেকেছে, আত্মসমাহিত জীবনে সে আনন্দিত ও পরিতুষ্ট রয়েছে।

দুর্বৃত্তের সামাজিক ও দুর্ধর্ষের রাষ্ট্রিক শাসন-পীড়ন, শোষণ-পেষণ তাকে মনের দিক দিয়ে বিচলিত করেনি, করেনি স্বভাবভ্রষ্ট। কিন্তু সমাজস্বার্থ নিরপেক্ষ ঐ জীবনতত্ত্ব বাঙালীর বৈষয়িক ও নৈতিক জীবন বিড়ম্বিত করেছিল। সমাজের বিশেষ মানুষ যখন জীবনতত্ত্ব বিশ্লেষণে ও মোক্ষতত্ত্ব আবিষ্কারে নিষ্ঠ ও একাগ্রচিত্ত, তখন সাধারণ মানুষ জৈবিক ও বৈষয়িক প্রয়োজনে, শ্রেষ্ঠ মানুষের নেতৃত্বের ও নির্দেশের অভাবে, ব্যক্তিগত প্রয়াসে প্রাণ বাঁচানোর যথেচ্ছ উপায় অবলম্বনে ব্যস্ত। যারা বাঙালীর জীবন-দৃষ্টির খবর জানত না, সেই বিদেশী শাসক পর্যটকরা হাটের-ঘাটের বাটের-মাঠের ইতর মানুষকে বাঙলার ও বাঙালীর প্রতিনিধি স্থানীয় মানুষ বলে গ্রহণ করেছে। আর ভেতো, ভীতু, ধূর্ত, প্রতারক, কর্মকুণ্ঠ ও মিথ্যাভাষণে পটু বলে বাঙালীর নিন্দা রটিয়েছে প্রায় দেড় হাজার বছর ধরে। নিন্দিত বাঙালী আজো তা স্মরণে লজ্জিত হয়।

এ অবধি আমরা প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাঙালীর জগৎচেতনা ও জীবন-ভাবনার বৈশিষ্ট্য বুঝতে প্রয়াস পেয়েছি। এবার আধুনিক বাঙালীভাবনার পরিচয় নেবার চেষ্টা করব।

উনিশ শতকের গোড়া থেকে প্রতীচ্য শাসন ও শিক্ষার, বিদ্যা ও বিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচয়ের ফলে বিশ্বের উন্নত ও জাগ্রত জীবন, সমাজ, সংস্কৃতি ও রাষ্ট্রের সঙ্গে বাঙালীর মানস সংযোগ ঘটে। এর ফলে এদেশের জড় সমাজে বিচলন ও সংস্কার-জীর্ণ বন্ধ্যা চিত্তে একটা চাঞ্চল্য দেখা দেয়। বন্দর-নগরী ও রাজধানী কোলকাতায় নবশিক্ষিতরা দেখল রেনেসাঁস-রিফর্মেশন-রেভেলিউশনের প্রসাদপুষ্ট ও ইনকুইজিশন-মুক্ত বুর্জোয়া য়ুরোপ বিজ্ঞানে-দর্শনে-সাহিত্যে, শিল্পে-বাণিজ্যে-সাম্রাজ্যে, ধনে-যশে-মানে, সেবায়-সৌজন্যে-মানবতায়, উদ্যোগে-উদ্যমে-প্রাণময়তায়, প্রতাপে-প্রভাবে-দাপটে প্রদীপ্ত ভাস্করের মতো আশ্চর্য বিভায় শোভমান। আর নিজেদের প্রতি তাকিয়ে দেখল সংস্কারজীর্ণ, আচারক্লিষ্ট বন্ধ্যাসমাজ মধ্যযুগের বর্বর নারকীয় পরিবেশে স্থির হয়ে আছে। এ লজ্জা তাদের শিক্ষার্জিত নব জীবন-চেতনায় ও নবলব্ধ আত্মসম্মানবোধে প্রচণ্ড আঘাত হানল। য়ুরোপীয় আদলে জীবন রচনার ও সমাজ গড়ার এক অতি তীব্র অন্ধ আবেগ তাদের পেয়ে বসল। জীবন ও সমাজের সর্বক্ষেত্রে

নতুন কিছু করার জন্যে তাই তারা ব্যস্ত হয়ে উঠল—ফল চলে আবেগ-প্রাবল্যে উৎকণ্ঠাবশে তারা দিশেহারার মতো ছুটোছুটি শুরু করল।

কিন্তু গোড়ায় রয়ে গেল গলদ। য়ুরোপ তাদের মনে যত আকাঙ্ক্ষা জাগাল, যত উত্তেজনা দিল, সে পরিমাণে 'য়ুরোপীয় চিত্ত' তাদের বোধগত হল না। তাই তাদের আন্তরিক প্রয়াস প্রত্যাশা পূরণে হল ব্যর্থ। প্রতীচ্যের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, নারীর মর্যাদা, জাতীয়তা, স্বাধীনতাপ্রীতি, কল্যাণবাদ, মানবতা, প্রগতি, লোকহিত, পরমতসহিষ্ণুতা প্রভৃতির কোনটাই স্বরূপে উপলব্ধি করবার সামর্থ্য তাদের ছিল না। তাই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের নামে স্বেচ্ছাচারিতাকে, প্রগতির নামে নির্লক্ষ্য দ্রোহকেই তারা বরণ করে। লোকহিত তাদের কাছে ছিল স্বশ্রেণীর কল্যাণবাঞ্ছা মাত্র। জাতীয়তা তাদের কাছে স্থান-কাল হীন স্বধর্মীর সংহতি মাত্র। বাঙলার প্রশাসনিক ক্রান্তিকালে অন্ধ বিজাতি-বিদ্বেষ যেমন ফকির-সন্ন্যাসীদের নির্লক্ষ্য লুটেরা বানিয়েছিল, তেমনি ওহাবীদের কিংবা আর্য সমাজীদের করেছিল স্থান-কালহীন স্বধর্মীর হিতবাদী, তেমনি রামমোহন-বিদ্যাসাগর বঙ্কিম হয়েছিলেন স্বশ্রেণীর কল্যাণকামী। সমাজে নারীর মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন জেগেছিল বটে, কিন্তু বিধবা-বিবাহ প্রচলনে, বহুবিবাহ নিবারণে কিংবা নারী-পর্দা বর্জনে ও নারীশিক্ষা দানে বাস্তব উৎসাহ দেখা যায়নি। স্বাধীনতা প্রীতি জাগল, ফরাসী বিপ্লব মুগ্ধ করল এবং সাম্য-ভ্রাতৃত্ব স্বাধীনতাসার্বক্ষণিক উচ্চারণের বিষয় হল বটে, কিন্তু নিজেদের জন্যে তারা স্বাধীনতা কামনা করেনি, সমর্থন পায়নি সিপাহী-বিপ্লব। কোঁতের হিতবাদ ও নাস্তিকতা শিক্ষিত বাঙালীর—বঙ্কিমেরও—মন হরণ করল বটে, কিন্তু নাস্তিক রইল দুর্লভ, গণমানবের হিত-কামনা রইল বিরল। রামকৃষ্ণের-বিবেকানন্দের লোকসেবা দেবোদ্দেশ্যে নিবেদিত—মানবতার নামে উৎসর্গিত নয়। জমিদারসমিতি গড়ে উঠল, কৃষকসমিতি তৈরী হল না। য়ুরোপে দেখল রাষ্ট্রিক জাতীয়তা, আর নিজেদের জন্যে কামনা করল ধর্মীয় জাতিসত্তা। তাই বাঙালী হিন্দু শিক্ষিত হয়ে হিন্দু হয়েছে, মুসলিম হয়েছে মুসলিম—কেউ বাঙালী থাকেনি। হিন্দু কংগ্রেস ময়দানী বক্তৃতায় ভারতবাসী মাত্রেরই মিলন ও সংহতি কামনা করেছে কিন্তু নিম্নিত স্বধর্মীর কায়িক স্পর্শকে জেনেছে অপবিত্র বলে। তাই হিন্দু মহাসভা ও মুসলিম লীগই

এদেশে টিকল, বাঙালী হিন্দু দিল্লীর অভিভাবকত্বে পেল স্বস্তি, বাঙালী মুসলিম করাচীর কর্তৃত্বে হল নিশ্চিন্ত। বাঙলা ও বাঙালী যে খণ্ডিত হল, বিচ্ছিন্ন হল, তাতে দুঃখ করবার রইল না কেউ। দেশ নয়, ভাষা নয়, গোত্র নয় ধর্মই আজো বাঙালীর জাতীয়তার ভিত্তি।

উনিশ শতকের শিক্ষিত বাঙালী-হিন্দু প্রেরণার উৎস স্বরূপ গৌরব-গর্বের ঐতিহ্যিক অবলম্বন খুঁজেছে আর্যাবর্তে, ব্রহ্মাবর্তে, রাজপুতনায় ও মারাঠা অঞ্চলে, মুসলিমরা ঢুঁড়েছে আরবে, ইরানে ও মধ্য এশিয়ায়। এমন কি দেশের এযুগের মহত্তম মানবতাবাদী পুরুষ রবীন্দ্রনাথও এ সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত থাকতে পারেন নি। পাণ্ডববর্জিত বাঙলার অধিবাসী হয়েও ব্রাহ্মণ্যসংস্কারবশে তিনি প্রাচীন ও মধ্যযুগের আর্য উত্তরভারতে, রাজপুতনায়, মারাঠা অঞ্চলে, শিখ ইতিহাসে ও বৌদ্ধ পুরাণে স্বজাতির গৌরব গর্বের ইতিকথা খুঁজেছেন, বিদেশী তুর্কী-মুঘলের প্রতি অশ্রদ্ধাবশে সাতশ' বছরের ভারত-ইতিহাসকে তিনি এড়িয়ে গেছেন এবং তাঁর সাহিত্যে অস্বীকৃত হয়েছে সাতশ' বছর কাল পরিসরে দেশী মুসলিমের অস্তিত্ব। স্বাধীনতাকামী সন্ত্রাসবাদী অনুশীলন-যুগান্তর-সুভাষ-সূর্যসেন পন্থীরাও কালীমাতার সন্তানরূপে হিন্দুভারতেরই স্বাধীনতা কামনা করেছে, তার আগেও হিন্দুমেলা ওয়ালারা স্বধর্মীর বাঙলা তথা ভারতেরই স্বপ্ন দেখেছে। সন্ত্রাসবাদী স্বদেশ প্রেমিক অরবিন্দ ঘোষ মানবকল্যাণকামী হয়েও অবশেষে যোগীসাধক শ্রীঅরবিন্দ রূপে প্রাচীন আধ্যাত্মিকতার চোরাবালিতে মানব-মুক্তির সন্ধান করেছেন। মোটামুটিভাবে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধপূর্ব বাঙলায় বা ভারতে হিন্দু ও মুসলিম শিক্ষিতদের কেউ মনের দিক দিয়ে সুস্থ ও স্বস্থ ছিলেন না। তাঁরা কেবল হিন্দু কিংবা শুধু মুসলমান ছিলেন। যে প্রতীচ্য বিজ্ঞান-দর্শন-সাহিত্য-সমাজ-রাষ্ট্র তাঁদের আধুনিক জীবন-ভাবনায় অনুপ্রাণিত করেছে, তার Spirit চেতনার গভীরে ধারণ করা যায়নি বলে তাঁদের চিন্তায় ও কর্মে বিকৃতি ও বৈপরীত্য এসেছে। ফলে তাঁদের সব প্রয়াস অসামঞ্জস্যতার শিকার হয়ে বিড়ম্বিত ও ব্যর্থ হয়েছে। প্রতীচ্যের অনুকৃতি ও প্রাচ্য-স্বভাবের টানাপোড়নে আলোচ্য যুগের কথায় ও কর্মে কিছু জটিলতা দেখা দিলেও আধুনিকতার আবরণ উন্মোচন করলে রামমোহন-বিদ্যাসাগর-বঙ্কিম-রামকৃষ্ণ-রবীন্দ্রনাথ-অরবিন্দ-তীতুমীর-দুদুমিয়া-

মেহেরুল্লাহ-মৌলানা বাকী-আকরম খাঁ। সবাইকেই আদি ও অকৃত্রিম বাঙালী মন ও মননের প্রতিভূ রূপেই দেখতে পাই। সেই শ্রেণী-চেতনা, সেই স্বাধর্ম্য, সেই বৈরাগ্য, সেই আধ্যাত্মিকতা, সেই সংকীর্ণজীবন-চেতনা ও বাস্তব বিমুখিতা, সেই নিঃসঙ্গতা, সেই আত্মরতি তাদের মনে-মননে, কথায়-কর্মে অবিকৃতভাবেই অবিরল রয়েছে। চোখ ধাঁধানো ও মন ভোলানো আধুনিকতা তাদের মনে-মননে প্রলিপ্ত চন্দনের মতোই বিজড়িত বটে কিন্তু অন্তরঙ্গ নয়। তাই যে-মাটি মায়ের বাড়া, হাজার বছরের পরিচিত জ্ঞাতি-বিধর্মী যে প্রতিবেশী তাদের পর করে পরকে প্রিয় ভাবতে তারা এতটুকু বেদনাবোধ করেনি। গত দেড়শ' বছর ধরে বাঙলাদেশে বঙ্গপ্রবাসী হিন্দু ছিল, মুসলমানও ছিল কিন্তু বাঙালী ছিল না।

দৈশিক জাতীয়তায় বাঙালী দীক্ষিত হয়নি, এ যন্ত্রযুগেও যৌথকর্মে পায়নি দীক্ষা। জনে জনে জনতা হয়, মনের 'সায়' না থাকলে একতা হয় না, একত্রিত হওয়া সহজ কিন্তু মিলিত হওয়া সাধনা সাপেক্ষ। সে-সাধনা বাঙালী করেনি, তাই আবেগ বশে সে ক্ষণিকের জন্যে উদার হয়, উত্তেজনা বশে সে ক্ষণিকের জন্যে মরণপণ সংগ্রামে নামে, মৌহূর্তিক স্বার্থবশে ঐক্যবদ্ধও হয় কিন্তু কোনটাই টেকে না। তাই চৈতন্যের সাম্য ও প্রীতিভিত্তিক প্রেমবাদও বাঙলায় ব্যর্থ হল। এজন্যে বাঙালী বৈষয়িক জীবনে কোন বৃহৎ কর্মে উদ্যোগী হলেও সফল হয় না। লীগ-কংগ্রেসের জন্ম বাঙলায়, বিদ্বান বুদ্ধিমানও বাঙলায় সুলভ ছিল, তবু নেতৃত্ব বাঙালীর হাতে থাকেনি। সঙ্ঘশক্তি নেই বলে সে চিরকাল বিদেশী শাসিত-শোষিত ও দুস্থ। নিজে বঞ্চিত হয়েও স্বধর্মীর গৌরব ও ঐশ্বর্যগর্বে সে গর্বিত ও আনন্দিত থাকে।

আজো বাঙলাদেশে এমন একজন অবিসম্বাদিত সর্বজন শ্রদ্ধেয় মানববাদীর আবির্ভাব হয়নি, যাঁকে আদর্শ মানুষ ও মানবপ্রেমিক বা নিরপেক্ষ গণকল্যাণকামী পুরুষ বা নারী হিসেবে সন্তানের সামনে অনুকরণীয় বলে স্মরণ করা যায় কিংবা ঘরে প্রতিকৃতি টাঙিয়ে রাখা চলে অনুপ্রাণিত হবার সদুদ্দেশ্যে। সমাজের বা ইতিহাসের এর চেয়ে বড় ব্যর্থতা আর কি হতে পারে!

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর কালে আমাদের দেশে মার্কসবাদ জনপ্রিয় ও বহুল আলোচিত হতে থাকে। তার কারণ যুদ্ধ বিধ্বস্ত দুনিয়ায় দরিদ্র দেশের মানুষ পুরোনো 'যোগ্যতমের উদ্বর্তন' বাদ সমর্থিত কেড়ে-মেরে-শোষণে-বঞ্চনায় বাঁচার তত্ত্বে আস্থা হারিয়ে সম স্বার্থে সহিষ্ণুতা, সহযোগিতা ও সহাবস্থানের অঙ্গীকারে মার্কসীয় বণ্টনে বাঁচাতত্ত্বে ভরসা রাখে। মানবিক সমস্যা সমাধানের এই নতুন প্রত্যাশা হতাশ মানুষকে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশ্বস্ত করে তোলে। তাই আজকের দুনিয়ায় নিঃস্ব, দুস্থ গণমানবের জিগির ও স্বপ্ন হচ্ছে সমাজবাদ ও সাম্যবাদ। এ তত্ত্বের মূলকথা আধুনিক কায়াসাধন—তনুর সেবা। কাজেই এ তত্ত্বে আসমানী কিছুই নেই, আছে মানুষকে প্রাণী হিসেবে গণ্য করে প্রাণে বেঁচে থাকার জন্মগত মৌলিক ও সঙ্গত অধিকারে স্বীকৃতি দান। শারীরিক ক্ষুৎপিপাসা নিবারণ-তত্ত্বভিত্তিক বলেই এ হচ্ছে নিতান্ত বস্তুবাদী দর্শন। কাজেই সমাজ বা সাম্যবাদী মাত্রই মানববাদী এবং মানববাদে দীক্ষার প্রথম শর্ত হচ্ছে দেশ-জাত-বর্ণ-ধর্ম নির্বিশেষে মানুষকে কেবল 'মানুষ' হিসেবে জানতে ও মানতে হবে। মানুষের মৌল মানবিক অধিকার সর্বাবস্থায় সংরক্ষণ করতে হবে। অতএব সমাজবাদ কিংবা সাম্যবাদ অঙ্গীকার করতে হলে পুরোনো শাস্ত্রে এবং সেই শাস্ত্রভিত্তিক সমাজে ও সংস্কারে আনুগত্য পরিহার করা আবশ্যিক হয়ে পড়ে। কারণ এগুলোর ভিত্তিই হচ্ছে দল-চেতনা। মানুষে মানুষে বৈরিতা ও স্বাতন্ত্র্য জিইয়ে রাখার অঙ্গীকারেই দলীয় সংহতির স্থিতি। সম ও সহ স্বার্থেই দল গড়ে উঠে। মনের, মতের ও স্বার্থের ঐক্যই দল গঠনের ভিত্তি। কাজেই প্রতিদ্বন্দ্বী বা ভিন্ন দলগুলোকে পর, সন্দেহভাজন ও শত্রু না ভাবলে স্বদলের স্বাতন্ত্র্য ও সংহতি রক্ষা সম্ভব হয় না। সুতরাং অন্য দলের প্রতি অবজ্ঞা, ঈর্ষা কিংবা প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব পোষণ না করলে স্বদলের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ পায় না। সব দলই এক রকম। পার্থক্য কেবল এই যে শাস্ত্রীয় দল অর্থাৎ ধর্ম সম্প্রদায় ঐহিক-পারত্রিক জীবন সংপৃক্ত বলে অনন্ত শাস্তির ভয়ে ঐটিতে মানুষের জীবনব্যাপী অনড় আনুগত্য থাকে। অন্য পার্থিব দল সময় ও সুযোগ মতো স্বার্থবশে ক্ষতির ঝুঁকি না নিয়েই বদল বা লোপ করা চলে। কিন্তু শাস্ত্রীয় দল অবিনশ্বর। এ কারণে

ধর্মীয় দলের কৌশল চিরন্তন ও মারাত্মক। অতএব শাস্ত্রীয় আনুগত্য পরিহার করেই কেবল মানুষ উদার মানবতাবোধে নির্বিশেষ মানবের মিলন-ময়দান তৈরী করতে পারে। কেননা শাস্ত্রে আস্থা হারালেই মন-বুদ্ধি মুক্ত ও নিরপেক্ষ হয়। অন্য পার্থিব দল ক্ষণজীবী, সেজন্যে সেগুলো কোন স্থায়ী ও সর্বজনীন সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে না। তাই অন্য দল মানবিক সমস্যার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ নয়। অতএব সমাজবাদী বা সাম্যবাদী তথা মানববাদী হতে হলে প্রথমেই শাস্ত্রীয় আনুগত্য তথা শাস্ত্রে আস্থা পরিহার আবশ্যিক। তা হলে সে-সঙ্গে শাস্ত্রভিত্তিক পুরোনো সমাজ-সরকারে আনুগত্যও লোপ পাবে। আজকের মানবশাস্ত্র ও মানমধর্ম হবে সমস্বার্থে সহিষ্ণুতা, সহযোগিতা ও সহাবস্থানের স্বীকৃতিতে বণ্টনে বাঁচার অঙ্গীকার।

উগ্রজাতীয়তা, গোত্রবেষণা, বর্ণবিদ্বেষ ও ধর্মভেদ প্রভৃত অভিশাপ বিমোচনের অঙ্গীকারে ডক্টর গোবিন্দ দেব প্রমুখ চিন্তাবিদেরা সহিষ্ণুতা ভিত্তিক যে সমন্বয়ী মানবতার তত্ত্ব প্রচারে উৎসুক, তা বুর্জোয়া উদারতার পরিচারক মাত্র। শুনতে ভালো হলেও সেই পুরোনো তত্ত্বে মানবিক সমস্যা সমাধানের শক্তি নেই, কোনকালে ছিলও না। ধার্মিক মানুষের সেক্যুলার হওয়ার চেষ্টা সোনার পাথরবাটি বানানোর মতই অবাস্তব ও অসম্ভব। কেননা স্বধর্মে নিষ্ঠা এবং পরধর্মে অনাস্থা ও অবজ্ঞাই শাস্ত্রানুগত্য বা ধার্মিকতার মৌল শর্ত। একজন ধার্মিক বা আস্তিক বড়জোর সহিষ্ণু হতে পারেন কোন কোন ক্ষেত্রে, কিন্তু পর শাস্ত্রে কখনো শ্রদ্ধাবান হতে পারেন না।

আজ দেশে সমাজতন্ত্রের জিগির উঠেছে, এ উচ্চারিত বুলি বুকের সত্য হয়ে উঠলে আমাদের প্রত্যাশিত সুদিন শিগগিরই আসবে। কেননা শাস্ত্রে আস্থা পরিহার করলে বাঙালীর স্বভাব বদলাবে। বাঙালী আধুনিক জাগ্রত ও স্বস্থ বিশ্বের নাগরিক হয়ে উঠবে আর একান্তই বাঙালী থাকবে না। নিরীশ্বর-নাস্তিক অন্তত শাস্ত্রদ্রোহী মুক্তবুদ্ধি মানববাদী বাঙালীর উপর নির্ভর করছে বাঙালীর সুন্দর ভবিষ্যৎ। সামনে নতুন দিন। প্রত্যাশী ও আশ্বস্ত আমরা সেই নতুন সূর্যের উদয় লগ্নের প্রতীক্ষায় থাকব। অতএব মাভৈঃ।

কথায় বলে— সজ্জনাঃ গুণমিচ্ছন্তি
দোষমিচ্ছন্তি পামরাঃ।

আমি আজ পামরের ভূমিকাই পালন করলাম,—তবে সবটাই সদুদ্দেশ্যে। আপনাদের সৌজন্যের সুযোগ নিয়ে আপনাদের ধৈর্যের উপর এতক্ষণ পীড়ন চালিয়েছি, সেজন্যে ক্ষমা চেয়ে বিদায় নিচ্ছি।*

শিক্ষাতত্ত্বের গোড়ার তত্ত্ব

শিক্ষণশাস্ত্রও আজকাল শিক্ষা-বিজ্ঞান নামে পরিচিত। এবং সবাই জানে যে বিজ্ঞান মাত্রই তথ্য-প্রমাণ নির্ভর। তবে প্রাকৃত বিজ্ঞানের মতো এই বিজ্ঞান ততটা তথ্যভিত্তিক নয়, যতটা তত্ত্বসংশ্লিষ্ট। বিজ্ঞান প্রমাণভিত্তিক আর তত্ত্ব গ্রহণসাপেক্ষ। তাই এখানে মতগত বিতর্কের ও লক্ষ্যগত বিভিন্নতার অবকাশ অনেক।

আসলে শিক্ষাশাস্ত্র বিজ্ঞান নয়। এ যুগে বিজ্ঞানের প্রতি শ্রদ্ধাবশে যে-কোন যুক্তিগ্রাহ্য ও পদ্ধতিবদ্ধ শাস্ত্র ও তত্ত্বকে "বিজ্ঞান" বলে চালিয়ে দেয়ার আগ্রহ থেকে এ বুলির উদ্ভব ও প্রসার।

মূলত শিক্ষাতত্ত্বটি হচ্ছে নৈতিক, আর শিক্ষা নীতিটি হচ্ছে বৈষয়িক। প্রথমটি মানবিক, দ্বিতীয়টি জৈবিক। একটি জীবন-সম্পৃক্ত, অপরটি জীবিকা-সংলগ্ন। একটি চেতনা সঞ্জাত মানববিদ্যা, অপরটি বিজ্ঞানপ্রসূত প্রযুক্তি বিদ্যা। তাই একটি নীতিমূলক, অপরটি বৃত্তিমূলক। আমরা এখানে শিক্ষার নৈতিক দিকটাই অধিক গুরুত্বে আলোচনা করতে চাই। জীবনকে অবলম্বন করেই মানুষের সর্বপ্রকার প্রয়াস-প্রেরণা হয় আবর্তিত। জীবনই সর্বপ্রকার চিন্তা-চেতনার কারণ। জীবন হচ্ছে দেহ ও মনের সমন্বিত রূপ। দেহে যেমন ক্ষুধা আছে, মনেরও তেমনি রয়েছে চাহিদা। দেহ আধার, মন আধেয়। দেহ যন্ত্র, মন যন্ত্রী। এ জন্যেই জীবন ও জীবিকা-প্রয়াস অবিচ্ছেদ্য। জীবন-জীবিকার নিরাপত্তা ও বিকাশ লক্ষ্যেই মানুষের সর্বপ্রকার প্রয়াস নিয়োজিত। তবু জীবনের জন্যেই জীবিকা, জীবিকার জন্যে জীবন নয়, তেমনি জীবনের প্রয়োজনেই শিক্ষা আবশ্যক। শিক্ষাকে তাই জীবনের অনুগত করতে হয়, জীবনকে শিক্ষার ছাঁচে ফেলে টবের তরুতে পরিণত করলে জীবনের স্বাভাবিক বিকাশ রুদ্ধ হয়ে জীবন বিকৃত হয়। শিক্ষাকে তাই জীবন-সংলগ্ন করতে হবে।

শিক্ষা-বিজ্ঞানীরা শিক্ষাদানে অর্থাৎ এডুকেইট করার সুফলপ্রসূতায় গভীর আস্থা রাখেন। আমরা এডুকেইট করার পক্ষপাতী নই। আমরা চাই মানবিক জ্ঞানের অবাধ বিকাশের জন্যে কেবল বিশুদ্ধ

জ্ঞানদান বা ডেসিমিনেশান অব নলেজ। অর্থাৎ আত্মা ও আত্মবিকাশের জন্যে বুদ্ধিবৃত্তির, শ্রেয়ঃ—বোধের ও সৌন্দর্য-চেতনার স্বাধীন বিকাশ লক্ষ্যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যবস্থা কামনা করি। পেশাগত, বৈষয়িক যোগ্যতাগত বিদ্যাদান এ স্তরে আমাদের বাঞ্ছিত নয়। কেননা আমরা কেবল কর্মী ও কর্মযোগ্য প্রাণী চাইনে। মানবিক গুণ-বিশিষ্ট সামাজিক মানুষ তৈরীই আমাদের লক্ষ্য। যে-মানুষ পারস্পরিক কল্যাণ ও মৈত্রী লক্ষ্যে প্রীতি ও শুভেচ্ছার ভিত্তিতে দায়িত্ব ও কর্তব্যবুদ্ধি নিয়ে সমস্বার্থে সহিষ্ণুতা ও সহযোগিতার অঙ্গীকারে সহ-অবস্থানে আগ্রহী হবে। তাই শেখানো বুলিতে বা আরোপিত বিশ্বাসে কিংবা নিপুণ যন্ত্রীতে আমাদের আস্থা নেই। অর্জিত জ্ঞানজ প্রজ্ঞায় ও বোধিতে যে মানুষের মন-মেজাজ পুষ্টি ও বিকাশ পায়—এই তত্ত্ব আমরা স্বীকার করি। এবং তাই জ্ঞান যে মানবিক গুণের উন্মেষ ও বিকাশ লক্ষ্যে অর্জিত হওয়া উচিৎ, তাও আমরা স্বীকার করি। মানবিক গুণ বলতে আমরা বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষ, সামাজিক শ্রেয়ঃ-চেতনা ও সৌন্দর্যবোধের বিকাশ বুঝি। আবার মানুষের মানসপ্রবণতার বৈচিত্র্য স্বীকার করি বলেই সব মানুষের সমবিকাশ যে অস্বাভাবিক ও অসম্ভব, জ্ঞান যে সব ক্ষেত্রে শোধনে সমর্থ নয়, তাও মানি। তবু সংস্কার-বদ্ধ জীবের চেয়ে মুক্ত মনের মানুষই আমাদের কাম্য। কেননা বিশ্বাস-সংস্কার বন্ধ্যা, তার ভবিষ্যৎ নেই। মুক্ত মনের অঙ্গনে অনুকূল প্রতিবেশে যে-কোন বীজ উপ্ত হবার সম্ভাবনা থাকে। তাছাড়া দুঃশীল অমানুষও সংখ্যাগুরু সুজন সুনাগরিকের প্রতি সমীহবশে সংযত আচরণে বাধ্য হয়। তাই আমরা মাধ্যমিক স্তর অবধি (১৫ বছর বয়স পর্যন্ত) উদার ও সাধারণ শিক্ষা-নীতির পক্ষপাতী। এ স্তরে থাকবে ইতিহাস, দর্শন, সমাজতত্ত্ব, সাহিত্য, শিল্প সম্বন্ধে সাধারণ জিজ্ঞাসা জাগানোর ব্যবস্থা; বিজ্ঞান, বাণিজ্য ও প্রযুক্তিবিদ্যা সম্বন্ধে আগ্রহ সৃষ্টির মতো প্রাথমিক সূত্রগুলোর পরিচিতি এবং সর্বপ্রকার সংস্কার মুক্তির আনুকূল্য দান। কেননা আরোপিত বিশ্বাস সংস্কার মানুষের চিন্তাশক্তিকে বন্ধ্যা রাখে, আর মানুষকে করে ভীরু।

সততা, সহযোগিতা, সহিষ্ণুতা, সময় ও নিয়মানুবর্তিতা, স্বাস্থ্য, দায়িত্ব-চেতনা, কর্তব্যবুদ্ধি প্রভৃতির মূল্য-চেতনা হবে উক্ত শিক্ষার প্রগুন

ও ফসল। এক কথায় জীবন-প্রতিবেশ এবং সমাজ সম্পর্কে কল্যাণকর নিরপেক্ষ স্বচ্ছ দৃষ্টি দানই হবে শিক্ষার লক্ষ্য।

সৎ শিক্ষার পথে শাস্ত্র, সমাজ ও সরকার-সৃষ্ট বাধা

সরাসরি শিক্ষাতত্ত্বে প্রবেশ না করে আমরা একটু প্রাসঙ্গিক উপক্রমণিকার অবতারণা করতে চাই। আর সব প্রাণী সহজাত বৃত্তি-প্রবৃত্তি এবং নিয়তি-নির্দিষ্ট বুদ্ধি ও শ্রেয়বোধ নিয়ে প্রকৃতির আনুগত্যের অঙ্গীকারে নিয়ম-নিয়ন্ত্রিত জীবন যাপন করে। মানুষ তার অবয়বের শ্রেষ্ঠত্বের সুযোগে গোড়া থেকেই কৃত্রিম জীবন রচনায় উৎসাহ বোধ করেছে। তাই সে প্রকৃতির প্রভুত্ব অস্বীকার করে, তাকে বশ ও দাস করে জীবনের সুখ, স্বস্তি ও স্বাচ্ছন্দ্য অর্জনে উদ্যোগী হয়েছে।

হাতকে যখন হাতিয়ার রূপে জানল, তখন মানুষ জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য দান লক্ষ্যে হাতের কাজ উদ্ভাবনে মন দিল। আর এতেই তার চিন্তা-শক্তির বিকাশ হল শুরু। এমনি করেই তার জীবন ও জীবিকা-পদ্ধতি সংলগ্ন চিন্তা-ভাবনার প্রসার হতে থাকে। প্রকৃতির নিয়ম ও রহস্য অনুধাবন করে করে সে প্রকৃতিকে বশ ও দাস করার বুদ্ধিও আয়ত্ত করেছে। যৌথ কর্ম ও সহচারিতার গরজে তার ভাবনাচিন্তা প্রকাশের ও বস্তুনির্দেশের জন্যে সে নব নব ধ্বনিও সৃষ্টি করেছে, তাতেই তার ভাষা হয়েছে ঋদ্ধ। তার অপ্রাকৃত, কৃত্রিম গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনের বক্র প্রসারের ধারায় আজ অবধি সে যা অর্জন করেছে, তা-ই তার সম্পদ ও সঞ্চয়, তা-ই তার সভ্যতা ও সংস্কৃতি। অতএব মানুষের সর্বপ্রকার প্রয়াসের ও বিকাশের মূলে রয়েছে তার জীবন-জীবিকার নিরাপত্তা ও স্বস্তি-স্বাচ্ছন্দ্য বাঞ্ছা। প্রত্যাশার প্রবর্তনাতেই সে আবিষ্কারে ও উদ্ভাবনে, নির্মাণে ও বৈচিত্র্যদানে প্রয়াসী।

জীবন ও জীবিকার ক্ষেত্রে তার অভাববোধ ও অতৃপ্তিই তাকে কাঙ্ক্ষী, জিজ্ঞাসু ও উদ্যোগী রেখেছে। তাই গতিশীলতা ও চলমানতাই তার চেতনার গভীরে মূল জীবন-প্রেরণা। স্থিতিতে তাই তার স্বস্তি-শান্তি নেই। অবচেতন ভাবে মানুষ তাই এগিয়ে চলার আগ্রহে নতুন চিন্তায়, আবিষ্কারে, উদ্ভাবনে ও নির্মাণে নিরত। স্থিতি ও স্থায়িত্বে জরা ও জীর্ণতা

বাসা বাঁধে। নব নব কিশলয় যেমন বৃক্ষের বৃদ্ধির লক্ষণ, তেমনি পুরোনো রীতি-রেওয়াজ ও মতাদর্শ পরিহার সামর্থ্যেই নিহিত থাকে মানব প্রগতি। সব মানুষ অবশ্য এসব নিয়ে মাথা ঘামায় না, তারা পরনির্ভরতায় নিশ্চিন্ত থাকতে চায়। তা ছাড়া তাদের শক্তি ও প্রবণতা বিভিন্ন ও বিষম। তাই গোটা মানব-সমাজের হয়ে কেউ কেউ চিন্তায়, উদ্ভাবনে, আবিষ্কারে ও নির্মাণে নিরত হয়। এ জন্যেই বিশ্বের কয়েক হাজার বছরের ইতিহাসে কয়েকশত মানুষও মেলে না, যাদের চিন্তা ও মনীষার ফসলে, আবিষ্কার ও উদ্ভাবনায় দানে মানুষ আজ বিশ্ববিজয়ী ও নভশ্চর। এমনি করে একের দানে অপরে হয় ঋদ্ধ। একের সৃষ্টি বিশ্বমানবের হয় সম্পদ।

এ তথ্য জেনেও শাস্ত্র, সমাজ ও সরকার চিরকালই স্থিতিকামী। মানুষকে একটি নিয়মের নিগড়ে নিবদ্ধ করে শাস্ত্র, সমাজ ও শাসক চিরকালই নিশ্চিন্ত হতে চেয়েছে। নইলে ঝামেলা বাড়ে, শাস্ত্রকার, সমাজপতি ও রাজ্যপতির স্বস্তি-সুখ নষ্ট হয়। জীবনের ও মননের প্রবহমানতা ও স্বাভাবিক অগ্রগতি অস্বীকৃতির ফল কোনকালেই ভাল হয়নি। চিরকাল সর্বত্রই রক্তক্ষরা প্রাণঘাতী ধর্ম-বিপ্লব, সমাজ বিপ্লব ও রাষ্ট্র বিপ্লব ঘটেছে। সনাতনী ও স্থিতিকামীর পরাজয়ে পরিবর্তন-প্রত্যাশীর ও গতিকামীর জয় অবশ্যম্ভাবী জেনেও আজো শাস্ত্র, সমাজ ও সরকার নতুন ভাব-চিন্তার জন্ম নিরোধে সমান উৎসাহী।

তাই জগতে নতুন চিন্তার, তথ্যের ও তত্ত্বের জনকমাত্রই ধর্ম, সমাজ ও রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে দ্রোহী-বিপ্লবী। তাকে চিরকালই নির্যাতিত ও নির্বাসিত কিংবা লাঞ্ছিত ও নিহত হতে হয়েছে। তবু প্রসূত চিন্তা, তথ্য ও তত্ত্ব নিশ্চিহ্ন করা সম্ভব হয় না। দূর্বার মতো দুর্বার প্রাণশক্তি নিয়ে তা জনমনে কেবল আত্মবিস্তার করতে থাকে। বাতাসের মতোই তা হয় সর্বগ, আলোর মতো হয় সর্বপ্লাবী। এমনি করে এক কালের অনভিপ্রেত নিষিদ্ধ ভাব-চিন্তা লোকগ্রাহ্য ও লোক-প্রিয় শ্রেয়স্কর ধর্মাদর্শ, কাম্য সমাজপদ্ধতি ও বাঞ্ছিত রাষ্ট্রতত্ত্ব হয়ে প্রতিষ্ঠা পায়। আজ অবধি মানুষের সভ্যতা-সংস্কৃতির যা কিছু সার-তত্ত্ব, যা কিছু গৌরবের ও গর্বের, যা কিছু মানব মনীষার ও মহিমার স্মারক তার সবটাই দ্রোহীর দান।

কিন্তু স্বার্থ-চেতনা, নিজ্ঞির স্থিতি-কামনা মানুষের বিবেক-বুদ্ধি ছাপিয়ে উঠে। আপাত শ্রেয়-চেতনার প্রবলতায় ভাবী শ্রেয়বোধ তুচ্ছ হয়ে যায়। তাই কল্যাণের নামে, শৃঙ্খলার নামে, আনুগত্যের স্বস্তির নামে কোন রীতি-নীতির পরিবর্তন, কোন ত্রুটির শোধন, কোন অন্যায়ের প্রতিকার, কোন অশুভের প্রতিরোধ, কোন বাদের প্রতিবাদ, কোন প্রতিহিংসার প্রতিশোধ তারা অবাঞ্ছিত উপদ্রব বলে মনে করে। যারা যুক্তি-প্রমাণে ফাঁকির ফাঁক দেখিয়ে দিতে চায়, তাদেরকে শাস্ত্র, সমাজ, সরকার উপসর্গ বলেই জানে।

তাই চিরকাল জ্ঞানের নামে অজ্ঞানকে, বিজ্ঞতার নামে অজ্ঞতাকে, শ্রেয়সের নামে অকল্যাণকে, সত্যের নামে মিথ্যাকে, তথ্যের নামে কল্পনাকে, তত্ত্বের নামে বিশ্বাসকে, ভক্তির নামে বিস্ময়কে, অমঙ্গলের নামে ভীরুতাকে লালন করতে তারা আগ্রহী। ফলে মানুষের কল্যাণ-চিন্তা ও কর্ম স্বাভাবিক স্ফূর্তি পায়নি। মানুষের সংস্কৃতি-সভ্যতার বিকাশও আনুপাতিক হারে হয়েছে মন্থর! মানবিক সমস্যাও তাই হয়েছে জটিল, বহু ও বিচিত্র।

যদিও মনুষ্য সমাজের ক্রমবিকাশের ধারায় সমাজ, শাস্ত্র, রাষ্ট্রনীতি ও রাষ্ট্রাদর্শ প্রভৃতি গড়ে ওঠেছে, এবং ধর্ম, সমাজ ও রাষ্ট্র একই উদ্দেশ্যে ত্রিধারায় মানুষের জীবন-জীবিকা নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব বহন করছে, তবু স্বস্বার্থে শাস্ত্রপতি, সমাজপতি, কিংবা রাষ্ট্রপতি, সনাতন রীতি পরিহারে চিরকালই নারাজ। জ্ঞান মাত্রই যে অসম্পূর্ণ, অভিজ্ঞতা যে ত্রুটি-মুক্ত নয়, সত্য যে উপলব্ধি নির্ভর, শ্রেয়-চেতনা যে আপেক্ষিক, তথ্য যে প্রমাণপ্রসূত, তত্ত্ব যে তাৎপর্য নির্ভর, ভক্তি যে প্রবণতার প্রসূন, উদ্যমের অনুপস্থিতিতেই যে স্থিতি-কামনার জন্ম, প্রত্যাশার অভাবই যে সনাতন প্রীতির মূলে, অজ্ঞতাই যে বিস্ময়ের আকর, বিশ্বাস যে যুক্তিবিরহী, ভয় যে আত্মপ্রত্যয়ের অভাব প্রসূত, কল্পনার গুরুত্ব যে বুদ্ধিহীনতায়, যুক্তির সন্তান যে প্রজ্ঞা, প্রমাণ যে পাথুরে হওয়া আবশ্যিক, জ্ঞান যে উপলব্ধির মাধ্যমে প্রজ্ঞায় পরিতৃপ্তি পায়—তা স্বীকার করলে তাদের চলে না।

যা জানা যায় তাই জ্ঞান। জ্ঞান জিজ্ঞাসার প্রসূন। বিৎ বা বিদ মানে জ্ঞেয় যে-জানে অর্থাৎ বেত্তা। স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানকে বলি অভিজ্ঞতা। আর অপরের অভিজ্ঞতা শুনে জানার নাম জ্ঞান। দৃশ্য ও অদৃশ্য, গুপ্ত ও

ব্যক্ত শক্তি ও বস্তু সমন্বিত বিশ্বে কোন জ্ঞানই আজো পূর্ণ কিংবা অখণ্ড হতে পারে নি। তাই এক কালের জ্ঞান অন্যকালে অজ্ঞতা ও মূর্খতা বলে উপহাস পায়। স্থান, কাল ও অন্যান্য প্রতিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে কারণ-ক্রিয়া নিরূপণ জাত সিদ্ধান্তই জ্ঞান। স্থান-কাল প্রতিবেশ কখনো অভিন্ন থাকে না। তাই কোন লব্ধ জ্ঞানও সর্বজনীন আর সর্বকালীন হতে পারে না। ফলে আমাদের যে-কোন অভিজ্ঞতা, জ্ঞান ও ধারণা সর্বক্ষণ সংশোধনসাপেক্ষ। তেমনি কোন আচার বা পদ্ধতিই ক্রটিমুক্ত নয়।

এসব তত্ত্ব যে শাস্ত্রবেত্তা, সমাজনেতা কিংবা রাষ্ট্রশাসকের অজানা, তা নয়। কিন্তু স্থিতিশীল সমকালীন পরিবেশ তাদেরকে যে-সুযোগ-সুবিধে দান করে, তার পরিবর্তনে স্ব স্ব জীবনে ও স্বার্থে অনিশ্চয়তা ও বিপর্যয় ডেকে আনতে তারা নারাজ। কেননা তা তাদের বিবেচনায় আত্মবিনাশের সামিল। তাই সুপ্রাচীন কাল থেকেই শাস্ত্রবিদেরা কেবল শাস্ত্রকেই চির-মানবের চিরন্তন জ্ঞান ও আচরণ-বিধির আকর বলে প্রচার করে। 'জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে অভ্রান্ত জ্ঞান শুধু শাস্ত্রেই মেলে। অন্যসব জ্ঞান মানবিক অজ্ঞতার প্রসূন। কাজেই যা কেতাবে নেই, তা চোখে-দেখা হলেও জগতে নেই। শাস্ত্রবিরুদ্ধ জ্ঞান কিংবা চিন্তা তাই নিষিদ্ধ। ঐরূপ চিন্তা, জ্ঞান কিংবা কর্ম বর্জনই শ্রেয়। কারণ অর্জন অমঙ্গলের আকর।' তাই সেকালের রোম থেকে সেদিনকার ইয়ামেন-লিবিয়াতেও আমরা অশাস্ত্রীয় বিদ্যার প্রবেশ নিষিদ্ধ দেখেছি। পাকিস্তানেও ইসলামী জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব বিঘোষিত ও বিকীর্তিত হতে শুনেছি।

আর আদমের আমল থেকেই গৃহপতি, গোত্রপতি ও সমাজপতিকে কৌলিক, গৌত্রিক ও সামাজিক রীতিনীতি এবং আচার-সংস্কার সংরক্ষণে সদা সতর্ক দেখা যায়। এরাও দ্রোহ সহ্য করে না। কল্যাণকর নতুন কিছু বরণ করার ঔদ্ধত্য কঠিন হস্তে দমনে এদের অনীহা নেই। এদেরও এক বুলি—যা শাস্ত্রসম্মত নয়, কিংবা লোকাচার-দেশাচার বিরুদ্ধ, যা নতুন তা-ই অনভিপ্রেত, তা-ই অবৈধ ও পরিহার্য। কারণ অন্যথায় তাদের স্বার্থ ও স্থিতি বিপর্যস্ত হয়, সমাজে প্রভাব-প্রতাপ বিনষ্ট হয়।

তেমনি শাসকের স্থিতি, স্থায়িত্ব ও স্বার্থের প্রতিকূল যা-কিছু, তা-ই রাজ্য বা রাষ্ট্রের অমঙ্গলকর-অনভিপ্রেত বলে চালিয়ে দেয়ার রেওয়াজও

আজকের নয়। রাজ্য পত্তনের মুহূর্ত থেকেই তার শুরু। এজন্যে প্রতিকার প্রার্থনা, প্রতিবাদ উচ্চারণ, কিংবা প্রতিরোধ প্রয়াস শাসনপালের ক্ষমার অযোগ্য ঔদ্ধত্য ও অমার্জনীয় অপরাধ বলে বিবেচিত।

শাস্ত্রকার যেমন শাস্ত্রের অনুগত মেষ-স্বভাব মানুষ চায়, সমাজপতি যেমন মানুষকে গড্ডলিকা বানাতে উৎসুক, সরকারও তেমনি নাগরিককে অনুগত-স্তাবক ও অনুগ্রহজীবী অনুচররূপে দেখার প্রত্যাশী।

অতএব, মানুষকে কেউ ধার্মিক বানাতে উৎসুক, কেউ সমাজ-শৃঙ্খল পরাতে উদ্যোগী, কেউ বা শাসনের নিগড়ে বাঁধতে ব্যস্ত।

শান্তি শৃঙ্খলার নামে সবাই আনুগত্যের অঙ্গীকারকামী। ব্যষ্টি ধার্মিক, সামাজিক ও নাগরিক হোক এই-ই কাম্য, কিন্তু বিবেকবান হোক, ন্যায়-পরায়ণ হোক—এক কথায় মানুষ হোক—এমন কামনা যেন কেউ-ই করে না।

মানবিক গুণের স্বাভাবিক বিকাশের ধারা

আমাদের শৈশব-বাল্যজীবনে আমাদের ঘরোয়া জীবনের বিশ্বাস-সংস্কার ও রীতি-নীতির প্রভাব এমন একটি জীবনবোধ, এমন একটি চেতনা দান করে যা প্রত্যয়ের ও প্রথার, বিশ্বাসের ও ভরসার, স্বস্তির ও সংস্কারের, এক অদৃশ্য অক্ষয় পাথুরে দুর্গ তৈরী করে। ঝিনুক কূর্মের দেহাধারের মতোই তা সংস্কারাজিত চেতনাকে সর্বপ্রযত্নে লালন করে।

জ্ঞানজ প্রজ্ঞা ও মানববিদ্যায় লভ্য তাৎপর্যবোধ মানুষের এই আরোপিত চেতনার দুর্গে আঘাত হেনে তাকে বদ্ধ চেতনার আশ্রয়চ্যুত করে নিঃসীম আকাশের নীচে মানবিক বোধের উদার প্রাঙ্গণে দাঁড় করিয়ে দেয়। তখন শুনে পাওয়া প্রত্যয় ও দেখে শেখা আচার ছাপিয়ে অর্জিত জ্ঞান, উদ্ভূত প্রজ্ঞা ও অনুশীলিত বিবেক প্রাধান্য পায়। তখন প্রজ্ঞা ও বিবেকের প্রভাবে আত্মায় ও আত্মীয়ে, স্বভাবে ও সংসারে, জীবনে ও জগতে, বিদ্যায় ও বিশ্বাসে, বিবেকে ও বিষয়ে, প্রজ্ঞায় ও প্রত্যয়ে দ্বন্দ্ব কমে এবং তেমন মানুষের হাতে অপর মানুষের বিপদ-সম্ভাবনা ঘুচে। এমনি সুজন সুনাগরিক সৃষ্টিই শিক্ষার লক্ষ্য।

শিক্ষার উদ্দেশ্য মানুষকে সংবাদের সিন্দুক করা নয়, সুন্দর ও সুস্থ জীবন রচনায় প্রবর্তনা দেয়া, সফল সার্থক জীবন-যাত্রার পথ ও পাথেয় দান। তেমনি জীবনযাত্রা সুখকর করবার জন্যে প্রয়োজনীয় কৌশল উদ্ভাবনে এবং দ্রব্য-সামগ্রী উৎপাদনে ও তাদের উপযোগ সৃষ্টিতেই বৈজ্ঞানিক প্রয়াস নিয়োজিত। পার্থিব জীবনের ব্যবহারিক প্রয়োজন মিটানো ও নিরাপত্তা সাধনই বিজ্ঞানের কর্তব্য। কিন্তু চিত্তক্ষেত্রে সামষ্টিক জীবনের কল্যাণ-প্রত্যাশায় প্রীতি, করুণা ও মৈত্রীর চাষ করা এবং ফসল ফলানো হচ্ছে বিবেকী আত্মার দায়িত্ব। বিজ্ঞানচর্চার মূলে রয়েছে স্বাধীন চিন্তা ও জিজ্ঞাসা। এ অন্বেষা প্রসারিত করে বহির্দৃষ্টি। এর নাম বিজ্ঞান। জ্ঞান শক্তিদান করে এবং শক্তির সুপ্রয়োগেই আসে ব্যবহারিক জীবনে সাফল্য ও স্বাচ্ছন্দ্য। যন্ত্রশক্তি তাই আজ অজেয় ও অব্যর্থ। কিন্তু ব্যবহারিক-বৈষয়িক জীবনযাত্রার সৌকর্য বাঁচা নয়, বাঁচার উপকরণ মাত্র। কারণ মানুষ বাঁচে তার অনুভবে ও বোধে, তার আনন্দে ও যন্ত্রণায়। সে অনুভবকে সুখকর সম্পদে, সে-বোধকে কল্যাণপ্রসূ ঐশ্বর্যে পরিণত করতে হলে চাই প্রজ্ঞা যে প্রজ্ঞা কল্যাণ ও সুন্দরকে প্রীতি ও মৈত্রীর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা প্রয়াসী।

বিজ্ঞানের প্রয়োগক্ষেত্রে জ্ঞান ও প্রজ্ঞার, প্রয়োজন ও প্রীতির সমতা রক্ষিত না হলে আজকের মানুষের প্রয়াস ও প্রত্যাশা ব্যর্থতায় ও হতাশায় অবসিত হবেই। কেবল তা-ই নয়, প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রতিহিংসা জিইয়ে রাখবে দ্বন্দ্ব-সংগ্রাম ও সংঘর্ষ সংঘাত। অতএব, আজ যন্ত্রের সঙ্গে জ্ঞানের, কালের সাথে কলিজার, ম্যাসিনের সাথে মননের, বলের সাথে বিবেকের নিকট ও নিবিড় যোগ এবং প্রাপ্তির সাথে প্রীতির, জ্ঞানের সাথে প্রজ্ঞার, বিজ্ঞানের সঙ্গে বিবেকের সমন্বয় ও সমতাসাধনই আজকের মানবিক সমস্যা সমাধানের পথ ও পাথেয়। উদ্দেশ্য-নিষ্ঠ উপায়চেতনা আন্তরিক করার জন্যেই আজকের মানুষকে মানববাদী হতে হবে।

কিন্তু কোন মানুষের মনের 'সায়' না থাকলে তাকে জোর করে বাঞ্ছিত ভালো বা মন্দ করা যায় না। তাই কোন নিয়মের নিগড়ে রেখে অভিপ্রেত বুলি শিখিয়ে অভীষ্ট ফল পাওয়া যাবে না, কেননা, মানুষ ম্যাশিন নয়। তার মন বলে যে-শক্তিটি রয়েছে তার অবাধ বিকাশেই কেবল সে সুষ্ঠু

মানুষ হতে পারে, এর জন্যে দরকার বিশ্বের সর্বপ্রকারের জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাথে তার যথাসম্ভব ও যথাসাধ্য পরিচয়। এ ক্ষেত্রে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পাঠক্রমে যে-কোন উদ্দেশ্যপ্রণোদিত নিয়ন্ত্রণ শিক্ষার্থীর মন-মেজাজ পঙ্গু করবেই। এ স্তর দুটোতে তাই স্পেসিয়ালাইজেশন বা বিষয়-বিশেষে প্রবণতা সৃষ্টির প্রয়াস মারাত্মকভাবে ক্ষতিকর হবে।

ধর্মশাস্ত্র শিক্ষা

শাস্ত্রের সঙ্গে শিক্ষার বিরোধ ঘুচবার নয়, শিক্ষার আপাত উদ্দেশ্য জ্ঞান অর্জন। কেননা জ্ঞানই শক্তি। জ্ঞানমাত্রই বর্ধিষ্ণু। কারণ জিজ্ঞাসা থেকেই জ্ঞানের উৎপত্তি। জিজ্ঞাসা অশেষ, তা-ই জ্ঞানও কোন সীমায় অবসিত নয়। নব নব চিন্তা-ভাবনায় ও আবিষ্ক্রিয়ায় জ্ঞানের পরিধি-পরিসর কেবলই বাড়ছে। যত জানা যায়, তার চেয়েও বেশী জানবার থাকে। জ্ঞানবৃদ্ধির অনুপাতে তথ্যের স্বরূপ ও তত্ত্বের গভীরতা ধরা পড়ে। এজন্যে জ্ঞানের সাথে ধর্মশাস্ত্র সমতা রক্ষা করতে অসমর্থ। কেননা ধর্মশাস্ত্রীয় সত্য হচ্ছে চিরন্তনতায় ও ধ্রুবতায় অবিচল। তার হ্রাস-বৃদ্ধি ও পরিমার্জন নেই। পক্ষান্তরে জ্ঞান হচ্ছে প্রবহমান। তার উন্মেষ, বিকাশ ও প্রসার আছে, আছে বিবর্তন ও রূপান্তর। নতুন তথ্যের উদঘাটন, নবসত্যের আবিষ্কার, পুরোনো জ্ঞানকে পরিশোধিত ও পরিবর্তিত করে। যেমন জ্ঞানের ক্ষেত্রে চাঁদ-সূর্য সম্পর্কে তথ্যগত ও তত্ত্বগত সত্যের রূপান্তর ঘটেছে। এবং জিজ্ঞাসু মানুষ তা দ্বিধাহীন চিত্তে গ্রহণ করেছে ও করছে। কিন্তু শাস্ত্রীয় চাঁদ-সূর্য সম্পর্কে প্রত্যয়জাত সত্যের পরিবর্তন নেই বেদে-বাইবেলে। জ্ঞানের সাথে বিশ্বাসের বিরোধ এখানেই। জ্ঞান প্রমাণ-নির্ভর আর বিশ্বাস হচ্ছে অনুভূতি-ভিত্তিক। জ্ঞান হচ্ছে ইন্দ্রিয়জ আর বিশ্বাস হচ্ছে মনোজ। শৈশবে বাল্যে শুনে-পাওয়া বিশ্বাস মানুষের মর্মমূলে ঠাঁই করে নেয়। তাই চিত্ত-লোকে আজো মানুষ জ্ঞানের আলো থেকে বঞ্চিত এবং বিশ্বাসের অরণ্যে পথের সন্ধানে দিশেহারা। ধর্মীয় বিশ্বাস কিংবা লৌকিক সংস্কার-নিষ্ঠা বন্ধ্যা, পক্ষান্তরে জ্ঞান সৃজনশীল। এজন্যেই রসায়ন-শাস্ত্রের অধ্যাপকও পড়াপানিতে পান রোগের ও দুর্ভাগ্যের নিদান, পদার্থ-বিজ্ঞানী ঝাড়ফুঁকে পান বৈদ্যুতিক সেঁকের ফল। উদ্ভিদ-বিজ্ঞানীর কাছেও বেলপাতার মর্যাদা আলাদা, জীববিজ্ঞানীও হুতুম, পেঁচা কিংবা টিকটিকির দৈব প্রতীকতায়

আস্থা রাখেন। ফলে প্রায় কেউই অধীত বিদ্যাকে অধিগত বোধে পরিণত করতে পারে না। জর্ডন-জমজম-গঙ্গার পানি, বার-তিথি-নক্ষত্র, হাঁচি-কাশি-হোঁচট, জীন-পরী-অপ্সরা, ভূত-প্রেত-দৈত্য অথবা পৌরাণিক সৃষ্টিতত্ত্ব ও দৈব-কাহিনী তাদের জীবনে ও মননে তাদের অধীতবিদ্যা ও পরীক্ষালব্ধ জ্ঞানের চেয়ে বেশী সত্য ও বাস্তব থেকে যায়। তাই নিজের সন্তানই যখন পিছু ডাক দেয়, তখন সে আর আত্মজ থাকে না, মুহূর্তের জন্যে হয়ে উঠে দৈবপ্রতীক। তেমনি হাঁচি কিংবা কাশি থাকে না নিছক দৈহিক প্রক্রিয়া—বিশেষ বিশেষ মুহূর্তে হয়ে উঠে দৈব ইশারা। সেরূপ কাক, হুতোম, পেচক কিংবা টিকটিকির ডাক হয়ে যায় দৈববাণী। এমনি করে আমাদের জীবনে অধীতবিদ্যা ও লব্ধজ্ঞান মিথ্যা হয়ে যায়। লালিত বিশ্বাস-সংস্কারই নিয়ন্ত্রণ করে আমাদের জীবন। ফলে বিদ্যা আমাদের বহিরঙ্গের আভরণ ও আবরণ হয়েই থাকে, আর বিশ্বাস-সংস্কার হয় আমাদের অন্তরঙ্গ সম্পদ। একারণে অর্জিত বিদ্যা, লব্ধ জ্ঞান, আর লালিত বিশ্বাসের টানা-পোড়েনে আমাদের ব্যক্তিত্ব হয় দ্বিধাগ্রস্ত, সত্তা হয় অস্পষ্ট। ভাব-চিন্তা-কর্মে আসে অসঙ্গতি।

যাঁরা ধর্ম ও বিজ্ঞানের, যুক্তি ও বিশ্বাসের সমন্বয় চান, তাঁরা চাঁদ-সূর্যের অন্বয়রূপে উপস্থিতিই কামনা করেন। এবং তা নিষ্ফলতাকে—বিড়ম্বনাকেই বরণ করার নির্বোধ আগ্রহ মাত্র। সামাজিক মানুষের জীবনে মূল্যবোধ জাগে যুক্তি অথবা বিশ্বাস থেকে। মূলত উপযোগ-চেতনা মূল্যেবোধের উৎস হলেও যুক্তি ও বিশ্বাসই তার বাহ্য অবলম্বন। কিন্তু বিশ্বাস হচ্ছে অন্ধ। বলতে গেলে যুক্তির অনুপস্থিতিই বিশ্বাসের জন্মদাতা। যুক্তি দিয়ে তাই বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠিত করা যায় না। বিশ্বাসের ভিত্তিতে যুক্তির অবতারণাও তেমনি বিড়ম্বনাকে বরণ করা ছাড়া কিছুই নয়। আজকাল একশ্রেণীর জননেতা, শিক্ষাবিদ, ও সমাজকল্যাণকামী মনীষী শিক্ষার ক্ষেত্রে ধর্ম ও বিজ্ঞানের, যুক্তি ও নীতি-বোধের সমন্বয় ও সহ-অবস্থান কামনা করছেন। নতুন ও পুরোনোর, কল্পনার ও বাস্তবের, যুক্তির ও বিশ্বাসের অথবা দুই বিপরীত কোটির সত্যের সমন্বয়সাধন করে নতুনে ও পুরাতনে, সত্যে ও স্বপ্নে সঙ্গতিস্থাপনে তাঁরা আগ্রহী। তাই পুরোনো ধর্ম ও পুরোনো নীতিবোধের সঙ্গে আধুনিক জীবনচেতনার মেলবন্ধনের উপায় হিসেবে তাঁরা বিজ্ঞানের সঙ্গে ধর্মশিক্ষা দানেও উদ্যোগী। কিন্তু এর পরিণাম

যে শুভ হবে না—অন্তত যে হয়নি, তার প্রমাণ পাদ্রী স্কুল ও নিউস্কীম মাদ্রাসা। এ-শিক্ষাপ্রাপ্ত মানুষ কথনো সন্দেহ-তাড়িত, কথনো বা বিশ্বাস-চালিত। এই মানুষের জ্ঞানে-বিশ্বাসে দ্বন্দ্ব কখনো ঘুচে না। তাই তার জীবন হয় দ্বৈত সত্তায় বিকৃত। ব্যক্তিত্ব থাকে অনায়ত্ত।

আজকের দিনের শিক্ষা-সমস্যা

বলেছি স্বার্থ বজায় রাখার জন্যে চিরকাল নেতারা নামান্তরে একই নীতি-পদ্ধতি চালু রেখেছে। আদিকালে গোত্রীয় স্বাতন্ত্র্যের নামে, পরে উপাস্যের অভিপ্রতার আবেদনে এবং একালে দৈশিক, রাষ্ট্রিক, ভাষিক, ধার্মিক কিংবা মতবাদীর ঐক্যের নামে মানুষে মানুষে বৈরিতার কারণ জিইয়ে ও ব্যবধানের প্রাচীর খাড়া রেখেছে। শাস্ত্রানুগত্যপ্রসূত নীতিবোধ ও স্বার্থ-চেতনাজাত স্বাতন্ত্র্য-বুদ্ধি ধর্ম ও জাতীয়তার নামে বন্দিত হচ্ছে এবং ঐ দুটোর নামে চিরকাল যেমন দেশে দেশে নর-বিধ্বংসী যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়েছে তেমনি আজো হচ্ছে—অদূর ভবিষ্যতেও হবে। কেননা আজো শাসকেরা সেই সনাতন নীতির সুফলপ্রসূতায় আস্থাবান।

সেজন্যেই আজকাল রাষ্ট্রও রাষ্ট্রাদর্শের সাথে সঙ্গতি রক্ষা করে ব্যক্তিক, পারিবারিক, সামাজিক ও নাগরিক জীবনের সর্বক্ষেত্রে ভাব-চিন্তা-কর্ম, আচার-আচরণ, রীতি-রেওয়াজ, নীতি-নিয়ম, বিধি-বিধান প্রভৃতি নির্দিষ্ট ও নিয়ন্ত্রিত হয়। মানুষ যে ম্যাশিন নয়, পোষা প্রাণীও নয়, জীবন যে যান্ত্রিক নয়, মন যে মানব-ব্যবহারনিয়ন্তা, তা স্বীকার করলে ওদের চলে না।

শিক্ষাব্যবস্থাও জীবন-জীবিকা সংলগ্ন। তাই দেশে দেশে শিক্ষা-নীতিতে দেশ-জাত-বর্ণ-ধর্মের প্রলেপ-প্রসাধনের ব্যবস্থাও বাঞ্ছিত হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর ফল দুনিয়ার কোথাও কখনো ভাল হয়নি। তবু স্বার্থবুদ্ধির প্রাবল্যে সদ্‌বুদ্ধি লোপ পেয়েছে। শাস্ত্রের, সমাজের ও সরকারের শিক্ষিত লোককে—বিশেষ করে শিক্ষিত বেকারে বড়ো ভয়। কেননা ওদের চিন্তা ও উদ্যোগই তাদের কায়েমী স্বার্থে ও সুস্থ জীবনে বিপর্যয় ঘটায়। তাই সরকারমাত্রই নানাভাবে শিক্ষানিয়ন্ত্রণে প্রয়াসী। বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রতি সরকারী আগ্রহের মূলে রয়েছে ঐ নীতি। অথচ কোটি কোটি অশিক্ষিত লোক থেকে সরকারের—সমাজের কোন বিপদ-

বিপর্যয় নেই বলে তাদের সম্বন্ধে কেউ মাথা ঘামায় না। ভয়ই দরদের আবরণে শিক্ষিতদের প্রতি সরকারের দায়িত্ব ও কর্তব্য গুরুতর করে তোলে।

জ্ঞানার্জনের, বিদ্যাভ্যাসের কিংবা কৌশল আয়ত্তকরণের বা নৈপুণ্য-লাভের উদ্দেশ্য হচ্ছে জীবন-জীবিকার নিরাপত্তা, স্বাচ্ছন্দ্য, সাচ্ছল্য ও উৎকর্ষসাধন। জ্ঞান উপায়, উদ্দেশ্য নয়। জ্ঞান কোন সাফল্যে উত্তরণ ঘটায় না। কেননা জ্ঞানের তিনটে স্তর—শেখা, জানা ও বোঝা, তথা শিক্ষা, জ্ঞান ও প্রজ্ঞা। যে শিশু 'কাননে কুসুম কলি সকলি ফুটিল' শেখে, সে কোন পদেরই অর্থ বোঝে না। যে বালক এ চরণ জানে, সেও তার তাৎপর্য বোঝে না। বয়স হলে বোঝে। 'বরিশালে ধান ও পাট জন্মে' এ তথ্য জ্ঞানমাত্র। ধান ও পাট উৎপাদনের প্রয়োজন-চেতনাই তথা তাৎপর্যবোধই প্রজ্ঞা! অতএব জ্ঞান জিজ্ঞাসার সন্তান আর প্রজ্ঞা উপ-লব্ধির ফসল। সুতরাং যা' শেখানো হয় তাই শিক্ষা, যা' জানা যায়, তাই জ্ঞান বা বিদ্যা—এতে মানুষের কোন উপকার হয় না—যদি না তা বোধের স্তরে উন্নীত হয়ে বোধি হয়। লোক-প্রচলিত বিশ্বাস—শিক্ষা ও জ্ঞান মনুষ্য-চরিত্র উন্নত ও নির্দোষ করে এবং মনুষ্য-রুচি মার্জিত করে। কিন্তু এ তত্ত্বেও কোন তথ্য নেই। শিক্ষায় বা বিদ্যায় মানুষের চরিত্র বদলায় না বরং যার যা চরিত্র ও রুচি, তা স্বকীয় লক্ষণে বিকশিত হবার সুযোগ পায় মাত্র। পৃথিবীর অধিকাংশ নরদেবতা ছিলেন নিরক্ষর—অশিক্ষিত, তেমনি নরদানবদের অধিকাংশ ছিল শিক্ষিত ও জ্ঞানী। আমাদের দেশেও আজ দুর্নীতি ও চরিত্রহীনতার সমস্যা তো শিক্ষিত লোক-সৃষ্ট সমস্যা।

কাজেই জ্ঞানার্জনের প্রয়োজন জ্ঞানজ প্রজ্ঞা লাভের জন্যেই। সে-প্রজ্ঞার লক্ষ্যে নিয়োজিত না হলে যে জ্ঞানচর্চা বৃথা, তার সাক্ষ্য ইতিহাস।

এমন এক সময় ছিল, যখন আমরা বলেছি, আমরা আগে মুসলমান পরে ভারতিক। তারপরে বলেছি আগে পাকিস্তানী পরে বাঙালী, এখন বলছি আমার একমাত্র পরিচয় আমি বাঙালী অর্থাৎ আমি আগে বাঙালী পরে মুসলমান বা হিন্দু। অতএব, আমরা কখনো মুসলমান, কখনো পাকিস্তানী, কখনো বা বাঙালী। আমাদের লক্ষ্য যেন কখনো 'মানুষ' হবার দিকে ছিল না, এখনো নেই। বড় জোর আমরা বাঙালী মানুষ হব, মানুষ বাঙালী হবার বাসনাই যেন মনে ঠাঁই পায় না। অবশেষে হয়তো

একদিন সেই পুরোনো বিলাপ কিংবা খেদ শোনা যাবে—'রেখেছ বাঙালী করে মানুষ করোনি'। আজকের আবেগের কুয়াশা ও উচ্ছ্বাসের ধূলিঝড় অবসিত হলে আমরা স্বস্থ হয়ে হয়তো স্বীকার করব সখেদে—'রয়েছি বাঙালী হয়ে মানুষ হইনি'।

এ যুগে কিন্তু ঠকে শেখার প্রয়োজন হয় না, দেখেই শেখা যায়। তাই ধর্মীয় ও জাতীয় স্বাতন্ত্র্য-চেতনা যে মানব-দুর্ভোগের কারণ এবং এযুগে দুনিয়ার কোথাও যে একক ধর্মের ও এক জাতের মানুষের বাস সম্ভব নয়, সর্বক্ষেত্রেই সংমিশ্রণ ও সাঙ্কর্য অপরিহার্য, তা জেনে-বুঝে একালে ও'দুটোর বাজার-মূল্য কমিয়ে দেয়াই কল্যাণকর, তা-ই বাঞ্ছনীয়। আমরা পারিবারিক-সামাজিক জীবনে একাধারে কারো সন্তান, কারো বন্ধু, কারো শত্রু, কারো মনিব, কারো বান্দা, তাতে একটা অপরটার বাধা হয়ে দাঁড়ায় না। তেমনি দেশ-জাত-বর্ণ-ধর্ম-চেতনা নিয়েও আমাদের প্রথম ও শেষ পরিচয় আমরা মানুষ। বিশেষ রাষ্ট্রের অধিবাসী হয়েও আমরা বিশ্বের নাগরিক এবং আন্তর্জাতিক হতে পারি।

রাষ্ট্রাদর্শ অনুগ তথা সরকার-বাঞ্ছিত শিক্ষা-পদ্ধতি কতকগুলো তোতা পাখি কিংবা পোষমানা প্রাণী তৈরী করতে হয়তো সমর্থ। কিন্তু সুষ্ঠু মানসের মানুষ গড়তে পারে না। সার্কাসের বাঘ-সিংহ যেমন যথার্থ শ্বাপদ নয়—তাদের বিকৃত রূপ, তেমনি আরোপিত আদর্শের ও নীতি-চেতনার খাঁচায় লালিত বিদ্বানও সম্পূর্ণ মানুষ হয় না। টবের গাছ ও হাঁড়ির মাছ কখনো স্বাভাবিক বাড় পায় না। জ্ঞানের জগতে শিক্ষার্থীদের অবাধে ছেড়ে দিলে তাদের মন-মেজাজ-মনন স্বাধীন বিকাশ লাভ করবে। আর এটাই কাম্য হওয়া বাঞ্ছনীয়। জ্ঞানের জগতে দেশকাল-জাতিধর্ম নেই, আছে কেবল তথ্য ও তত্ত্ব। এবং মানুষের আবিষ্কৃত তথ্যে ও উদ্ভাবিত তত্ত্বে সর্বমানবিক উত্তরাধিকার রয়েছে।

তত্ত্বকথা বাদ দিয়েও বলা যায়—কলেজী-বিশ্ববিদ্যালয়ী শিক্ষার তথা পাঠক্রমে তথ্য ও সত্যের প্রতি আনুগত্য রেখে জাতীয়, ধর্মীয় কিংবা রাষ্ট্রীয় আদর্শ-উদ্দেশ্যের প্রতিবিম্বন বা প্রতিফলন সম্ভব নয়। তাহলে কেবল প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বৃহৎ পৃথিবীকে, নিরবধি কালকে, বিশ্বের লব্ধজ্ঞানকে লুকিয়ে ছাপিয়ে গাড়ীর ঠুলিপরা ঘোড়ার কিংবা ঘানির

চোখবাঁধা বলদের মতো নিয়ন্ত্রিত-দৃষ্টির বিভ্রান্ত-মনের নরম মনোভূমে বিকৃতির বীজ উপ্ত করে কতগুলো আধা-মানুষ তৈরী করে কি লাভ! কেননা, দেখা গেছে কোন কল্যাণকর চিন্তা বা কোন সুখকর সৌন্দর্য থেকে মানুষকে কোথাও বেশীদিন বঞ্চিত রাখা যায়নি, বিশেষ করে আজকের বিশ্বে তা নিতান্ত হাস্যকর ব্যর্থ প্রয়াস।

এই যন্ত্র-যুগে বিশ্বের কোন প্রান্তের কোন ভাব, চিন্তা, কর্ম, মত, আদর্শ কিংবা সংগ্রাম সেখানেই নিবদ্ধ থাকে না, তারে-বেতারে, লোকমুখে কিংবা পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে তা বিশ্বময় ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে। এখনকার সংহত বিশ্বের মানবিক ভাব-চিন্তা-কর্ম আলোর মতো, বাতাসের মতো সর্বমানবের উপভোগ্য ও উপজীব্য হয়ে উঠে। কেউ কাকেও শত প্রযত্নেও বঞ্চিত করতে পারে না। তা ছাড়া নতুন ভাব, চিন্তা, কর্ম, মত বা আদর্শ চিরকালই একক মানুষের দান। সে-মানুষ কোথায় কখন কিভাবে আত্মপ্রকাশ করে, তা কেউ আগে থেকে জানতে পায় না। ঐ একজনের আবির্ভাবের ভয়ে অসংখ্য মানুষকে পঙ্গু করার ব্যবস্থা রাখা অমানবিক। ফেরাউন কিংবা কংসের ব্যর্থতার কথা এ সূত্রে স্মর্তব্য।

এও উল্লেখ্য যে, আজ আমরা আমাদের রাষ্ট্রের যে চতুরাদর্শের কথা ভেবে গর্বিত, তাদের প্রত্যেকটিই এককালের নিষিদ্ধ-কথা এবং পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন স্থানে তাদের উদ্ভব আর প্রত্যেকটির জনক বা উদ্ভাবকও একক ব্যক্তি। এসব চিন্তার জনককে হয়তো লাঞ্ছিত, নয়তো নিহত হতে হয়েছে। প্রথম-দিকে ধারক বাহকদেরও নিয়তি ছিল অভিন্ন। কিন্তু তবু উচ্চারিত চিন্তা বা মত বা আদর্শের সংক্রমণ থেকে পৃথিবী মুক্ত থাকেনি। বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়তে ও স্বীকৃতি পেতে সময় লেগেছে বটে, কিন্তু নিরবধি কালের তুলনায় তা কিছুই নয়। অতএব শিক্ষার মাধ্যমে অনুগতজন তৈরীর রাষ্ট্রিক প্রয়াস বৃথা ও ব্যর্থ হবেই।

বৃটিশ আমলে দায়ে ঠেকে এ দেশের সীমিত সংখ্যার মানুষকে কেরানী ও চাকুরে বানাবার জন্যে শাসকগোষ্ঠী ইংরেজী শিক্ষা চালু করেছিল বটে, কিন্তু এদেশে উচ্চশিক্ষায়ও ক্যামব্রিজ-অক্সফোর্ডের অনুকৃতি ছিল এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান-সাহিত্য-দর্শনের কোন কেতাব থেকেই এদেশী ছাত্রকে বঞ্চিত করা হয়নি। এ বিদ্যায় যে-কয়জন মানুষ হবার হয়েছে, যারা না হবার হয়নি।

কিন্তু শিক্ষাবিস্তারের কোন ইচ্ছাই সরকারের ছিল না। এ সরকারী নীতি আজ অবধি এদেশে অপরিবর্তিত রয়েছে।

অবশ্য বিশুদ্ধ জ্ঞান-বিজ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে ধর্মীয়, জাতীয় কিংবা রাষ্ট্রিক আদর্শ ও নীতি কেজো ও প্রয়োগযোগ্য না হলেও বৈষয়িক বিদ্যা রাষ্ট্রিক প্রয়োজনানুগ হতে পারে, যেমন প্রযুক্তি বিদ্যা, ব্যবসায়-বাণিজ্য, ব্যবস্থাপনা বিদ্যা, নৌবিদ্যা, সমরবিদ্যা, খনিজবিদ্যা, ভূবিদ্যা, সমুদ্রবিদ্যা প্রভৃতি জীবিকা সংস্থান লক্ষ্যে বৃত্তিমূলক বিদ্যায় রাষ্ট্রিক নিয়ন্ত্রণ অসঙ্গত নয়। এসব বিদ্যালয়-ক্ষেত্রে শিক্ষাকে গণমুখী, দৈশিক, জাতিক কিংবা আঞ্চলিক করা এবং শিক্ষার্থীর সংখ্যা সীমিত করাও অযৌক্তিক হবে না।

কিন্তু মানুষ গড়া অর্থাৎ মানবিক বোধ-বিবেকের উৎকর্ষসাধন লক্ষ্যে শিক্ষাদান করতে হলে মানববিদ্যায় গুরুত্ব দিতেই হবে। কেননা, মানব-বিদ্যাই মানুষের মানসজগৎ প্রসারিত করে। বিজ্ঞান, প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিদ্যা মানুষের ব্যবহারিক জীবনের প্রয়োজন মিটায়, কিন্তু যে নৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ মানুষকে নির্বিশেষ মানুষ ও মানববাদী করে তা বহুলাংশে মানববিদ্যার প্রভাবপ্রসূত। প্রাণ থাকলেই প্রাণী, জীবন থাকলেই জীব, তেমনি পরিস্রুত মন থাকলেই হয় মানুষ। মানুষ হিসেবে বাঁচতে হলে মনের ঐশ্বর্য চাই। নইলে জৈব-জীবন অসার। ইতিহাস, দর্শন, সমাজতত্ত্ব, সাহিত্য-শিল্প প্রভৃতিই মানুষের মনের হীনতা, সঙ্কীর্ণতা, অজ্ঞতা, অসূয়া, অসহিষ্ণুতা ঘুচিয়ে উদারবোধের জীবনে উত্তরণ ঘটাতে পারে। কেননা, প্রজ্ঞা, প্রীতি ও কল্যাণবুদ্ধির পরিশীলন ও বিকাশ এ মানববিদ্যার উদার অঙ্গনেই সম্ভব। আজ যন্ত্র ও যান্ত্রিকতা মানুষের বৈষয়িক ও ব্যবহারিক জীবন নিয়ন্ত্রণ করছে। তাই মানববিদ্যার মাধ্যমে মনের পরিচর্যা আজ আরো জরুরী হয়ে উঠেছে। কেননা যন্ত্রীর মন যদি কল্যাণকামী না হয়, তাহলে যন্ত্র কখনো কল্যাণপ্রসূ হতে পারে না।

জ্ঞানকে আমরা চোখের সঙ্গে অভিন্ন করে দেখি। চোখের দৃষ্টি আমাদের চলার পথ নির্বিঘ্ন করে, জীবন-জীবিকার সর্বক্ষেত্রেই সহায়ক হয়। জ্ঞানও তেমনি প্রজ্ঞারূপে আমাদের মানসজীবন উদ্দীপ্ত, নিরাপদ ও স্বস্তিকর করে।

উপসংহার

আপাতদৃষ্টিতে শিক্ষা সম্পর্কে আমাদের আলোচনা প্রত্যক্ষ ও বাস্তব সমস্যাভিত্তিক না হয়ে পরোক্ষ ও অপ্রাসঙ্গিক বক্তব্যে অবসিত হল বলে মনে হবে। ভাববাদী বলে নিন্দিত হওয়ার ঝুঁকি নিয়েও বলব—এ যুগের জটিল জীবন-চেতনার এবং দুঃসাধ্য জীবিকা-সংস্থান প্রয়াসের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষাক্ষেত্রে মানবিক চেতনার ও জীবিকার ভারসাম্য রক্ষার গুরুদায়িত্ব এখন শিক্ষালয়ে শিক্ষকের। সেইজন্যেই জৈবিক ও মানবিক বৃত্তির একটা সমন্বয়সাধন অত্যন্ত জরুরী। আর এই ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করতে হলে মানবিক গুণের স্বাধীন ও সুষ্ঠু বিকাশ ব্যাহত না করেই জৈবিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক প্রয়োজনানুগ বৃত্তিমূলক শিক্ষাদান বাঞ্ছনীয়। তাই আমরা মনে করি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে কেবল মানববিদ্যা ও বিজ্ঞানের পাঠক্রম পড়ুয়াদের গ্রাহিকা-শক্তি অনুযায়ী তৈরী হওয়া আবশ্যিক। প্রাথমিক স্তরে পড়ুয়াদের কৌতূহল ও জিজ্ঞাসা জাগানোই থাকবে প্রধান লক্ষ্য। মাধ্যমিক স্তরে (বয়ঃসীমা পনেরো) বুদ্ধিবৃত্তি, সৌন্দর্যচেতনা ও শ্রেয়বোধ জাগানোর লক্ষ্যেই পাঠক্রম রচিত হবে। এবং উচ্চশিক্ষায় পড়ুয়াদের প্রবণতা অনুসারে বৃত্তিমূলক বিদ্যা নির্বাচনে স্বাধীনতা থাকা দরকার। অবশ্য কৃষিবিদ্যা, কৃৎ-কৌশল, প্রযুক্তি, চিকিৎসা, সমুদ্রবিদ্যা, নৌবিদ্যা, সমরবিদ্যা প্রভৃতির ক্ষেত্রে বিনিয়োগ সামর্থ্যানুযায়ী সংখ্যা-নিয়ন্ত্রণ রাষ্ট্রের পক্ষে অন্যায় বা অবাঞ্ছিত নয়। কারণ রাষ্ট্রের জনগণের ভাত কাপড়ের ব্যবস্থা করা শেষাবধি রাষ্ট্রের দায়িত্ব ও কর্তব্য বলে স্বীকৃত। কিন্তু তাই বলে মানুষ নির্বিশেষের মানবিক গুণ বিকাশের স্বাধীন অধিকার থেকে কাউকেও বঞ্চিত রাখা এযুগে নিশ্চয়ই অমানুষিক অপরাধ। তাই কেবল কর্মী ও যন্ত্রী হওয়া কিংবা বানানো জীবনের বা রাষ্ট্রের লক্ষ্য হতে পারে না। এ কারণেই শিক্ষার ক্ষেত্রে আমরা মাধ্যমিক স্তর অবধি কেবল মানুষ গড়ার পদ্ধতি উদ্ভাবনে ও আবিষ্কারে গুরুত্ব দিতে চাই।

শিক্ষায় মানুষমাত্রেরই যে জন্মগত অধিকার রয়েছে, তা আজ আর অস্বীকৃত নয়। তাই কাজ দেয়া যাবে না বলে সাধারণ শিক্ষা থেকে কাউকে বঞ্চিত রাখা চলবে না! এই সাধারণ শিক্ষাকে মাধ্যমিক স্তর অবধি জীবন-সংলগ্ন রাখতে হবে, যেমন উচ্চশিক্ষা হবে জীবিকা-সংপৃক্ত। কারণ

বোধশক্তির ও বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশই মনুষ্যত্বের সোপান। তাই সর্বজনীন তথা গণশিক্ষার প্রবর্তন ও বয়স্কশিক্ষার আশু ব্যবস্থা করা আবশ্যিক।

এ সূত্রে বিশেষ স্মর্তব্য যে, সাধারণ মানববিদ্যার সঙ্গে যেমন বিজ্ঞান, বাণিজ্য ও প্রযুক্তিবিদ্যারও কিছু সংলগ্নতা কাম্য ও আবশ্যক, তেমনি উচ্চবৃত্তিমূলক বৈষয়িক বিদ্যা শিক্ষার ক্ষেত্রে ইতিহাস, দর্শন, সাহিত্য ও শিল্পের যে-কোন একটি পাঠ্য রাখা দরকার। তা হলেই কেবল বিবেকবান আনাড়ি-মানুষ বা হৃদয়হীন যন্ত্রী-মানুষ তৈরীর সমস্যা থেকে সমাজ মুক্ত থাকবে। এ ছাড়া বিবেচক মানববাদী মানুষ তৈরীর অন্য উপায় আজো অনাবিষ্কৃত।

শিক্ষা সম্বন্ধে আজকের ভাবনা

শিক্ষাপদ্ধতি ও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে গোটা জাতির স্বার্থ জড়িত। এবং জাতীয় জীবনে শিক্ষার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আর কিছুই নেই। কেননা আজ অবধি মানুষের জীবন-জীবিকা প্রকৃতপক্ষে শিক্ষিত লোকেরাই নিয়ন্ত্রণ করে। নিরক্ষরতার যুগেও সামাজিক প্রয়োজনে মৌখিকভাবে ও ঘরোয়া পরিবেশে 'লোকশিক্ষা'র ব্যবস্থা চালু ছিল। এই 'লোকশিক্ষা'র বিষয় ছিল নৈতিক, বৈষয়িক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও শাস্ত্রীয় আচরণসংপৃক্ত রীতি-পদ্ধতি ও আচার-পার্বণ সম্বন্ধীয় নীতি-রেওয়াজ। ছড়া, প্রবাদ, প্রবচন, আপ্তবাক্য, ইতিকথা, রূপকথা ও কিংবদন্তী প্রভৃতির মাধ্যমে লোকায়ত ও গৃহগত বিশ্বাস-সংস্কার, দায়িত্ব-কর্তব্যবোধ, ন্যায়-অন্যায় জ্ঞান, আদর্শ-উদ্দেশ্য চেতনা প্রভৃতি প্রচারিত ও প্রচলিত থাকত। পুরুষানুক্রমে মুখে মুখে ও কানে কানে চালু থাকত শাস্ত্র-সমাজ-রোগ-চিকিৎসা প্রভৃতি জীবন-জীবিকাসংপৃক্ত সর্বপ্রকার শিক্ষা। এ-সব শিক্ষায় যারা জ্ঞানী-গুণী ও অভিজ্ঞ হত, তারাই থাকত দলপতি বা সমাজপতি—সর্দার। আজো অজ গাঁয়ে কিংবা আরণ্যমানবে তা বিরল নয়। নিরক্ষরতার যুগে অভিজ্ঞ প্রধান ব্যক্তি মাত্রই ছিল শ্রদ্ধেয়, মান্য ও উপদেষ্টা। রূপকথার রাজ্যে সঙ্কটকালে তাই অবসরপ্রাপ্ত বুড়ো মন্ত্রীর ডাক পড়ত সঙ্কটত্রাণের উপায় বাতলে দেয়ার জন্যে। নিরক্ষরতার যুগে অভিজ্ঞতাই ছিল নির্ভরযোগ্য বিশেষজ্ঞ বা প্রজ্ঞাবান জ্ঞানী হবার উপায়। নিজের জীবনের ঘটনা থেকে শেখার নাম অভিজ্ঞতা আর অন্যের অভিজ্ঞতা জেনে শেখার নাম জ্ঞান। ব্যক্তির সীমিত জীবনে অভিজ্ঞতাও থাকে সীমিত ও স্বল্প। কেবল উদ্যমশীল দুঃসাহসী পর্যটকের—অভিযাত্রীর জীবনেই বহুদর্শিতালব্ধ অভিজ্ঞতা কচিৎ বহু ও বিচিত্র হত। সে-রকম অনন্য মানুষও ছিল দুর্লভ।

হরফ আবিষ্কৃত হওয়ার পরে লেখার মাধ্যমে পরের বিভিন্ন বিষয়ক সর্বপ্রকার অভিজ্ঞতা জেনে নিয়ে জ্ঞানী হওয়ার পথে উৎসুক মানুষের

আর কোন বাধা রইল না। আর কে না জানে জ্ঞানই শক্তি! এই জ্ঞান দিয়েই আমরা জগৎকে জানি, জীবনকে বুঝি, সমাজ গড়ি, জীবিকা সংগ্রহ করি, জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য-সাচ্ছল্য-সুখ সৃষ্টি করি। এ লক্ষ্যেই তৈরী হয়েছে শাস্ত্র-সমাজ-রাষ্ট্র-সংস্কৃতি-সভ্যতা সবকিছু। জীবন-জীবিকা সম্বন্ধে জ্ঞান-লাভ করে জীবনে নির্বিঘ্নে চলার পাথেয় তথা যোগ্যতা অর্জন করার সাধারণ নামশিক্ষা। অতএব সাধারণভাবে শিক্ষিত জ্ঞানীরই নামান্তর মাত্র। যেহেতু জ্ঞানই শক্তি, সেহেতু মানুষের ব্যক্তিক, ঘরোয়া, পারিবারিক, সামাজিক, আর্থিক, নৈতিক, সাংস্কৃতিক, ধার্মিক, নাগরিক, ও রাজনীতিক জীবন দুনিয়ার সর্বত্র শিক্ষিত মানুষের নেতৃত্বে ও কর্তৃত্বে নিয়ন্ত্রিত হয়।

এ শিক্ষা বা জ্ঞান যদি ত্রুটিপূর্ণ হয়, তা হলে মানুষ হয় অমানুষ। তখন জীবনে-সমাজে-রাষ্ট্রে নেমে আসে বিপর্যয়। অর্থাৎ বিদ্যার সঙ্গে বুদ্ধির, জ্ঞানের সঙ্গে প্রজ্ঞার, বোধের সঙ্গে বিবেকের, উদ্যোগের সঙ্গে আয়োজনের. উদ্দেশ্যের সঙ্গে আদর্শের, কর্মের সঙ্গে নীতির, দায়িত্বের সঙ্গে চরিত্রের, কর্তব্যের সঙ্গে সদিচ্ছার, সেবার সঙ্গে সততার, ত্যাগের সঙ্গে তিতিক্ষার, ভোগের সঙ্গে সংযমের আনুপাতিক সংযোগ-সামঞ্জস্য না ঘটলে বিদ্যা-বুদ্ধি-জ্ঞান-কর্মনিষ্ঠা যে জীবনে-সমাজে-সংসারে বিপর্যয় ঘটিয়ে বহু দুঃখের আকর হয়ে দাঁড়ায়. আজকের অনগ্রসর রাষ্ট্রগুলোতে শিক্ষিত লোকের চরিত্রহীনতাপ্রসূত দুর্নীতি-বাহুল্যই তার সাক্ষ্য। নির্ধন-নিরক্ষর-নিঃস্ব-নিঃসহায় কোটি কোটি মানুষ দুনিয়ার অনগ্রসর, অনুন্নত দেশগুলোতে বিবেকবর্জিত শাসক-প্রশাসক-শাস্ত্রী-সার্থবাহনদের শাসন-শোষণ-পেষণ-পীড়ন-নির্যাতনের প্রভাব ও প্রতাপের শিকার রূপে অমানবিক জীবন যাপনে বাধ্য হয়ে অকালে অপমৃত্যুর কবলে পড়ে। অশেষ সম্ভাবনাময় জীবনে বিকাশের, বিস্তারের, আনন্দের, অবদানের ও উপভোগের দিগন্তদুয়ার থাকে চিররুদ্ধ। এমনি করে দুর্লভ মানবজীবন হয় অপচিত ও অবসিত।

প্রীতিহীন হৃদয়, প্রত্যয়হীন কর্ম এবং বিবেকবিরহী বিচার যে বন্ধ্যা, তা যে নিজের কিংবা পরের কোন কল্যাণ করতে অসমর্থ, শিক্ষার মাধ্যমে এই গুরুত্বপূর্ণ চেতনদানই শিক্ষার মৌল লক্ষ্য হওয়া আবশ্যিক।

মানুষ এমনি শিক্ষা না পেলে মানবিক সমস্যার সমাধান হওয়া অসম্ভব।

আজকাল শিক্ষার অর্থকর উৎপাদন-যোগ্যতার তথা বৃত্তিমূলকতার উপর গুরুত্ব দেয়া হয়। কিন্তু উদ্দেশ্যবিহীন কর্ম যেমন নিষ্ফল, তেমনি চরিত্রবর্জিত শিক্ষিত মানুষও সমাজের দায়—সম্পদ নয়। কেননা তার চিন্তা ও কর্ম বহুজনহিত ও বহুজন সুখ-লক্ষ্যে নিয়োজিত হয় না। তাই আমরা শিক্ষার নৈতিকতা ও বৃত্তিমূলকতার সহস্থিতি আবশ্যিক বলে মানি। কিন্তু কেবল শিক্ষায়তনে শেখা নীতিকথায় মানুষের চরিত্র গড়ে উঠে না। তা'ছাড়া জ্ঞান শক্তি দেয়, চরিত্র গড়ে না। চরিত্র গঠিত হয় পারিবারিক পরিবেশে। আজ আমাদের শিক্ষালয়গুলো নৈতিক দৈন্যপ্রসূত দুর্নীতি ও অরাজক উচ্ছৃঙ্খলার আকরও বটে, কিন্তু তা' বিদ্যালয়ের দোষে নয়, পারিবারিক ঘরোয়া পরিবেশে ও সমাজ-প্রতিবেশে নৈতিক ও চারিত্রিক মূল্যবোধের প্রেরণা পায় না বলেই। ব্রিটিশ-শাসনের অবসানে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে শিক্ষিত উঠ্‌তি মধ্যবিত্ত বয়স্ক মানুষেরা লাভের-লোভের প্রায় নির্দ্বন্দ্ব-নির্বিঘ্ন সুযোগ পেয়ে চরিত্র হারায়। সেই দূষিত ঘরোয়া ও সামাজিক প্রতিবেশে যারা মানুষ হল তারাও আবার একটা বিপ্লবের নয়, আকস্মিক বিপর্যয়ের সুযোগে নৈতিক-চারিত্রিক ক্ষেত্রে শিথিল-শাসনের প্রশ্রয়ে শঙ্কা-সঙ্কোচ-শরম পরিহার করে উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠে। পাপ-নিন্দা-অপরাধ-চেতনাবিরহী এই মানুষকে নীতি-ও নিয়মনিষ্ঠ করে তেমন সাধ্য কারুর বা কিছুর নেই। কাজেই আজকের পরিস্থিতির জন্যে কেবল শিক্ষক, ছাত্র, সরকার, অভিভাবক দায়ী নয়, প্রত্যক্ষে ও পরোক্ষে দায়ী গোটা শিক্ষিত সমাজ। অতএব আমাদের নৈতিক-শৈক্ষিক-সামাজিক বিপর্যয় আকস্মিকও নয়, অহেতুকও নয়,—কাজেই অভাবিত নয়। মূল্যবোধেরই অপর নাম যে সংস্কৃতি—সেকথা আমরা কখনো মনে রাখিনি। তাই এ পরিণাম!

এই দুর্নীতি ও অরাজক বুনো পরিস্থিতির প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাবে আজ দেশের সামগ্রিক জীবন-প্রবাহ বিশৃঙ্খল-বিপর্যস্ত। গোটা জাতির ঘরোয়া, সামাজিক, নৈতিক, আর্থিক, বাণিজ্যিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক জীবন আজ কলুষিত, বিকৃত, বিষাক্ত ও অনিশ্চিত। জাতীয়

জীবনে এর চেয়ে দুর্যোগ-দুর্দিন আর কিছুই হতে পারে না। আজ দেশের মানুষের চরিত্রহীনতাই সমাজের সর্বস্তরে মূল সমস্যা, প্রায় অধিকাংশ দুঃখের আকর বা উৎস।

সারাদেশের এ সমস্যার সমাধানের শক্তি, সামর্থ্য, অধিকার কিংবা উপায় আমাদের নেই। তবে সচেতন নাগরিক হিসেবে 'স্ব'-এর ও স্ব-জনের হিতে অন্তত আমরা ঘরোয়া, সামাজিক ও বৈষয়িক জীবনে স্ব স্ব এলাকায় যদি নীতি ও নিয়মনিষ্ঠ হই এবং সাহস করে বিপদের ঝুঁকি নিয়ে অন্যের দুর্নীতি ও অপকর্মে সাধ্য ও সুযোগমতো নৈতিক কিংবা বৈধ বাধা সৃষ্টির চেষ্টা করি, তাহলে নেহাত নিষ্ক্রিয়তার গ্লানি, মূল্যবোধহীনতার লজ্জা এবং বিবেকের দংশন থেকে রেহাই পেতে পারি।

সংঘাত প্রসূন

ছোটবেলায় শুনতাম 'বিদেশী তাড়াও, সুখ আসবে'। বিদেশী বিতাড়িত হল, কিন্তু সুখ এল না। তারপরে শুনতাম 'বিধর্মী হঠাও' সুখ আসবে,'—দাঙ্গা-হত্যার মাধ্যমে তাও হয়েছিল আংশিকভাবে, কিন্তু সুখ এল না। শেষবার শুনলাম 'বিভাষী বিতাড়নে সুখ আসবে।' কিন্তু সুখ আসেনি, বরং যন্ত্রণা বেড়েছে নানাভাবে। ভাত-কাপড় ও নিরাপত্তার অভাব-প্রসূত যন্ত্রণাই মুখ্য। এ যন্ত্রণার মানস-উপশম নেই— কেননা, প্রবোধ পাবার আগেকার কারণগুলো অপগত। এখন যাঁদের শাসনে রয়েছি, তাঁরা আমাদের স্বদেশী স্বধর্মী-স্বজাতি আত্মীয়-বন্ধু ও ভাই। না পারি পর ভাবতে, না পারি গালি পাড়তে।

তা হলে শাসক বদলালেই সুখ আসে না। স্বজন হলেই স্বস্তি মেলে না। সুখের ভিত্তি ও স্বস্তির কারণ রয়েছে অন্যত্র। সেই ভিত্তি ও কারণ সম্পর্কে নানা জনের নানা মত। তবে সুখ-স্বস্তি-স্বাচ্ছন্দ্য সবার কাম্য এবং তা কালগত—এ ধারণা আজকাল কমবেশী প্রায় সবাই পোষণ করে। সত্য-ন্যায়-নীতি-আদর্শ এবং রীতি-পদ্ধতির চিরন্তনতা, অনপেক্ষতা কিংবা দেশান্তরে ও কালান্তরে ঐগুলোর অভিন্নতার তত্ত্ব আজ আর বিশেষ স্বীকৃত নয়। সমস্যা যে জীবনের নিত্যসঙ্গী এবং চলমানতার অনুষঙ্গী তাও আজ আর অস্বীকৃত নয়। নতুন কাল ও নতুন জীবন মাত্রই নতুন সমস্যার নামান্তর। স্ব-কালে মানুষ স্ব-সৃষ্ট সমস্যার মধ্যেই বাঁচে। এবং স্ব-স্বার্থে সমাধানপ্রয়াসই জীবনচেতনাপ্রসূত জীবন-ভাবনা ও জীবন-প্রেরণার তথা ভাব-চিন্তা ও কর্মের প্রসূতি। একাকীত্বের অভাব-অসহায়তা বিমোচনের জন্যে প্রাণী স্ব-শ্রেণীর সমাজ-সংলগ্ন এবং প্রাণিজগতে বিশেষ বিকাশের ফলে মানুষের সমাজ দায়িত্ব ও কর্তব্যবহুল, জটিল ও অনন্য। তাই প্রাণিজগতে মানুষের সমস্যা ও সমাধান বহু ও বিচিত্র এবং সদাবর্ধিষ্ণু। তার দেহ-মনের উৎকর্ষ তাকে করেছে কুশলী ও অপ্রাকৃত কৃত্রিম জীবন-পদ্ধতি রচনায় উদ্যোগী ও উৎসাহী। তারই ফলে স্ব-শ্রেণীর প্রাণীর মধ্যে তারা দ্বন্দ্বে-মিলনে,

প্রীতি অসূয়ায়, সদ্ভাবে-সংঘাতে অসামান্য। দানে-প্রতিদানে, লোভে-ত্যাগে, রাগে-বিরাগে, প্রীতি-ঘৃণায়, সহায়তায়-শত্রুতায়, উপকারে-অপকারে, আনুগত্যে-দ্রোহে, লাভে-ক্ষয়ে, সেবায়-বঞ্চনায়, আর কাড়াকাড়ি, মারামারি ও হানাহানিতে মানুষের ব্যক্তিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক জীবন-প্রবাহ আজকের এই স্তরে রূপ নিয়েছে - সবটাই হয়েছে আত্ম-কল্যাণে ও শ্রেয়সের সন্ধিৎসায়।

আশ্চর্য, মানুষের কোন পরিবর্তন কিংবা বিবর্তন আপোসে ও আপসে হয়নি। চিরকাল একটা আঘাত, সংঘাত, উপপ্লব কিংবা বিপ্লব প্রয়োজন হয়েছে। এবং তা ঘটেছে মড়ক-ঝঞ্ঝা-প্লাবন-ভূমিকম্প-অগ্ন্যুৎপাত কিংবা জরু-জমি ঘটিত সংঘাতে অথবা সামাজিক-নৈতিক-শাস্ত্রিক বিসংবাদে বা লোভ-অসূয়াবশে বস্তুচ্যুতির ফলে সংঘটিত সংঘর্ষ-সংগ্রাম-বিপ্লব-উপপ্লবের পরিণামে। আব্রাহাম-মুসা-গৌতম-মহাবীর-ঈসা-মুহম্মদের আমল থেকে আজ অবধি মানুষের যাবতীয় কল্যাণ ও অগ্রগতি ঐ দ্বন্দ্ব-সংঘাতপ্রসূত। সমস্যা ও যন্ত্রণা থেকেই জাগে মুক্তির প্রেরণা ও প্রয়াস। এ জন্যে সমস্যা ও যন্ত্রণা, সংঘর্ষ ও সংঘাত অভিশাপ নয়, অভিপ্রেত সুযোগ। কবির কথায়—

আমার এ ধূপ না পোড়ালে
গন্ধ কিছু নাহি ঢালে,
আমার এ দীপ না জ্বালালে
দেয় না কিছু আলো।

অতএব দুঃখ-বিপদ-সমস্যা, ক্ষয়-ক্ষতি-যন্ত্রণাই মানব-প্রগতির প্রসূতি। তাই কবি বলেন—'আঘাত সে যে পরশ তব, সেই তো পুরস্কার'।

এই পাপবিমোচনের জন্যে দুনিয়ার বহু বহু নবী-অবতার-দেবতা-সম্রাট ছিলেন লড়িয়ে,—রক্তক্ষরা সংগ্রামে নিরত। সে-যুদ্ধ ছিল হত্যার রূপকে সত্যাগ্রহ ও সত্যের উদ্বোধন। আব্রাহাম-মুসা-দাউদ-সোলায়মান-নূহ-লূৎ-হুদ-সালেহ-শোয়েব-ইন্দ্র-কালী-শিব-রাম-কৃষ্ণ প্রমুখের কৃতিত্বের অনেকখানি হচ্ছে প্রমূর্ত পাপরূপী নরদানব ও সমাজ বিনাশ-বিনষ্ট করা। সেই ধ্বংস দেখে কেবল নির্বোধই ভয় পেয়েছিল, পাপী-দানবই কেবল ত্রস্ত ও বিলুপ্ত হয়েছিল। প্রাজ্ঞরা জানত এ 'প্রলয় নতুন সৃজন-বেদন' এবং 'আসছে নবীন জীবনহারা অসুন্দরে করতে ছেদন।' যুগে যুগে ঝঞ্ঝা-প্লাবন-মড়ক-

দ্রোহ-বিপ্লব-উপপ্লব-সংঘাত-সংঘর্ষ ও রক্তস্নানের মাধ্যমেই জন্ম নেয় নতুন ভাব-চিন্তা, মন-মনন, সমাজ-শাস্ত্র-রাষ্ট্র, রীতি-নীতি-আদর্শ, বিজ্ঞান-দর্শন-ইতিহাস। জেগে উঠে নব-চেতনা, জন্ম নেয় নব মানবতা। মনুষ্য-সভ্যতা-সংস্কৃতি এবং মনুষ্যত্বের বিকাশ যেখানে যতটুকু হয়েছে, তা' হয়েছে এভাবেই।

য়ুরোপকেন্দ্রী আধুনিক দুনিয়ার ইতিহাস আমাদের এ ধারণাই সমর্থন করে। ইতিহাসের সাক্ষ্য থেকে পাই, নেদারল্যাণ্ডের মুক্তিসংগ্রাম, কৃষকবিদ্রোহ, Inquisition-এর বিরুদ্ধে Hues ও Luther-এর গণবিদ্রোহ তথা প্রোটেস্টান্ট মতবাদ, কপারনিকাস-গ্যালিলিও-র উচ্চারিত তথ্য, ফরাসী বিপ্লব, নেপোলিও'র দিগ্বিজয়, বিজ্ঞানবুদ্ধি, দার্শনিক তত্ত্ব, শিল্পবিপ্লব, মার্কসবাদ প্রভৃতি বহুতর সমাজ, শাস্ত্র, রাষ্ট্র, মনন, বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য প্রভৃতি সম্পর্কিত তত্ত্ব, তথা, আলোড়ন-আন্দোলন-সংঘাত-সংঘর্ষ-বিবর্তন-পরিবর্তনই য়ুরোপ-প্রসূত ও প্রভাবিত আধুনিক বিশ্ব তৈরী করেছে।

আঠারো শতক থেকে বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়া দার্শনিক চিন্তাকে প্রবল-ভাবে প্রভাবিত করছে। আস্তিক্য-নাস্তিক্য এবং সংশয়বাদী ও হিতবাদী দর্শন বিজ্ঞানের প্রগতির সঙ্গে মানসগতির যেমন সমতা রক্ষা করেছে, তেমনি কবি-সাহিত্যিকগণও মানব-মুক্তির দিশাসন্ধানী হয়েছেন। ভল্ট্যারার, গ্যেটে, ভিক্টর হুগো, টলষ্টয়, রোমারোঁলা, ডষ্টয়ভস্কী, এরিয়ারেমার্ক, টমাসম্যান প্রমুখ বহুতর মনীষী মানব-চিন্তায় যেমন প্রবুদ্ধ, তেমনি মার্কস-এঙ্গেলস্-লেনিন-মাও-চেগুয়েভারা প্রভৃতিও লোকায়ত জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য-বিধায়ক ও নতুন সমাজবাদের প্রয়োগ-প্রয়াসী সংগ্রামী। এই নতুন-পুরোনো বীর-মনীষীরা সবাই বিপ্লব-উপপ্লবের সন্তান। সবাই দেখা দিয়েছেন উপসর্গ হিসেবে এবং পরিণামে প্রতিভাত হয়েছেন আশীর্বাদরূপে।

এই শতাব্দীর পূর্ব সংঘাত-সংগ্রামের মাধ্যমে নির্জিত-শোষিত মানুষের সর্বপ্রকার মুক্তির আশ্বাস ও বাণী নিয়েই হয়েছে উদিত। তাই আত্মপ্রত্যয় ও মুক্তি-প্রত্যাশা চেতনাকে করেছে চঞ্চল, প্রয়াসকে করেছে প্রবল। প্রথম মহাযুদ্ধের রক্ত-সাগরে জন্ম নিয়েছিল League of Nations, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দান United Nations' Organisation, প্রথম মহাযুদ্ধের দান

মার্কসীয় তত্ত্বের বাস্তব ও সার্থক রূপায়ণ। আফ্রো-এশিয়া ও ল্যাটিন আমেরিকার নিজিত সমাজে নতুন চিন্তা-চেতনার সূচনা, বলকান রাষ্ট্রগুলোর উদ্ভব, আফ্রো এশিয়ায় ঔপনিবেশিক শাসনের নাগপাশ ছিন্ন করার স্পৃহার উন্মেষ, সোভিয়েত রাশিয়ার জন্ম ও যান্ত্রিক জীবনের বিকাশ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দান আফ্রো-এশিয়ার জাতিগুলোর স্বাধীনতা অর্জন, চীনে কম্যুনিজমের প্রতিষ্ঠা, বলকান রাষ্ট্রগুলোসহ রাশিয়া-প্রভাবিত অঞ্চলসমূহে সমাজতন্ত্রের প্রসার ও যন্ত্র-জীবনের বিস্তার এবং ক্রূর ঔপনিবেশিক বর্বরতা ও স্থূল সাম্রাজ্যবাদের অবসান, মার্কসবাদের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি ও পুঁজিবাদের প্রতি ঘৃণার প্রসার।

তৃতীয় মহাযুদ্ধ প্রয়োজন মানববাদের পূর্ণ স্বীকৃতির জন্যেই। ছলনাময় বর্বরতা ও বঞ্চনার কবল থেকে বিশ্বমানবকে উদ্ধারের জন্যেই তৃতীয় মহাযুদ্ধ আবশ্যিক। বৈনাশিক আঘাত-সংঘাতের বেদনা এবং ক্ষয়ক্ষতির অনুশোচনা ব্যতীত মনুষ্য-মন-মননের পরিবর্তন হয় না। তাই রক্তক্ষরা বেদনার প্রয়োজন, মর্মদাহী অনুশোচনা দরকার এবং দুটোই মেলে রক্তসাগরে ও জলন্ত লাভাস্রোতে। ইতিহাসের সাক্ষ্যে গুরুত্ব দিলে শান্তি-কপোতেরাও তা' স্বীকার করবেন। একদিন মধ্যএশিয়ার জনবহুলতার শিকার মানুষেরা নগ্ন তরবারিহাতে তুরঙ্গসোয়ার হয়ে বিজয়ীর বেশে চারদিককার পররাজ্যে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে আত্মরক্ষা ও আত্মবিস্তার করেছে। বলা চলে পররক্ত পান করেই তারা নিজেদের প্রাণরস সংগ্রহ করেছে। ষোল শতকের জন-বহুল য়ুরোপ নতুন নতুন ভূখণ্ড আবিষ্কার করে জন সংখ্যার বৃদ্ধি-প্রসূত সমস্যার সমাধান পেয়েছে। সেই বর্বরতার যুগ আর নেই যে, তেমনি বুনো পদ্ধতিতে আজকে মানবিক সমস্যার সমাধান মিলবে। আজ সমস্বার্থে, সহিষ্ণুতা ও সহাবস্থানের অঙ্গীকারে সহযোগিতার মাধ্যমেই মানুষকে বাঁচতে হবে—'নহিলে নাহিরে পরিত্রাণ।' নীতিকথায়, তত্ত্বচিন্তায়, প্রীতি-মৈত্রী-করুণার আবেদনে সাড়া দিয়ে কেউ যে মানবকল্যাণে ক্ষতি স্বীকারে রাজী হবে, তেমন প্রত্যাশা সাধারণত বিড়ম্বিত হয়। আমাদের ধারণা, আজকের এশিয়ার অপ্রতিরোধ্য জনসংখ্যা-বৃদ্ধিপ্রসূত অসমাধ্য সমস্যার প্রতিকার রয়েছে তৃতীয় মহাযুদ্ধোত্তর সম্ভাব্য তীব্র-তীক্ষ্ণ মানববাদী-চেতনায়। যে-চেতনা বিস্তৃত

ভুবনে আনুপাতিক হারে জনবিন্যাসে ও খাদ্য বন্টনে আপত্তি তুলবে না, জাত-জন্ম-বর্ণ-ধর্মের দ্বিধা-বাধা অতিক্রম করে মানুষকে কেবল মানুষ হিসাবেই গ্রহণ করতে প্রবর্তনা দেবে! বাঁচার গরজই আমাদের এই স্বপ্নকে বাস্তব, এই সাধকে সাধ্যায়ত্ত করতেই হবে। অন্তত বাঁচার শেষ-প্রয়াস এ পথেই চালিত করতে হবে। সর্বপ্রকার তাৎপর্যেই জীবন মানে চলমানতা এবং পাথেয় সন্ধানের ও সঞ্চয়ের সংগ্রাম। কে না জানে, জীবন জয়ীরই ভোগ্য এবং জিতের পরিণাম মৃত্যু! জীবনের জন্যেই জয় প্রয়োজন। তাই প্রাণী মাত্রই জিগীষু! আমরাও প্রত্যাশা নিয়ে বাঁচব। শতাব্দীর সূর্য আমাদের সে-প্রত্যাশাই জাগায়।

জনবৃদ্ধিঃ বিশ্বের আতঙ্ক

জনসংখ্যা আজো গণনাতীত না হলেও এর দ্রুতবৃদ্ধি বিশ্ব-সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছে। অবশ্য বৃদ্ধির হার সর্বত্র সমান নয়। প্রাকৃতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও আর্থনীতিক মান ও অবস্থান অনুসারে আনুপাতিক তারতম্য রয়েছে। তাই এ সমস্যা এখনো আঞ্চলিক, দৈশিক বা রাষ্ট্রিক সীমা অতিক্রম করে বিশ্বমানবিক সমস্যা হিসেবে গুরুতর হয়ে ওঠেনি। সেজন্যেই এ সমস্যা আলোচনার বিষয় হলেও আন্তরিক উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়ায় নি। ফলে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্যে জন্মনিরোধ প্রয়াসাদি আজো রাষ্ট্রসমূহের ঘরোয়া প্রচেষ্টায় সীমিত। সে প্রচেষ্টাও আবেদন-নিবেদন-উপদেশের পর্যায়ে রয়ে গেছে—বিধিনিষেধের আওতা-ভুক্ত হয়নি। কাজেই এখনো কোথাও গাণিতিক হারে, কোথাও জ্যামিতিক হারে জনসংখ্যা বেড়েই চলেছে।

আগেও মানুষের প্রজননশক্তি এমনিই ছিল। কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার এতো উচ্চ ছিল না। কারণ প্রসূতি ও সন্তান বাঁচানো দুষ্কর ছিল। মানুষের অজ্ঞতা ছিল তখন প্রায় পর্বতপ্রমাণ। অজ্ঞতার সমুদ্র-বেষ্টিত হয়ে মানুষ জ্ঞানের ক্ষুদ্রদ্বীপে নিবদ্ধ ছিল। প্রকৃতি তখনও বশীভূত হয়নি। সর্বপ্রকার প্রতিকূল পরিবেশে মানুষ প্রকৃতির দয়ার উপর আত্মসমর্পণ করে ভয়-ত্রাস-আশার মধ্যে বাঁচত। রোগ ছিল, কিন্তু রোগের প্রতিষেধক জানা ছিল না। আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক শক্তি নির্ভরতায় তারা দ্বিধা-শঙ্কা-আশ্বাসের এক মিশ্র অনুভূতিতে অতিপ্রাকৃত প্রবোধ খুঁজত। তুকতাক, দারুটোনা, ঝাড়ফুক, উচাটন কিংবা দোয়া-মন্ত্রের তাবিজ কবজ-মাদুলী অথবা স্থূল দ্রব্যগুণ-নির্ভর চিকিৎসাই ছিল রোগে বিপদে তাদের অবলম্বন। সব রোগ ও রোগের কারণ জানা ছিল না। সব রোগই প্রায় দেবতা উপদেবতা ও অপদেবতার কুদৃষ্টি ও ক্রোধের প্রভাব বলেই মনে করা হত। তাই পূজা-শিনি-প্রার্থনার মাধ্যমে দেবতার তুষ্টিসাধনের চেষ্টাই ছিল মুখ্য,

চিকিৎসা ছিল গৌণ। আজো অনুন্নত দেশের অশিক্ষিত মানুষেরা কলেরা-বসন্ত প্লেগ প্রভৃতিকে অপদেবতার প্রকোপ-প্রসূত বলেই জানে। মহামারী মাত্রেই ক্ষুব্ধ ও দুষ্ট দেবতার প্রতিহিংসাপরায়ণতা বলেই তাদের ধারণা। কাজেই তাদের কাছে বাঁচাটা দৈবানুগ্রহ এবং মরাটা দৈবনিগ্রহ।

একবার মহামারী লাগলে গাঁ উজাড় হয়ে যেত। সমসংখ্যক মানুষ সৃষ্টি করতে আবার বিশ ত্রিশ বছর লেগে যেত। অবশ্য মধ্যে আবার কলেরা-বসন্ত-প্লেগের প্রাদুর্ভাব দেখা না দিলে তবে তা সম্ভব হত। কিন্তু এমন সৌভাগ্য তাদের জীবনে কচিৎ দেখা গেছে। একারণেই পৃথিবীর আদিম গোত্রগুলোর অধিকাংশই লোপ পেয়েছে। আজো অস্ট্রেলিয়া নিউজিল্যাণ্ড আমেরিকার আদিম পদ্ধতির জীবনযাত্রী আদি-বাসীরা লোপ পাচ্ছে।

আবার আগেকার কাড়াকাড়ির যুগে দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও হানাহানি প্রায় প্রাত্যহিক ঘটনাই ছিল। গোত্রীয় দ্বন্দ্ব-লড়াই ছাড়াও ব্যক্তিক বিবাদও হানাহানিতে পরিণতি পেত। তাতেও মরত অনেক মানুষ। তাছাড়া অনাহারক্লিষ্ট ও রোগজীর্ণ দরিদ্র ঘরে আজো মৃত্যুর হার অধিক। আজো অশিক্ষিত দরিদ্র ঘরে যত শিশু জন্মায় তার অর্ধেক বা এক-তৃতীয়াংশই বেঁচে থাকে। ত্রিশ-চল্লিশ বছর আগেও ম্যালেরিয়া-কালাজ্বর-প্লীহা-যক্ষ্মা-সূতিকা কলেরা-বসন্তে লক্ষ লক্ষ লোক আমাদের দেশেও মারা যেত।

১৭৭০-এর দশকে রাজস্ব নিরূপণের প্রয়োজনে ওয়ারেন হেস্টিংস-এর নির্দেশে চট্টগ্রাম শহরের চারদিকের চারটে গাঁয়ের মানুষের চারবছরের জন্ম-মৃত্যুর হার নিয়ে দেখা গেছে, কোন গাঁয়ে পাঁচ-দশ জন বেড়েছে, এবং কোন গাঁয়ে কমেছে, এবং গড়ে প্রায় স্থিরই ছিল।

আজকাল যক্ষ্মা-বহুমূত্র-ক্যানসার-আলসার-মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণ-হৃৎরোগ প্রভৃতি মারাত্মক ব্যাধিরও প্রতিষেধক আবিষ্কৃত হয়েছে। ফলে অকালে মৃত্যুর পথ প্রায় রুদ্ধ হয়ে গেছে। আগে বাঁচাই ছিল দুঃসাধ্য দৈব ব্যাপার, এখন মরাটাই হচ্ছে দুর্ঘটনা। বস্তুত দুর্যোগ-দুর্ঘটনা এবং যুদ্ধ ছাড়া এযুগে অকালে মৃত্যুর এলাকায় পৌঁছা প্রায় অসম্ভব। তাই

পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র চক্রবৃদ্ধি হারে বা জ্যামিতিক হারে জনসংখ্যা বাড়ছে। একশতকের মধ্যেই কোথাও কোথাও জনসংখ্যা দ্বিগুণ-আড়াই গুণ করে বৃদ্ধি পাচ্ছে। অতএব সমস্যা ভয়ঙ্করভাবে গুরুতর।

আদিকালেও সভ্যতর সমাজে অর্থাৎ জীবন-জীবিকা-পদ্ধতি যাদের উন্নততর ছিল এবং টোট্‌কা চিকিৎসাবিদ্যা যাদের আয়ত্তে এসেছিল, সেই উন্নত সমাজে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল। সেদিন তাদেরও সামনে তা সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছিল। সেদিনও অজ্ঞ মানুষের পক্ষে তার সমাধান সহজ ছিল না। তখন অবশ্য বিস্তৃত ভুবন ফাঁকা পড়েছিল, কিন্তু যানবাহন ও হাতিয়ারের অভাবে অপটু মানুষের পক্ষে তখনও তা দুর্গম-দুর্লঙ্ঘ্য। তাছাড়া সেদিনও মানুষ স্বার্থপর ও ঈর্ষাপরায়ণ ছিল। কাজেই সেদিনও বিরুদ্ধ পক্ষের সঙ্গে সংগ্রাম করে করে অগ্রসর হতে হয়েছে। মানুষের আত্মবিস্তারের ক্ষেত্রে গোত্রীয় সংগ্রামের যুগ দীর্ঘস্থায়ী ছিল। সেই প্রাকৃতিক 'যোগ্যতমের উদ্বর্তন' নীতি অনুযায়ী প্রবল শক্তি দুর্বলকে উচ্ছেদ করে আত্মপ্রতিষ্ঠা ও আত্মবিস্তার করত।

তবু যতই দুর্গম-দুর্লঙ্ঘ্য হোক, বেঁচে থাকার গরজে জীবনের চাহিদা পূরণের জন্যেই মানুষকে সেদিনও মরিয়া হয়ে এগিয়ে যেতে হত। তাই দেখতে পাই, ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে যখন জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেল, তখন তারা আফ্রিকার উত্তর উপকূলে, ভারতে ও অন্যান্য অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছিল। এমনকি সুদূর অস্ট্রেলিয়া অবধি বিপদসঙ্কুল পাড়ি জমিয়েছিল। আবার এমনি সমস্যার সমাধানমানসে মধ্যএশিয়ার আর্যরা এশিয়া-য়ুরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে এবং মঙ্গোলীয়রা পূর্ব-দক্ষিণ এশিয়ার ফিলিপাইন অবধি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। ঐতিহাসিক যুগেও আমরা মধ্যএশিয়ার শক-হূন-ইউচি-কুশানদের প্রবল পরাক্রমে চারদিকে বেরিয়ে পড়তে দেখেছি। যখন জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে কিংবা অনাবৃষ্টির জন্যে খাদ্য ও চারণভূমির অভাব দেখা দিয়েছে, তখনই প্রাণের দায়ে বাঁচবার তাগিদে তারা আরবে, ইরানে, ভারতে, চীনে, রাশিয়ায় ও বলকান অঞ্চলে পরাক্রান্ত শক্তি রূপে বিজয়ীবেশে প্রবেশ করে আত্মরক্ষা ও আত্মপ্রতিষ্ঠা করেছে। এই সেদিনও তুর্কী-মুঘলের দাপটে এশিয়া বারবার প্রকম্পিত হয়েছে—বিধ্বস্ত হয়েছে কত নগর জনপদ। এটিলা, চেঙ্গিস, হালাকু,

কুবলাই, তৈমুর তাদের প্রাণের পোষক বলেই তাদের জাতীয় বীর। তারা জানত সামনেই তাদের জীবনের আশ্বাস, পশ্চাতে মৃত্যুর বিভীষিকা। তাই তাদের তুরঙ্গগতি ছিল অপ্রতিরোধ্য, বিজয়ীর গৌরবই ছিল তাদের প্রাপ্য; পরাজয়ের কলঙ্ক তাদের ললাটে কখনো লিখিত হয়নি। এরাই বুঝি কুরআনের এয়াজুজ-মাজুজ! এদের ভয়ে নির্মিত চীন-ককেসাসের দুর্ভেদ্য প্রাচীরও কখনো রোধ করতে পারেনি এদের অগ্রগতি।

পনেরো-ষোল শতকের য়ুরোপে এমনি জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও দারিদ্র্যই মানুষকে নীল সমুদ্রে পাড়ি দেয়ার প্রেরণা যুগিয়েছিল। পনেরো শতকের শেষ দশক থেকে উনিশ শতক অবধি নতুন ভুবন সন্ধানে অভিযাত্রীদের অবচেতন প্রেরণার উৎসই ছিল এই বাঁচা ও স্বজনকে বাঁচাবার তাগিদ। আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড ও আফ্রিকার দুর্গম জঙ্গল আবিষ্কৃত হওয়া সত্ত্বেও তাদের ক্ষুধা মেটেনি। তারপরেও য়ুরোপবাসীরা দুর্ধর্ষ শক-হুন-মোঙ্গলদের মতোই দুনিয়ায় দু'দুটো প্রলয়কাণ্ড ঘটিয়েছে। তারা রাহুর মতই এশিয়া-আফ্রিকা গ্রাস করেছিল, আর জোঁকের মতো করেছে শোষণ। নতুন ভুবনে প্রাপ্ত ঐশ্বর্যে গত পাঁচশ' বছর ধরে য়ুরোপ ধনে-মানে প্রতাপে-প্রভাবে-পৃথিবীর সেরা হয়ে রয়েছে। শ্বেতাঙ্গ রাষ্ট্রে অবাধ প্রবেশাধিকার আছে বলে এবং দু'দুটো মহাযুদ্ধ ঘটে গেল বলে য়ুরোপে লোকবৃদ্ধি আজো বিশেষ সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়নি। কাজেই লোকবৃদ্ধির এ সমস্যা বিশেষভাবে এশিয়ার।

কুরআনে আল্লাহ্ বলেছেন: আকাশ ও পৃথিবীর সব ব্যক্ত ও গুপ্ত সম্পদ আমি মানুষকে তার ভোগের জন্যে দিয়েছি। বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়াই এই গুপ্ত সম্পদ। ফলে আমাদের যে যন্ত্রনির্ভর জীবন চালু হয়েছে— তার বিকাশ-সম্ভাবনা কল্পনাতীতরূপে অপরিসীম। বিজ্ঞানবুদ্ধি ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপ্রয়োগে মানুষের খোর-পোষের ক্রমবর্ধমান সমস্যার সমাধান করা হয়তো সম্ভব। যেমন বাসস্থানের সংস্থান হতে পারে স্কাই-স্ক্রেপার তৈরী করে, খাদ্যসমস্যার সমাধান হতে পারে বিভিন্ন প্রকারের খাদ্য-বস্তুর সৃষ্টিতে। সে-চেষ্টা বিজ্ঞানীরা চালিয়ে যাচ্ছেন। তবু তা সময়, সাধনা ও ব্যয়সাপেক্ষ। তাছাড়া গণমানবের মানসবিকাশের সাথে সাথে তার প্রয়োজন, বুদ্ধি ও চাহিদা বাড়ছে, সে আর এখন কেবল উদরসর্বস্ব নয়। তাই উদর-পূর্তিতেই তার সমস্যা মিটে না। তার

স্বাচ্ছন্দ্য-চেতনা ও রুচি তার প্রয়োজনীয় সামগ্রীর তালিকা বৃদ্ধি করছে, এবং তা লোকবৃদ্ধি সমস্যাকে জটিল ও গুরুতর করে তুলছে।

স্বতন্ত্রভাবে আজকাল প্রায় প্রতি রাষ্ট্রই প্রতিকার-পন্থা উদ্ভাবনে তৎপর। জন্মনিরোধের মাধ্যমে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ তার মধ্যে প্রধান। কৃষিজাত ও শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি প্রভৃতিও এ প্রচেষ্টার অন্তর্গত। কিন্তু আজকের সংহত পৃথিবীতে স্বতন্ত্র ও খণ্ড প্রয়াসে এ সমস্যার সমাধান সম্ভব বলে মনে হয় না। বিশ্বব্যাপী যৌথ প্রয়াসে এর অন্তত আপাত সুব্যবস্থা সম্ভব। আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, একে দৈশিক বা রাষ্ট্রিক সমস্যা হিসেবে অবহেলা করা যাবে না। এটিকে বিশ্বের গুরুতর মানবিক সমস্যা রূপে প্রত্যক্ষ করতে হবে। শুনেছি জাপানে জন্মহার স্বল্প। কিন্তু ভারতে ব্রাজিলে বিপুল। এতে সামগ্রিকভাবে সমস্যার কোন হ্রাসবৃদ্ধি হয় না। এবং মানুষের প্রতি প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য রয়েছে,—মানুষকে ভালবেসে তার দুঃখ-অভাব মোচন করতে হবে—এই নীতিবাক্য উচ্চারণেও সমস্যার সমাধান হবে না। কেননা মানুষ স্বভাবতই স্বার্থপর। কিছুটা বৈধ-বাধ্যবাধকতার ব্যবস্থা না হলে মানবিক সমস্যার সমাধান অসম্ভব।

আমাদের ধারণায় পৃথিবী অন্তত আরো এক শতাব্দী কাল অনিয়ন্ত্রিত মানুষের ভরণপোষণে সমর্থ। কেননা আমেরিকা, আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ডে এখনো অনাবাদী ফাঁকা জায়গা পড়ে রয়েছে। তাছাড়া মানুষের বিজ্ঞান-বুদ্ধি ও উদ্ভাবন-শক্তিতে আমরা আস্থাবান। কিন্তু রাষ্ট্র সমূহের সংবুদ্ধি ও বিশ্বমানবের সামগ্রিক কল্যাণচিন্তা ব্যতীত লোকবৃদ্ধিজাত সমস্যার সমাধান-প্রয়াস ফলপ্রসূ হবে না, এবং দ্বন্দ্ব-সংঘাত বৃদ্ধি পাবে। কেননা অভাব থেকেই বিবাদের উৎপত্তি। ঘরে-সংসারে দেখা যায় পরিবারের পোষ্য সংখ্যার অনুপাতে আয় না থাকলেই অশান্তি ও কোন্দল শুরু হয়। রাষ্ট্রিক জীবনেও তাই ঘটে। লোকবৃদ্ধির সাথে সাথে লোকের প্রয়োজন পূরণের আয়োজনে সমতা রক্ষা করতে না পারলে বিদ্রোহ-বিপ্লব-আন্দোলন দেখা দেয়। এগুলো তো অভাব-বোধ ও দারিদ্র্য-যন্ত্রণার অবশ্যম্ভাবী প্রসূন। কম্যুনিজম, সোস্যালিজম, ঔপনিবেশিকতা প্রভৃতি তো এই অভাব ও দারিদ্র্যের সন্তান। অর্থাৎ

জনগণের অভাব ঘুচানোর উপায়রূপে এ-সব মতবাদ উদ্ভাবিত। আজ সাম্রাজ্যবাদ সামন্তবাদ লুপ্ত-প্রায় এবং পুঁজিবাদ হয়েছে ঘৃণ্য। রাষ্ট্রসঙ্ঘের মাধ্যমে যদি দুটো ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়, তা হলে এক শতাব্দীর জন্যে এ সমস্যার সমাধান সম্ভব। এক, পৃথিবীব্যাপী আনুপাতিক সমতায় লোক ও খাদ্য বণ্টন (equitable distribution of population and food), আর দেশরক্ষার প্রয়োজনে অনুৎপাদক (unproductive) অস্ত্র নির্মাণ-ক্রয় ও সৈন্যবাহিনীর বিলোপসাধন। রাষ্ট্রসঙ্ঘই সারা দুনিয়ার রাষ্ট্রগুলোর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে পারে আন্তর্জাতিক ভিত্তিতে গঠিত একটি সৈন্যবাহিনীর দায়িত্ব নিয়ে।

জানি, আমাদের এ চিন্তা বিষয়ী লোকের উপহাসের বস্তু। তবু কি একান্তই দিবাস্বপ্ন—নিতান্তই আকাশকুসুম !

একুশের ভাবনা

দুটো বহুলপ্রচলিত জনপ্রিয় আপ্তবাক্যের পুনর্বিবেচনা দরকার এবং লোকশ্রুত আস্থার দুর্গে আঘাত হানার জন্যে জরুরী। এর একটি হচ্ছে 'ঐতিহ্য প্রেরণার উৎস' এবং অপরটি হচ্ছে 'ইতিহাস পুনরাবৃত্ত হয়।'

ঐতিহ্য যদি প্রেরণা যোগাত তা হলে গ্রীস-রোম-ব্যাবিলন-মিশর-ইরানের কখনো পতন হত না, কিংবা ঐতিহ্যবিরহী কোন নতুন দেশ-জাত-পরিবারের নবোত্থান সম্ভব হত না। ব্যক্তি-পরিবার-দেশ জাত বর্ণ কারো সম্পর্কেই উক্ত আপ্তবাক্য কখনো সাধারণভাবেও সত্য হয়নি। জীবন-জীবিকার তাগিদেই জ্ঞান-বুদ্ধি-উদ্যম-রুচি-আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতির সুপ্রয়োগ-বাঞ্ছাই মানুষকে জিগীষু করে। এবং সেই জিগীষাজাত নিষ্ঠা ও কর্মোদ্যমই এমন এক অমোঘ সামর্থ্য দান করে যা অদম্য, অজেয় এবং উদ্দিষ্ট ফলপ্রসূ। এ যখন যে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, দেশ ও জাতের মধ্যে জাগে, তখন জীবন-জীবিকার বিভিন্ন ক্ষেত্রে উদ্ভাবনে-আবিষ্কারে, ভাবে চিন্তায় কর্মে তার বিচিত্র বিকাশ বিস্তার সম্ভব হয় এবং তা-ই প্রত্যাশিত ও স্বাভাবিক বলে সবাই মানে।

ইতিহাসও প্রেরণার উৎস নয় এবং ইতিহাস কখনো পুনরাবৃত্ত হয় না, হয়নি। ঘটনা ও পরিণামের পুনরাবৃত্তি ঘটানোর জন্যে নয়, বরং তা এড়াবার জন্যেই ইতিহাসের শিক্ষা তথা ইতিহাস-চেতনা প্রয়োজন। ইতিহাস রচনার ও পাঠের সার্থকতা এখানেই। এই তাৎপর্যেই ইতিহাস প্রজ্ঞার আকর। ইতিহাস-চেতনা জীবন, ঘটনা, ও পরিণামের আবর্তন কামনা করে না, বিবর্তন ও অগ্রগতিই বাঞ্ছা করে। মানুষের প্রবৃত্তিগত ও জীবিকাগত দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মূলানুসন্ধিৎসা এবং মনুষ্যস্বভাবের সংযমন ও উৎকর্ষসাধনের উপায় উদ্ভাবন লক্ষ্যেই ইতিহাস রচন-পঠনের সার্থকতা। ব্যক্তিক, পারিবারিক, সামাজিক, দৈশিক, রাষ্ট্রিক, কিংবা জাতিক জীবনে ঐতিহ্য কোন্‌টি? অতীতের

সব কর্মপ্রচেষ্টাই ঐতিহ্য নয়। কেবল সাফল্যের, সম্মানের, গৌরবের ও গর্বের অংশটুকুই ঐতিহ্য। এর মধ্যেই রয়েছে আত্মপ্রবঞ্চনার ও আত্মদর্শন-ভীতির বীজ। জীবনের লজ্জার অংশ গোপন রেখে গৌরবের অংশ উচ্চকণ্ঠে প্রচারকে আমরা স্বাভাবিক বলেই জানি ও মানি বটে; কিন্তু এর মধ্যে চারিত্রিক দৌর্বল্য ও সামান্যতা আছে। এ ফাঁকিতে ফাঁক পূরণ হয় না। তাই সাধারণত ঐতিহ্যগর্বের রোমন্থন পরিণামে দুর্বলতার, নিষ্ক্রিয়তার ও ক্ষয়িষ্ণুতার পরিচায়ক হয়ে দাঁড়ায়। পিতৃধনের ক্ষয় আছে, বৃদ্ধি নেই। পিতৃগৌরবেরও তেমনি জীর্ণতা থাকে, অনুপ্রাণিত করবার শক্তি থাকে না। কারণ অনবরত পুনরাবৃত্ত হয়ে তা প্রভাবিত করার শক্তি হারায়। তাই তা দুর্বল, অসমর্থ ও অলস উত্তর-পুরুষের নিষ্ফল দাম্ভিকতার অবলম্বনরূপে, আত্মসম্মান রক্ষার হাস্যকর ভিতরূপে ব্যবহৃত হয়। ঐতিহ্যকে প্রেরণার আকর হিসেবে ঔজ্জ্বল্য ও গুরুত্ব দেয়ার জন্যে ইতিহাস-গ্রন্থ রচনা করতে যেয়ে মানুষ কেবল আত্মস্বার্থে ও স্বপ্রয়োজনে তথ্যের বিকৃতি ঘটিয়েছে আর কামনা করেছে ঘটনার ও পরিণামের পুনরাবৃত্তি। কিন্তু তাদের সে বাঞ্ছা কোনদিন সিদ্ধ হয়নি। হবার নয় বলেই হয়নি।

২১শে ফেব্রুয়ারী ছিল বিদেশী-বিভাষী শোষক-শাসকের প্রতি আমাদের ঘৃণা ও ক্ষোভ প্রকাশের, আত্মবোধন ও স্বজনের সংহতি কামনার দিন। আজ পরিবর্তিত পরিবেশে ২১শে ফেব্রুয়ারী আমাদের কার বিরুদ্ধে উত্তেজনা দেবে? কোন্ সংগ্রামে প্রবর্তনা দেবে? বৃটিশ আমলে পলাশীযুদ্ধ আমাদের দেশপ্রেম ও সংগ্রামী চেতনার উৎস ছিল। আজ পলাশীযুদ্ধ ইতিহাসের অসংখ্য যুদ্ধের একটিমাত্র। পরিবারে, সমাজে, রাষ্ট্রে বিপর্যয় সৃষ্টিকারী সাড়ে তেরোশ' বছর আগেকার কারবালাযুদ্ধ আজ মুসলমানদের কাছে একটা বার্ষিক পর্ব ও তাৎপর্যহীন আচার মাত্র।

জীবন বর্তমানেরই নামান্তর। কেননা জীবনের সব চাহিদাই সাময়িক। ব্যক্তি মানুষেরও শৈশব-বাল্য-কৈশোর-যৌবন-বার্ধক্যের চাহিদা অভিন্ন থাকে না। অতীত মাত্রই উপযোগ হারায়, আর ভবিষ্যৎ জাগায় প্রত্যাশা। অতীতকে পিছে ফেলে ভবিষ্যতে প্রত্যাশা রেখে

বর্তমানের প্রতিবেশে শারীর ও মানস বাঁচাই হচ্ছে জীবন। অতীতকে ধরে রাখা মানেই হচ্ছে বর্তমানকে অবহেলা করা ও ভবিষ্যৎকে অস্বীকার করা। যে পিছনে তাকায় সে সুমুখ-দৃষ্টি হারায়। পিছু তাকাতে হলে দাঁড়াতে হয়, দেহ ফিরাতে হয়, সুমুখগতি স্তব্ধ হয়।

'২১শে ফেব্রুয়ারী পর্ব' উদ্‌যাপনে আমাদের আগ্রহ-উৎসাহ যত প্রবল থাকবে, সে পরিমাণেই আমাদের মানস বন্ধ্যাত্ব, উদ্যমহীনতা ও আকাঙ্ক্ষাহীনতা প্রকট হয়ে উঠবে। একে মুহররমের মতো এবং শহীদ মিনারকে ইমাম-বারার মতো করে তোলার মধ্যে নতুন চিন্তা চেতনা ও কর্ম-পরিকল্পনার অভাবই পরিলক্ষিত হবে। ইতিমধ্যেই অবশ্য শহীদ মিনারের গুরুত্ব কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। বাহান্নের চেয়ে একাত্তরের শহীদরা সরকারী সম্মানের বেশী দাবিদার বলে স্বীকৃত হয়েছে। এ-ই নিয়ম ও স্বাভাবিক। বেদনাদায়ক হলেও এ সত্য আমাদের উপলব্ধি করতে হবে যে, ২১শে ফেব্রুয়ারী চিরকাল এমনি উৎসাহে উদ্‌যাপন করবার মতো মন সঙ্গত কারণেই থাকবে না। প্রবহমান জীবনে আরো দ্বন্দ্ব-সংঘাত-সংঘর্ষের হাজারো সামাজিক, আর্থিক, রাষ্ট্রিক, আন্তর্জাতিক কারণ ঘটবে। তাই নিয়ে আমরা বিচলিত, ক্ষুব্ধ, মত্ত ও সংগ্রামরত থাকব। চলমান জীবনে নিত্য নতুন পথের বাধা অতিক্রম করে করে এগুতে হয়—পাথেয় সংগ্রহ করতে হয়। এজন্যে ভাব ভাবনার প্রয়োজন হয়। জীবন জীবিকার সামগ্রিক বিকাশ বিস্তার এভাবেই হয় সম্ভব। গতিই জীবন, স্থিতি জড়তা ও জীর্ণতার শিকার। তাই জীবনেরই তাগিদে প্রত্যাশা নিয়ে নতুন কিছু আগে ভাবার, আগে বলার, আগে করার লোক দরকার। সে-লোক আসে বুদ্ধিজীবী শ্রেণী থেকেই। তারা হুজুগের দাস নয়, নতুন হুজুগের স্রষ্টা। ঐতিহ্য ও ইতিহাস তাদের কাছে উৎসব-পার্বণের বিষয় নয়, প্রজ্ঞাদৃষ্টিলাভের সহায়ক মাত্র।

এ দৃষ্টিলাভের জন্যে অতীতের লজ্জা গৌরব দুটোই সমগুরুত্বপূর্ণ। মানুষকে হিতবাদী ও হিতকামী করতে হলে ভাল-মন্দ, লজ্জা-গৌরব দুটোই স্মরণ করিয়ে দিতে হয়। সত্তা ও সংবৃদ্ধি এভাবেই লভ্য। আত্মপ্রত্যয় আসে নিজের শক্তি ও দুর্বলতার সমন্বিত পরিমাপ-চেতনা থেকেই। তাহলেই সতর্ক প্রয়াসে অভীষ্টসিদ্ধি সম্ভব।

বুদ্ধিজীবীর বন্ধ্যা নেতৃত্বই মানুষকে কেবল ভাব-চিন্তা-কর্ম ও পার্বণের আবর্তনে তৃপ্ত রাখে। বন্ধ্যাত্বের সাধারণ নাম রক্ষণশীলতা। সৃষ্টিশীল উদ্ভাবনী নেতৃত্ব নতুন ভাব-চিন্তা-কর্মে দীক্ষা ও দিশা দেয়। প্রচারণার মাধ্যমে ২১শে ফেব্রুয়ারীর পার্বণিক পালনে উৎসাহ-উদ্দীপনা দানের ফলে যে কৃত্রিম দায়িত্ব-চেতনা লোকমনে সঞ্চার করা হয়, তা কোন শ্রেয়সে উত্তরণ ঘটায় না। বরং স্বতঃস্ফূর্তভাবে যারা যতটুকুই এই দিনটি স্মরণ করে, ততটুকুই খাঁটি এবং ব্যক্তিক বা সামাজিক জীবনে আত্ম-বোধনের ও হিত-চেতনার সহায়ক। প্রবহমান জীবনে নিত্যনতুন চলার পথে সমস্যা ও যন্ত্রণা এড়িয়ে কেবল সম্পদ ও আনন্দ আহরণ করা যায় না। বস্তুত সমস্যা আছে বলেই সম্পদের প্রয়োজন, যন্ত্রণা-মুক্তির জন্যেই আনন্দের আয়োজন। জ্ঞানী-গুণী-প্রাজ্ঞ মনীষী বুদ্ধিজীবীদের দায়িত্ব ও কর্তব্য হচ্ছে বর্তমান ও সম্ভাব্য ব্যক্তিক, নৈতিক, আর্থিক, সামাজিক, রাষ্ট্রিক ও আন্তর্জাতিক সম্পদ ও সমস্যা, আনন্দ ও যন্ত্রণা সম্পর্কে সতর্ক সচেতন করে দেয়া, দায়িত্ব ও কর্তব্যবুদ্ধি জাগিয়ে তোলা, শোষণ-পেষণ-পীড়ন-প্রবঞ্চনার বিরুদ্ধে সংগ্রামী প্রেরণা দেয়া, শ্রেয়ঃবোধ জাগিয়ে, হিতচেতনা দিয়ে পাপ ও পীড়ন থেকে মানুষকে মুক্ত রাখার চেষ্টা করা। পুরাতনের রোমন্থনে এ কখনো সম্ভব নয়, কেবল নব নব উদ্ভাবনে ও আবিষ্কারেই সম্ভব। সমকালীন প্রতিবেশে প্রয়োজনানুগ সম্পদ সৃষ্টির ও সমস্যা বিনাশের, আনন্দবৃদ্ধির ও যন্ত্রণামুক্তির উপযোগী নতুন ভাব-চিন্তা-কর্ম ও বিবেক সৃষ্টিই বুদ্ধিজীবীর দায়িত্ব। এভাবেই গণমনে প্রত্যাশা ও উদ্যম জাগে—তখন প্রাণে জাগে প্রেম, চিত্ত হয় হেম, দিল হয় দরিয়া, প্রিয়া হয় পৃথিবী, জীবন হয় ঐশ্বর্য।

কিন্তু জ্ঞানী যদি গুণী না হয়, বুদ্ধিমান যদি ধূর্ত হয়, জ্ঞান যদি প্রজ্ঞায় পরিণতি না পায়, বুদ্ধিজীবী যদি সমাজের বিবেকের দায়িত্ব ও দেশের মঙ্গলের প্রতিরক্ষীর ভূমিকা পালন না করে, তা হলে বাক্‌বিস্তার বাচালতায়, কর্মপ্রচেষ্টা ব্যক্তিক ও দলীয় স্বার্থপরতায় বিকৃতি পায়। বুদ্ধিজীবীর পরিচয় তার চিন্তা-কর্মের অনন্যতায়, নতুনত্বে ও শ্রেয়স্করতায়। ফেব্রুয়ারী বুদ্ধিজীবীতে অভাবিত। যদি নতুন কিছু ভাবা কিংবা করা সম্ভব না-ই হয়, তাহলে অন্তত ২১শে ফেব্রুয়ারীকে

আজকের এই মুহূর্তের চলতি শোষণ-পীড়ন, অন্যায়-অশুভ, অভাব-আপদের প্রতিকার, প্রতিরোধ, প্রতিবাদ বা প্রতিশোধ দিবসরূপে উদ্‌যাপন করাই বাঞ্ছনীয়।

কবি বিহারীলাল

প্রতীচ্য-প্রভাবিত আধুনিক সাহিত্যে গীতিকবিতা একটি প্রধান শাখা। রবীন্দ্রনাথের আগে যাঁরা ইংরেজীর আদলে গীতিকবিতা রচনা করেছিলেন তাঁদের কারো রচনায় গীতিকবিতার প্রাণপ্রতিষ্ঠা পায়নি। ঐসব কবিতায় অনুকৃতি ছিল, অনুস্মৃতি ছিল, কিন্তু কাম্য আমেজটি ছিল না। মধুসূদন, হেমচন্দ্র কিংবা নবীনসেন অনেক কবিতাই লিখেছেন, কিন্তু মেজাজে তাঁরা যেন গীতিকবি ছিলেন না। অথচ তাঁরা সবাই ছিলেন প্রতীচ্য বিদ্যায় উচ্চশিক্ষিত।

বাঙলায় আধুনিক গীতিকবিতার আমেজ প্রথম যিনি সৃষ্টি করলেন, তিনি বিহারীলাল চক্রবর্তী—জন্ম ১৮৩৪ সনে আর মৃত্যু ১৮৯৪ সনে। বিহারীলাল ইংরেজী বিদ্যায় পটু ছিলেন না। তবে রামকমল ভট্টাচার্য, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ সেকালের জ্ঞানী গুণী-বিদ্বানের ঘনিষ্ঠ সঙ্গ পেয়েছিলেন তিনি। তাঁদের কাছে শুনে শুনে তিনি পাশ্চাত্ত্যের সাহিত্য, দর্শন ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে একটি মোটামুটি স্বচ্ছ ধারণা লাভ করেন। ফলে তিনি মেজাজে ও জীবন-চেতনায় একজন পুরোপুরি আধুনিক য়ুরোপীয় মানুষ হয়ে উঠেন। সেই মেজাজ ও চেতনার প্রসূন হচ্ছে তাঁর কাব্য। মধুসূদন কিংবা হেম-নবীনের কাব্যে রবীন্দ্রনাথের বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল না। বিহারীলালের মধ্যেই কিশোর রবীন্দ্রনাথ তাঁর আত্মার আহার ও আনন্দ খুঁজে পান। কবি রবীন্দ্রনাথের প্রাথমিক বিকাশে বিহারীলালের প্রভাব তুচ্ছ নয়। বিহারীলালের রূপলক্ষ্মী সারদা আর রবীন্দ্রনাথের 'জীবনদেবতা' মূলত অভিন্ন।

বিহারীলাল ছিলেন জীবনবাদী কবি। এবং সে-জীবনের অবলম্বন ছিল প্রেম ও সৌন্দর্য। আর সে-জীবন-চেতনার মূলে ছিল পার্থিব জীবনের মাহাত্ম্য-মুগ্ধতা। জীবনটা যে একটা ঐশ্বর্য এবং সে ঐশ্বর্য যে মাটি ও মানুষের প্রতিবেশেই ভোগ করতে হবে—এ চেতনা বিহারীলাল

গোড়াতে লাভ করেছিলেন। যা ভালো লাগে তা-ই ভালোবাসার বস্তু এবং ভালাবাসার দৃষ্টিতে সবই সুন্দর। বিহারীলাল আমরণ এই জগৎ ও জীবনের সৌন্দর্যে মুগ্ধ ও দিশেহারা ছিলেন। বৈষয়িক জীবনকে তুচ্ছ জেনে, বাস্তবজীবনকে আড়াল করে বিহারীলাল রূপ ও সৌন্দর্যের, প্রেম ও পৃথিবীর স্বরূপ উপলব্ধির প্রয়াসী ছিলেন। পৃথিবীর রূপে মুগ্ধ জীবন-রসের রসিক কবি জাগতিক রূপ ও রসের উৎস যে সৌন্দর্যস্বরূপা তাঁকেই জানবার বুঝবার প্রয়াসে, তাঁর অনুধ্যানে আমৃত্যু রত থাকেন। এভাবে প্রেম ও সৌন্দর্যলিপ্সু কবি অবশেষে তাত্ত্বিক ও মরমীয়া সাধক কবিতে পরিণত হলেন। তাঁর 'সারদামঙ্গল ও সাধের আসন' কাব্য দু'টিতে ভূমি ও ভূমা, প্রিয় ও পৃথিবী, রূপ ও রূপসী একাকার হয়ে গেছে। তাই বিহারীলাল দুর্বোধ্য, তাত্ত্বিক ও মরমী। নইলে বিহারীলালও এ জীবনের ও জগতের কবি। অধ্যাত্ম্য তত্ত্ব-চিন্তা কখনো তাঁর প্রশ্রয় পায়নি। প্রথম জীবনে রচিত 'বঙ্গসুন্দরী', 'বন্ধুবিয়োগ'. 'নিসর্গ সন্দর্শন', 'প্রেম প্রবাহিনী' প্রভৃতি কাব্যে বিহারীলালের চেতনা একান্তই ভূমি-নির্ভর, সরল ও ঘরোয়া জীবন-ঘেঁষা। ঘুমন্ত স্ত্রীর সুন্দর মুখের পানে তাকিয়ে উল্লসিত কবি লিখেছেন ঃ

—আহা এই মুখখানি
প্রেম-ভরা মুখখানি
ত্রিলোক সৌন্দর্য আমায় কে দিল আনিয়া !

মানুষকে ভালোবেসে, নারীকে প্রেম করেই বিহারীলাল বিশ্ব-প্রকৃতির ও নিসর্গের এবং ব্রহ্মাণ্ডের সৌন্দর্য-লক্ষ্মীর ধারণা বোধগত করেন। সারাজীবন রূপ-তৃষ্ণা তাঁকে বিচলিত ও উৎকণ্ঠিত রেখেছে। তাই তিনি পরলোককে অস্বীকার করেছেন, স্বর্গসুখকে জেনেছেন তুচ্ছ বলে। বলেছেন—স্বরগে অনন্ত সুখ, অহো এ কি যাতনা ! অতএব দুঃখ-সুখের এই পার্থিব জীবনকেই তিনি বিচিত্রভাবে অনুভব, উপভোগ ও উপলব্ধি করতে চেয়েছেন। অবিকৃত ও একঘেঁয়ে স্বর্গসুখকে যন্ত্রণাকর বলে জেনেছেন।

এই নরজন্মকেই তিনি দুর্লভ ও সার্থক বলে মেনেছেন। এবং বলেছেন, এ জন্যেই স্বর্গের দেবতাও দুর্নিবার রাখালরূপে নর-লীলার আনন্দ-ভোগে ধন্য হতে চেয়েছেন। জীবনে যে একবার এই রূপরসের সন্ধান

পেয়েছে, তার মতো সার্থকজন্মা আর কে! তাই কবি সৌন্দর্যস্বরূপার উ.দ্দশে বলতে পেরেছেন :

তুমি লক্ষ্মী সরস্বতী
আমি ব্রহ্মাণ্ডের পতি
হোক গে বসুমতী যার খুশী তার।

আগেই বলেছি, প্রতীচ্য আদলে প্রথম সার্থক গীতিকবি ছিলেন বিহারীলাল। কিন্তু তবু তাঁর মধ্যেও আমরা গীতিকবিতার বিশুদ্ধ নমুনা পাইনে। তার কারণ বোধ হয়, একদিকে যেমন ইংরেজীটা তাঁর পুরো শেখা ছিল না বলে ইংরেজী সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ ও ঘনিষ্ঠ যোগ হতে পারেনি, অন্যদিকে তেমনি স্বদেশী ও স্বশাস্ত্রীয় অধ্যাত্মতত্ত্ব এবং তাত্ত্বিকতাও তাঁর অজ্ঞাতেই তাঁকে প্রভাবিত করেছে। ফলে জীবনবাদী কবি প্রাণের কথা সহজভাবে বলতে যেয়ে আকস্মিক-ভাবে রহস্যময় হয়ে উঠেছেন। তাঁর কাব্যও তাই তাত্ত্বিকতার মরুতে দিশা হারিয়েছে। এমনকি রবীন্দ্রনাথের কাব্যেও এই আধ্যাত্মিকতার অরণ্য অপ্রত্যক্ষ নয়। অতএব, তাত্ত্বিকতা প্রাচ্য কবিদের স্বভাব।

তবু কাব্যে নতুন জীবনচেতনার প্রবর্তক হিসেবে বাঙলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে বিহারীলালের গৌরব অম্লান থাকবে। এই মাটি ও মানুষের পৃথিবীকে তিনি সত্য ও সুন্দর বলে জেনেছিলেন। পারত্রিক সুখ-স্বর্গ তাঁকে প্রলুব্ধ করেনি। প্রিয়া ও পৃথিবীর রূপে তিনি ছিলেন মুগ্ধ, জীবনের মাধুর্যরসে ছিলেন অভিভূত। তাই বলতে পেরেছেন :

ভালবাসি নারীনরে
ভালোবাসি চরাচরে
মনের আনন্দে রই।

এর আগে যখন হৃদয়ে এই প্রীতি জাগেনি, তখন বলেছেন :

সর্বদাই হুহু করে মন
বিশ্ব যেন মরুর মতন।

এভাবে বিহারীলাল কাব্যের ক্ষেত্রে আত্মভাব সাধনার একটি স্বকীয় জগৎ আবিষ্কার করেছিলেন। স্বাতন্ত্র্য ও বলিষ্ঠতায় তাঁর কাব্য আজো উজ্জ্বল। বিহারীলালের জীবনবাদ ও মর্ত্যপ্রীতি এবং সৌন্দর্য চেতনা আধুনিক মানববাদের স্বগোত্রীয়। মানবজীবনের মাধুর্য, সৌন্দর্য ও

সম্ভাবনাময় মহিমাই তাঁর কাব্যে পরিব্যক্ত হয়েছে। এ জীবন-দর্শন বাঙলা সাহিত্যে সেদিন ছিল একাধারে নতুন ও বিস্ময়কর।

সহজ করে বলতে গেলে, বিহারীলালের কাব্যে তত্ত্ব বা তথ্য যা আছে, তা এই- 'রূপসীরে করে পূজা, প্রেয়সীরে ভালোবাসে কবি।' তবে রূপ ও রূপসী, প্রিয়া ও পৃথিবী, ভূমি ও ভূমা, কায়া ও ছায়া কখনো স্বতন্ত্র হয়ে, কখনো একাকার হয়ে কবিকে কখনো বিচলিত, কখনো উল্লসিত এবং কখনো বা দিশেহারা করেছে। কায়া, ছায়া ও মায়া তাঁকে সমভাবে প্রলুব্ধ ও অস্থির রেখেছে। বাঙালী-চিত্তে নতুন জীবন চেতনা ও জগৎ-ভাবনা সৃষ্টিতে বিহারীলালও একজন পথিকৃৎ। তাই বাঙলার সাহিত্য, মনন ও সংস্কৃতিক্ষেত্রে বিহারীলাল চিরকাল একটি সগৌরবে স্মরণীয় নাম হয়ে থাকবে। জয়তু বিহারীলাল!

কবি কায়কোবাদ

কবি-সাহিত্যিক-দার্শনিকরাও স্বকালের মানুষ। দেশ-কালের প্রভাব এড়িয়ে তাঁরাও স্বতন্ত্র জগৎ তৈরী করতে পারেন না। সাধারণ শক্তির আঁকিয়ে লিখিয়ের তো কথাই নেই, এমন কি প্রতিভাবানেরাও কালান্তরের জগৎ ও জীবন সম্ভাবনা সম্পর্কে স্পষ্ট অনুমান করতে অক্ষম। কাজেই যাঁদের আমরা যুগোত্তর প্রতিভা বলি, তাঁরাও আসলে চমকপ্রদ ভাবজগৎই সৃষ্টি করেন, নতুন জগৎ নয়। ফলে দেশান্তরে বা কালান্তরে কারো ভাব চিন্তা-কর্মের তেমন কোন প্রয়োগ-সম্ভব উপযোগ থাকে না। নতুন দিনে নতুন মানুষের প্রয়োজন কেবল সমকালীন মানুষই মিটাতে পারে। কেননা আদিকালের এই পুরোনো পৃথিবী নতুন মানুষের কাছে নবরূপে ও নবরসে বিস্ময়করভাবে প্রতিভাত হয় বলেই পৃথিবী জীর্ণতামুক্ত। পৃথিবী চির নতুন ও সুন্দর। প্রতি নতুন মানুষ নতুন করে এই জগৎ ও জীবনকে আবিষ্কার করে। নতুন মনের নতুন চোখের নব আবিষ্কারই পৃথিবীকে বৈচিত্র্য ও সৌন্দর্য দান করে—একে ভালোবাসার যোগ্য করে রাখে। তবু মানুষমাত্রেই ইতিকথার অনুরাগী। সেই অনুরাগবশেই আমরা অতীতের দিকে ফিরে তাকাবার প্রেরণা পাই। এক বেদনা-মধুর অনুভবে আমরা শিহরিত হতে ভালোবাসি। কল্পনা ও স্বপ্নময় কুয়াশা ঘেরা অতীত যেন হাতছানি দিয়ে ডাকে—সে ডাক নিশির ডাকের মতো মোহময়। সে আহ্বানে সাড়া না দিয়ে মানুষ সাধারণত পারে না।

কায়কোবাদের রচনায় ভাব-চিন্তার ক্ষেত্রে রয়েছে সমকালীনতা আর দৃষ্টি ও কামনার জগৎ হয়েছে ফেলে-আসা সুদূর ও অদূর অতীত। মহাশ্মশান, মহররম শরীফ, শিবমন্দির কাব্যাদি আমাদের ঐ ধারণার সাক্ষ্য। মহররম শরীফ দূর অতীতের মুসলিম-জীবনের বিপর্যয়ের ইতিকথা, মহাশ্মশান নিকট-অতীতের মুসলিম-জীবনের দুর্যোগের কাহিনী। শিবমন্দির সমকালীন স্বদেশী মুসলিমদের দুর্ভাগ্য-দুর্দশার চিত্র।

উনিশ শতকে এবং বিশ শতকের প্রথম পাদ অবধি যে-সব মুসলমান সাহিত্যক্ষেত্রে লেখনী ধারণ করেন, তাঁদের কেউ উচ্চশিক্ষিত ছিলেন না। অসম্পূর্ণ ও স্বল্পশিক্ষা তাঁদের জ্ঞান-মনীষা ও প্রজ্ঞা-প্রতিভা বিকাশের বিশেষ অন্তরায় ছিল। জ্ঞানের স্বল্পতা বড়ো প্রতিভার বিকাশেও প্রবল বাধাস্বরূপ। পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞানের সঙ্গে মুসলিম লিখিয়েদের প্রত্যক্ষ পরিচয় ছিল না। প্রতীচ্য জীবন-ভাবনা ও জগৎ-চেতনার সঙ্গে তাঁদের পরিচয় ছিল পরোক্ষ—হিন্দু লিখিয়েদের বাঙলা রচনার মাধ্যমে। কাজেই চিন্তা ও চেতনার বন্ধতা ছিল দুর্লঙ্ঘ্য। এই সীমিত শক্তি ও চিন্তার প্রকাশ ঘটেছে কায়কোবাদের সাহিত্যেও। কাজেই এতে যদি আমরা আমাদের প্রত্যাশার পূর্তি খুঁজি, তা হলে আমাদের হতাশ হতেই হবে।

সেকালের মুসলিম লিখিয়েদের কৃতিত্ব কিংবা গুরুত্ব উচ্চমানের সাহিত্য-সৃষ্টিতে নয় বরং সমকালের জীবনপ্রবাহে তাঁদের ঐতিহাসিক ভূমিকা পালনে। প্রতীচ্য বিদ্যা ও জীবন থেকে প্রেরণা পেয়ে শিক্ষিত হিন্দুরা যেমন স্বাজাত্যে ও স্বাদেশিকতায় উদ্বুদ্ধ হবার প্রয়াসী ছিলেন, স্বল্পশিক্ষিত মুসলিমরাও ওঁদের অনুকরণে স্বজাতির ও স্বসমাজের প্রতি আসক্তি প্রকাশ করেন। তখন বাঙালী মাত্রই স্বজাতির অতীত ঐতিহ্য ও গৌরবাশ্রয়ী। হিন্দুর অনুধ্যানে এল আর্য, রাজপুত ও মারাঠা গৌরব বৃত্ত। মুসলিমের চিত্ত পরিক্রমার ক্ষেত্র হল আরব, ইরান ও মধ্যএশিয়া। কায়কোবাদেও এই চেতনা প্রকট। উনিশ-বিশ শতকের শিক্ষিত বাঙালীর রচনায় স্থানিক জীবনচেতনা দুর্লভ। অতীতমুখী স্বধর্মীর গৌরব গর্বী বাঙালী শিক্ষিত কেবল হিন্দু কিংবা শুধু মুসলমান হয়েছে—কখনো বাঙালী হয়নি। এই বিড়ম্বনামুক্ত হতে আমাদের বিশ শতকেরও ষাট-সত্তর বছর লেগেছে।

অতএব কায়কোবাদকে বিচার করব উনিশ শতকী বাঙালী মনের নিরিখে, যদিও তিনি জৈবজীবনে ছিলেন স্বকালোত্তর। ১৮৫৮ সনে তাঁর জন্ম, আর ১৯৫২ সনে মৃত্যু। কালের দিক দিয়ে রবীন্দ্রনাথের সমকালীন আর মনের দিক দিয়ে রঙ্গলাল হেমচন্দ্র ও নবীনসেনের সমধর্মী। স্বজাতি, স্বসমাজ ও স্বদেশহিতৈষণাই হচ্ছে কায়কোবাদের তথা সে-যুগের লিখিয়েদের লক্ষ্য। তাঁদের ভ্রান্ত জাতীয়তাবোধ, ত্রুটিপূর্ণ হিতচিন্তা ও অতীতাশ্রয়ী জীবনচেতনা পরবর্তীকালে আমাদের

অনেক দুর্ভোগের কারণ হয়েছে বটে, কিন্তু তাঁদের সততায়, আন্তরিকতায়, ও সীমিত মানবতাবোধে সচেতন ফাঁকি ছিল না। কাজেই উনিশ শতকী ও বিশ শতকের গোড়ার দিককার সাধারণ বাঙালীর জীবন-ভাবনার ও জগৎ-চেতনার সাক্ষ্য হিসেবে কিংবা দেশের সাধারণ ও সামগ্রিক জীবনপ্রবাহের আদর্শিক আলেখ্য হিসেবে অন্যান্যদের রচনার মতো কায়কোবাদের রচনাও ঐতিহাসিক মূল্য বহন করে। সেদিনকার নিজিত স্বসমাজের জন্যে তাঁর দরদ, আকুলতা, হিতৈষণা আমাদের মুগ্ধ করে—তাঁর প্রতি আমাদের শ্রদ্ধান্বিত করে।

কায়কোবাদের কাব্যবস্তু প্রায়ই বেদনার, বিরহের, বিচ্ছেদের ও পরাজয়ের। কারুণ্য ও হতাশাসই মূল সুর। করুণই প্রধান রস। দুনিয়ার তাবৎ মহৎ সাহিত্যের উপকরণ উপাদান ঐ Tragic রসাশ্রিত। সেদিক দিয়ে কায়কোবাদ যথার্থ রুচিবোধের পরিচয় রেখে গেছেন। কবিভাষার ক্ষেত্রে কায়কোবাদ ছিলেন নবীনসেনের অনুসারী। নবীনসেনও ছিলেন মহৎভাবের ও বৃহৎতত্ত্বের সাধক। তবে তাঁর সাধ ও সাধ্যে সমতা ছিল না। তেমনি কায়কোবাদেরও লক্ষ্যে এবং সামর্থ্যে ফাঁক ছিল বিস্তর। তাই কায়কোবাদ মহৎ কিংবা বিশিষ্ট কবি নন। আবার তিনি ছিলেন রবীন্দ্রপূর্বযুগের কবিগোষ্ঠীর ও কাব্যধারার অনুসারী। কিন্তু কালের দিক দিয়ে ছিলেন রবীন্দ্রযুগের। তাই তাঁর কাব্য হচ্ছে অতিক্রান্ত ঋতুর ফসল—মৌসুমী নয়। কাজেই কালান্তরে ভিন্ন ঋতুর ফল পাঠকসমাজে আদর কদর পায়নি। তখন বাঙালী রবীন্দ্রকাব্যরসে অভিভূত এবং প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর জীবন ভাবনায় বিচলিত আর ত্রিশোত্তর লিখিয়েদের বদৌলত জীবন-তত্ত্ব ও জগৎ চেতনা রূপান্তরিত। কাজেই কায়কোবাদ ঠাঁই কিংবা স্থিতি পেলেন না কোথাও। রইলেন প্রায় না ঘাটকা না ঘরকা হয়ে। তাঁর প্রাপ্য সম্মান রইল অপ্রাপনীয় হয়ে। তবু প্রাক্তন পাকিস্তানে স্বদেশী স্বভাষীরা তাঁকে জিইয়ে তুলবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু বাঁচা ও টিকে থাকা—দুটোই নির্ভর করে প্রাণশক্তি ও আত্মশক্তির উপর। কায়কোবাদের কাব্যে ঐ দুটোরই অভাব। কায়কোবাদ সুদীর্ঘ পঁচানব্বই বছর বেঁচেছিলেন। বারো বছর বয়েস থেকেই শুরু

করেছিলেন কাব্যরচনা। অতএব তাঁর সুদীর্ঘ তিরাশী বছরের সাধনার ফসল তুলনায় বেশী নয়। ঐ কদরের অভাবেই হয়তো তাঁর শেষ ত্রিশ বছরের রচনা তাঁর জীবৎকালেই অনাদরে অমুদ্রিত অবস্থায় পড়েছিল।

তবু সেদিন কায়কোবাদ এক নিজিত সমাজের প্রতিনিধি-প্রতিভূ কিংবা মুখপাত্র হিসেবে অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। স্বসমাজের মুখরক্ষা করেছিলেন সাহিত্যের আসরে ও আধুনিক জীবন চেতনার চত্বরে। একান্তে জলেছিলেন খদ্যোতের মতো। তাতেও তাঁর স্বসমাজের লোক পেয়েছিল প্রাণের প্রেরণা ও পথের দিশা। এই ঐতিহাসিক দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছিলেন বলেই আমরা এই মুহূর্তেও শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করছি মহাশ্মশানের কবিকে। তাঁর জাতিক ও দৈশিক জীবনে তিনি যে মহাশ্মশান ও শ্মশানভস্ম দেখে নৈরাশ্যে ও বেদনায় বুকফাটা নিঃশ্বাস ফেলেছেন, যে কারবালা তাঁকে কাঁদিয়েছে, তাঁর জীবৎকালেই পাকিস্তান রাষ্ট্র দেখে তিনি নিশ্চয়ই সে-সব শোক ভুলেছিলেন, আজ দেশ ও জাতি সে-অভিশাপও মুক্ত হয়ে পুনরুজ্জীবিত হয়েছে—এতে কি তাঁর কোন পরোক্ষ দান নেই। যদি আত্মা থাকে, তাহলে আজ অশ্রুমালার কবির কান্না থামবে। তাঁর আত্মা খুশী হবে।

আজকের সাহিত্যের পরিধি

সাহিত্য হচ্ছে জীবন ও জীবন-ভাবনার প্রতিরূপ বা প্রতিচ্ছবি, তবু তা' স্থূল জীবনালেখ্য নয়—জীবনের উদ্ভাস। কেননা, দৃশ্যমান জীবন আচরণে-বিচরণে সীমিত। তাতে সমাজ-সদস্য মানুষরূপে কিংবা সমাজ-নিয়ন্ত্রিত ব্যক্তিত্ব হিসেবে তাকে পূর্ণ অবয়বে দেখা যায় না। বহু যুগসঞ্চিত ও কালান্তরে বিবর্তিত ও রূপান্তরিত বিশ্বাস-সংস্কার, নিয়ম-রীতি-নীতি, রেওয়াজ-প্রথা-পদ্ধতি ও বৃত্তি-প্রবৃত্তি দিয়ে নির্মিত ও নিয়ন্ত্রিত জীবনের বক্র-বিচিত্র, জটা-জটিল ও বিকার-বিকৃত বিকাশ ও প্রকাশ শাদাচোখে সাধারণে অনুধাবন করতে পারে না। জীবনের ঐ বক্র-বিচিত্র বিকার-বিকাশও কারণ-ক্রিয়া নিরূপণ-বিশ্লেষণ মাধ্যমে চিত্রিত করার দায়িত্ব পালন করেন জীবন-শিল্পী। জগৎ-চেতনার প্রতিবেশে যে-জীবন-ভাবনা চিত্তলোকে মুকুলিত ও কর্মপ্রয়াসে পুষ্পিত এবং সাফল্যে কিংবা নিষ্ফলতায় অবসিত, সে-জীবনের ইতিকথা আনন্দ-যন্ত্রণার নিরিখে যাচাই করতে হয় কালগত ও স্থানগত আপেক্ষিক তাৎপর্যে।

আদিকালের মানুষের জীবন ছিল দৈবনির্ভর। তখন আসমানী দেবতা তার দেহ-মন, সুখ-দুঃখ, আনন্দ-যন্ত্রণা নিয়ন্ত্রণ করতেন। তখন রিজিকের মালিক ছিলেন রাজ্জাক, প্রতিষেধকবিহীন রোগের নিরাময় ছিল দৈব-কৃপানির্ভর, রোদ-বৃষ্টি ছিল দেব-দয়ার দান। ফলে জীবনে সমস্যা-শঙ্কা-ত্রাস ছিল বটে, কিন্তু কোনটারই প্রতিকার কিংবা সমাধানের উপায় ছিল না আয়ত্তে। দারুণ দেবতাকে করুণ করার, বিরূপ বিরক্ত দেবতাকে অনুরক্ত করার, অরি দেবতাকে মিত্র করার উপায় উদ্ভাবনে ও সাধনায় নিরত থাকত তখনকার অসহায় ভীত মানুষ। পূজা-সিন্নি, তুক-তাক, মন্ত্র-তন্ত্র সে-প্রয়াসের প্রসূন।

নিয়তির শিকার মানুষের হাতে তখনো একটা গুরু দায়িত্ব ছিল। তা হচ্ছে যৌথ জীবনে পারস্পরিক নিরাপত্তার প্রয়োজনে সমস্বার্থে সহযোগিতা ও সহাবস্থানের অঙ্গীকারে গোত্রীয় সংহতি রক্ষার দায়িত্ব।

তারই জন্যে জরুরী ছিল ন্যায়-নীতি, পাপ-পুণ্য, ঘৃণা-লজ্জা-ভয়, প্রীতি-মৈত্রী-করুণা, মান-যশ-খ্যাতি প্রভৃতির প্ররোচনায় ও প্রেরণায় নিয়মনিষ্ঠ সংযত জীবনধারণের পরিণাম-মাধুর্যে আসক্তি দান। তাই আমরা প্রাচীন সাহিত্যে সদ্‌বৃত্ত-সদাচারী ও দুর্বৃত্ত-দুরাচারী মানুষের পরিণাম চিত্রই কেবল পাই। সেখানে মানুষ হয় অতি ভালো অথবা অতি মন্দ। সেখানে মানুষ ও মানবিক অনুভূতি গৌণ, মুখ্য হচ্ছে নীতিনিষ্ঠা ও নীতিহীনতার পরিণাম প্রদর্শন। জীবন যে স্থান কাল ও প্রতিবেশ-প্রয়োজনগত, মানুষ যে শুধু ভালো কিংবা কেবল মন্দ নয়, কখনো ভালো কখনো মন্দ, কারো কাছে ভালো কারো কাছে মন্দ, কারো প্রতি দারুণ আর কারো প্রতি করুণ এবং সবটাই যে আপেক্ষিক তা' ইদানীং-পূর্ব কালে কখনো কোথাও কারো কাছে ব্যাপকভাবে স্বীকৃতি পায়নি। ফলে হাজার হাজার বছর ধরে লক্ষ কোটি মানুষ শাস্ত্র-সমাজ-সরকারের নিয়ম-নীতি-ন্যায়ের খড়্গে বলি হয়েছে। "To know all is to pardon all" তত্ত্বটি তার যথার্থ তাৎপর্যে কখনো সম্মানিত হয়নি। বৃত্তচ্যুতি মাত্রই শাস্ত্রীয়, সামাজিক ও সরকারী বিপর্যয় সৃষ্টি করে—এ প্রত্যয়বশে নিয়ম-নীতি-ন্যায়ের দোহাই উচ্চারণ করে শাস্ত্রী, সমাজপতি ও শাসক গণ-স্বার্থে চিরকালই গণহত্যা চালিয়েছে। এমনি করে নিয়মের খাঁচায় নিবদ্ধ মানুষ যান্ত্রিক জীবনে ও মননে অভ্যস্ত হয়ে পীড়ক-পীড়িত রূপে স্থাণুর জীবনে নিশ্চিত ও আশ্বস্ত থাকতে চেয়েছে, ব্যতিক্রম সহ্য করেনি, কিংবা বিবর্তন কামনা করেনি।

তবু জ্ঞান-বুদ্ধি-প্রজ্ঞা সমন্বিত প্রয়াসে মানুষ ক্রমে ক্রমে প্রকৃতির প্রভু হয়ে বসেছে। কুশল মানুষ সর্বপ্রকার প্রতিকূল প্রতিবেশকে জীবনের অনুকূল করে তুলেছে। আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যেখানে যা কিছু রয়েছে, সেগুলোকে জীবন-জীবিকার অনুগত করে জীবন-জীবিকাকে স্বায়ত্তে আনতে সমর্থ হয়েছে মানুষ। আত্মশক্তিপুষ্ট আজকের আত্মপ্রত্যয়ী মানুষ জগৎ-চেতনা ও জীবন-ভাবনার ক্ষেত্রে একান্তই ভূমিলগ্ন—আকাশচারী নয়। অন্ন আনন্দ প্রাপ্তির জন্যে কিংবা অভাব-অস্বস্তি-অসুস্থতা বিমোচনের তাগিদে এখন কেউ আর আসমানী দেবতার কৃপার প্রতীক্ষায় থাকে না। প্রতিকার-প্রতিরোধ কামনায় সরকারী অফিসের তৎপরতাই প্রত্যাশা

করে। মড়ক-বন্যা-প্লাবন-ভূকম্প-লাভাস্রাব কিংবা ভাত-কাপড়-রোগ-অভাব-অনটন প্রভৃতি জীবন ও জীবিকাসংপৃক্ত সর্বপ্রকার আপদ-অভাব-বিপর্যয় থেকে আত্মরক্ষার ও আত্মত্রাণের উপায় উদ্ভাবনে বহুলাংশে সফল হয়েছে জ্ঞান-বুদ্ধি-প্রজ্ঞাপ্রবুদ্ধ উদ্যোগী কৌশলী মানুষ।

তাই আজকের সাহিত্যে দেবতা-নিয়তি, পাপ-পুণ্য প্রভৃতি গুরুত্ব পায় না। পায় জীবন-জীবিকাসংপৃক্ত সমস্যাবলী। অন্য কথায় শাস্ত্র-সমাজ-সরকার শাসিত ব্যক্তিক, পারিবারিক, সামাজিক, আর্থিক ও রাষ্ট্রিক জীবনে অনুকূল ও প্রতিকূল প্রতিবেশে মানুষ কিভাবে দুঃখ-বেদনা, অভাব-অনটন, বঞ্চনা-লাঞ্ছনা, রোগ-শোক-বুভুক্ষা-দুর্দশা-দুর্ভোগ প্রভৃতির শিকার হচ্ছে অথবা সুখ-আনন্দ-প্রাচুর্য-স্বাচ্ছন্দ্য, প্রভাব-প্রতাপ-প্রতিপত্তি ও উপচিকীর্ষার প্রসাদ পেয়ে ধন্য হচ্ছে ; কিংবা দয়া-দাক্ষিণ্য, সেবা-সহানুভূতি, প্রীতি-মৈত্রী, করুণা, সৌজন্য অথবা ঈর্ষা-অসূয়া-ঘৃণা-বঞ্চনা-প্রতারণা-কার্পণ্য-নির্দয়তা-লিপ্সা-রিরংসা-জিগীষা-জিঘাংসা প্রভৃতি মানুষের জীবনে যে কল্যাণ অথবা বিপর্যয়প্রসূত যে যন্ত্রণা ও বিনষ্টির অভিশাপ বয়ে আনছে, তা দেখা-দেখানো জানা-জানানো, বোঝা-বোঝানোই সাহিত্যশিল্পীর কাজ। শ্রেয়সের সন্ধান এভাবেই মেলে। শ্রেয়সের প্রতি আকর্ষণ এমনি করেই জাগে। কল্যাণ-কামনা এপথেই প্রবল হয়। দৃষ্টির প্রসারও ঘটে এভাবেই। তাই মানুষের প্রতি অনুরাগ, ক্ষমার আগ্রহ, ন্যায়ের প্রতি আসক্তি সাহিত্যের মাধ্যমেই সহজে বৃদ্ধি পায়।

শাস্ত্র-সমাজ-সরকার তিনটিই শাসনসংস্থা। মানুষ আত্মকল্যাণেই শাসিত হতে চায়, শাস্ত্র-সমাজ-সরকার যখন পোষণের জন্যে শাসন করে, তখন মানুষ স্বেচ্ছায় আনুগত্য ও সহযোগিতা দান করে। এবং যখন শোষণের জন্যে শাসন চালায়, তখনই দেখা দেয় দ্বন্দ্ব ও সংঘাত। শাসনসংস্থা যৌথজীবনে আবশ্যিক। কেননা, শাসনের প্রতাপে ও প্রভাবেই মানুষ সংযত জীবন যাপন করে। মানুষের অসংযম ও অনিরুদ্ধ লিপ্সা নিয়ন্ত্রণ করে ব্যক্তিজীবনে নিরাপত্তাদানই শাসনের লক্ষ্য। মানুষ স্বেচ্ছায় যে শাসন চায়, তা সোহাগের শাসন, শাস্ত্র-সমাজ-সরকার যে শাসনপ্রবণ তা হচ্ছে শোষণের শাসন, শাসক-শাসিতের দ্বন্দ্ব তাই প্রায় চিরন্তন হয়েই রয়েছে। আর মানুষের হাতে মানুষের পীড়ন-লাঞ্ছনা-বঞ্চনাও তাই আজো

অশেষ। অনুরাগবশে যে আনুগত্য তা-ই অকৃত্রিম ও স্থায়ী ; ভীতিবশে যে আনুগত্য তা' নিষ্ফল। জোরে অনুগত করা চলে, অনুরাগী করা চলে না। ভালোবেসে ও ভরসা দিয়েই অনুরাগী ও অনুগত করা সম্ভব।

মানুষ মাত্রই—হয়তো প্রাণীমাত্রই—শাক্ত। শক্তির প্রতি আসক্তিই দুর্বলকে শাক্ত করে। কাজেই প্রতি মানুষেরই শক্তিধর ও শাক্ত হবার বাসনা সুপ্ত থাকে। সুযোগ পেলেই দুর্বলও শক্তিচর্চা করে—আত্মপ্রতিষ্ঠায় ও আত্মপ্রসারে উদ্যোগী হয়ে উঠে। লাভের লোভ তার বৃত্তচ্যুতি ঘটায়। তখন মানুষ পরস্বাপহরণে হাত বাড়ায় এবং সে-মুহূর্তেই মানুষ পরপীড়ক। প্রবল-মাত্রই পরপীড়ক ও শোষক। প্রবলে প্রশ্রয় না দিয়ে সংযত রাখাই প্রবলতর শাস্ত্র-সমাজ-সরকারের লক্ষ্যগত দায়িত্ব ও কর্তব্য। সুযোগই শক্তির উৎস। লিপ্সু মানুষকে সুযোগ থেকে বঞ্চিত রাখার উপায়ের নামই হচ্ছে শাস্ত্রীয় বিধি, সামাজিক নীতি ও সরকারী শাসন। এ তাৎপর্যেই 'দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন'—আপ্তবাক্যটি আজো চালু রয়েছে।

নিয়ম-নিয়ন্ত্রিত চলমান জীবনে বৃত্তচ্যুতি মাত্রই অন্যায়-অপরাধ নয়, শ্রেয়সের সন্ধিৎসায় পুরোনোর পরিহার বাঞ্ছনীয়। এভাবেই আসে মানবিক অগ্রগতি। কিন্তু লোভ-লালসাবশে ব্যক্তিক বৃত্তচ্যুতিই অন্যায়, অনর্থকর ও অমার্জনীয় অপরাধ। আশ্চর্য, ব্যক্তিস্বার্থে যে বৃত্তচ্যুতি মানুষ তা উদারতার সঙ্গে ক্ষমা করতে রাজী, কিন্তু মানবকল্যাণে ভাব-চিন্তা-নীতি-রীতির পরিবর্তন ও বিবর্তনকামী মানুষকে কেউই সহ্য করতে চায় না। মানবিক দুঃখ-যন্ত্রণার কারণ এমনি রক্ষণশীলতায় নিহিত। বলা চলে মানব-জীবনের অধিকাংশ Tragedy-র জন্যে সংস্কারদুষ্ট ঐ রক্ষণশীল কূর্মপ্রবৃত্তিই দায়ী। শাস্ত্র-সমাজ-সরকার স্ব স্ব স্বার্থে ঐ কূর্মপ্রবৃত্তিরই সংরক্ষক।

শাস্ত্র-সমাজ-সরকার-শাসিত প্রতিবেশে ব্যক্তিক, ঘরোয়া, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক জীবনে দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মূলে রয়েছে বহু জনহিত লক্ষ্যে সামগ্রিক সদিচ্ছা ও কল্যাণ-বুদ্ধির অভাবপ্রসূত জটিলতা। কর্তার হৃদয়ে নির্বিশেষ মানুষের মঙ্গলকর সদিচ্ছা না জাগলে, খণ্ডদৃষ্টি ও ক্ষুদ্র স্বার্থের শিকার যে-কর্তা, তার শাসনে দ্বন্দ্ব-সংঘাত বাড়ে, সমস্যা হয় বহু ও বিচিত্র, মন-মানস হয় ক্রূর ও জটিল। তারপরে বহু বহু বছর পরে একদিন ভূ-কম্পের মতো, ঝড়কের মতো, বন্যার মতো, জলোচ্ছ্বাসের মতো, লাভাস্রোতের মতো,

বৈনাশিক শক্তি দ্বন্দ্ব-দ্রোহ, উপদ্রব-উপসর্গ, বিপ্লব-উপপ্লব রূপে নব সৃষ্টি-সম্ভব প্রলয় ঘটায়। ইতিহাসের এ-ই সার কথা।

রাষ্ট্র (state), শাসন-সংস্থা (govt.) এবং শাসক (regime) যে অভিন্ন নয়, তা আমাদের দেশের শাসকগোষ্ঠী ও জনসাধারণকে যেমন বোঝানো যায় না, তেমনি নাগরিকদের দুঃখের কথা, অভাবের কথা, প্রয়োজনের কথা, দাবির ও অধিকারের কথা প্রকাশ করা ও রাজনীতি (politics) যে ভিন্ন বিষয় তাও তাদের উপলব্ধির বাহিরে। তাই তারা কখনো প্রকাশ্যে তাদের চাহিদার কিংবা দুর্দশা-দুর্ভোগের কথা নিজেরা বলতে সাহস পায় না, পাছে তা পলিটিক্স হয়ে যায় এবং সরকার বা শাসক-গোষ্ঠীর হাতে মার খায়, এই ভয়ে। তাদের হয়ে কোন শাসক-বিরোধী দল তাদের অভাব-দুর্ভোগের প্রতিকার দাবি করুক, কোন অন্যায়ের তাদের হয়ে প্রতিরোধ করুক, কোন অবিচারের তাদের হয়ে প্রতিবাদ করুক, এমনি কুলবধূসুলভ অসহায়তা ও প্রত্যাশা আমাদের জনসাধারণের। তাই কোন রাজনৈতিক দলভুক্ত বেকার মানুষ ছাড়া অন্য কেউ কোন সরকারী স্বেচ্ছাচারিতা, অসামর্থ্য, অবহেলা কিংবা দুর্বুদ্ধি, অযোগ্যতা ও ত্রুটির কথা ঘরের বাইরে উচ্চারণ করতে ডরায়। পূর্বকালের প্রকৃতি-নির্ভর মানুষ যেমন খরায় ক্ষেত জ্বললে কিংবা প্লাবনে মজলে অসহায় হয়ে ঘরে বসে আফসোস ও ছটফট করত, তেমনিভাবে আজো অজ্ঞ ভীরু মানুষ ঘরে বসেই ক্ষোভ প্রকাশ করে। তাই অনুন্নত দেশে লৌকিক বিশ্বাসে শাসক-দলই একাধারে সরকার ও রাষ্ট্র। ফলে অনুন্নতদেশে শাসকগোষ্ঠী বিনা দ্বিধায় ও বাধায় স্বৈরাচারী প্রভু হয়ে দাঁড়ায়। অথচ ব্যক্তিক ও সামষ্টিক জীবনে সরকারসৃষ্ট ভাত-কাপড়ের অভাবের কথা, দুর্মূল্যের কথা, ক্ষতির কথা, অন্যায়ের কথা, নির্যাতনের কথা আবেদন-নিবেদন-অভিযোগ বা প্রতিকার প্রার্থনার আকারে কিংবা প্রতিবাদ-প্রতিরোধের মাধ্যমে শাসককে জানিয়ে দেয়া প্রত্যেক মানুষেরই যে নাগরিক অধিকার, দায়িত্ব ও কর্তব্য, সে-বোধ যতদিন গণমনে জাগ্রত না হবে, ততদিন গণতন্ত্র নিষ্ফল ও নিষ্প্রাণ শাসনযন্ত্র মাত্র। শাসনের পদ্ধতি ও লক্ষ্য সম্পর্কিত কোন বিশিষ্ট মতাদর্শ নিয়ে ক্ষমতা দখলের জন্যে যে-দল গঠিত হয়, তা-ই কেবল রাজনীতিক দল। নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার এবং ন্যায্য দাবি আদায়ের

ও সংরক্ষণের প্রয়োজনে যদি কোন জনতা প্রতিকার-প্রতিবাদ-প্রতিরোধ করবার জন্যে, এমন কি প্রতিশোধ গ্রহণের জন্যে উদ্যোগী হয়, তখনো তাকে পলিটিক্স বলা যাবে না। ঘরোয়া জীবনে যেমন স্ব-স্বার্থে মানুষ আত্মীয়-পরিজনের সঙ্গে কোন্দল করে, স্ব-ক্ষতিতে প্রতিবেশীর সঙ্গে বিবাদ ও মামলা করে, তেমনি সামষ্টিক ক্ষতিতে, দুর্ভোগ-অভাবে শাসকের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ কণ্ঠে ধ্বনিত করে তোলা, প্রতিকারের দাবি উচ্চারণ করা, প্রতিরোধ করা কিংবা প্রতিশোধ চাওয়া নিশ্চয়ই রাজনীতি নয়। লোক-জীবনের সামগ্রিক তত্ত্বাবধানের জন্যেই সরকার। কাজেই যে-কোন অভাব-অসুবিধার কথা জানানো, ঐগুলো বিমোচনের জন্যে তাগিদ-তাগাদা দেয়া ও প্রয়োজন হলে দ্রোহ করা নাগরিক অধিকার।

আজকের সাহিত্য বাস্তবজীবনের আলেখ্য বলেই আজকের সাহিত্যে শাস্ত্র, সমাজ, সরকার, ভাত, কাপড়, গৃহ, চিকিৎসা, অর্থ, বিত্ত, দারিদ্র্য, রাস্তাঘাট, ব্যবসা-বাণিজ্য, বাজারদর, বেচাকেনা, আইন-শৃংখলা, যান-বাহন, রাজনীতি, কূটনীতি প্রভৃতিই আলোচ্য বিষয়। এক কথায় জীবন ও জীবিকাসংপৃক্ত সব ভাব, চিন্তা, কর্ম ও বস্তুই সাহিত্যের বিষয়বস্তু। কেউ কেউ সাহিত্যে আজকাল বক্তব্য ও শিল্প পৃথক করে দেখতে চান। তাঁদের মতে সাহিত্যে শিল্পই মুখ্য, কাজেই বক্তব্য গৌণ গুরুত্ব পাওয়া বাঞ্ছনীয়। জীবনের কথা বলার জন্যে, জীবনকে দেখানোর জন্যে এবং জীবনের সমস্যার প্রতিকার-বাঞ্ছাই যদি সাহিত্যসৃষ্টির মুখ্য কারণ হয়, তা হলে স্বীকার পেতেই হবে, যে জল ও তরঙ্গের মতো, রবি ও রশ্মির মতো বক্তব্য ও শিল্প পরস্পর অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কের। ত্বক-মাংসের মতোই বক্তব্যময় শিল্প কিংবা শিল্পমণ্ডিত বক্তব্য একই তাৎপর্য দান করে। বক্তব্য সুবিন্যস্ত ও সুব্যক্ত হলেই শিল্প হয়। শিল্প বলে আলাদা কোন বস্তু নেই—দেহের রূপের মতো বক্তব্যের লাবণ্যই শিল্প। অতএব বক্তব্য সুবিন্যস্ত ও সুব্যক্ত হলেই লাবণ্যময় হয়, ঐ লাবণ্য বক্তব্যকে শ্রোত্ররসায়ন করে। এবং ঐ রসরূপের নামই শিল্প। তাই বক্তব্য ও শিল্পের সমন্বিত রূপই সাহিত্য।

শিল্পে বক্তব্য-নিরপেক্ষ কাব্যিক কিংবা সাঙ্গীতিক আনন্দস্বরূপের প্রত্যাশী যাঁরা, তাঁদের নান্দনিক রুচির প্রতি শ্রদ্ধা রেখেও বলা দরকার—জীবন-জীবিকা-সঙ্কট উত্তরণের জন্যেই আজ কেবল 'ফলিত' [applied] সাহিত্য চাই।

সাহিত্যের বিবর্তন

অন্য সব চিন্তা ও কর্মের মতো সাহিত্যও জীবন থেকে উৎসারিত। সাহিত্য জীবনেরই গান। জীবন হচ্ছে অনুভূতির প্রবাহ। তাতে রয়েছে সুখ-দুঃখ, ভয়-ভরসা, বিস্ময়-কল্পনা ও আনন্দ-যন্ত্রণা। আদিকাল থেকেই অনুভব-তাড়িত মানুষ তার আবেগ ব্যক্ত করেছে, সে-প্রকাশ সুষ্ঠু ও সুন্দর হলে তা সর্বজনীন ও চিরন্তনতার দাবিদার হয়ে উঠে। অবশ্য ভাব-ভাবনা সর্বজনীন ও চিরন্তন হলেও তার অবলম্বন বা আবেগবাহন স্থানে কালে ও পাত্রে বিভিন্ন ও বিচিত্র হয়, জ্ঞান-বুদ্ধি-রুচির স্বাতন্ত্র্যে মানুষের মন-মনন কিংবা মত-মর্জির পার্থক্য ঘটে। তাই সাহিত্যের রূপ ও রস, অঙ্গ ও অঙ্গী বিবর্তিত হয়েছে, অভিব্যক্তির আধার বা অবলম্বনও পেয়েছে রূপান্তর।

আদিকালে অজ্ঞ মানুষ ছিল প্রকৃতি-নির্ভর, তাই তাদের রচনায় পাই প্রকৃতি-প্রতীক দেও-দেবতার কথা। ভয়-ভরসা-বিস্ময়ের প্রেরণায় অসহায় মানুষ সেদিন কেবল তোয়াজ-স্তুতিই করেছে আত্মরক্ষার তাগিদে। তারপর মানবিক বোধ-বুদ্ধি ও শক্তির বিকাশ-ধারায় মানুষের বক্তব্য বদলেছে বারবার। এইভাবে দেবকথা, রূপকথা, উপকথা হয়ে সাহিত্য আজ রূঢ় জীবন-কথায় এসে পৌঁছেছে।

অন্য সব রচনা থেকে সাহিত্য পৃথক। সে-পার্থক্য রূপগত ও রসগত। সুচিত শব্দের সুবিন্যাসে যে-ধ্বনিমাধুর্য সৃষ্টি হয়, তা-ই তার লাবণ্য এবং পরিমিত ধ্বনির পৌনঃপুনিকতা থেকে জন্মে ছন্দ। এই পরিমিতি, মধ্যমিল, অন্ত্যমিল প্রভৃতি ধ্বনিবিন্যাসের নানা নৈপুণ্যে বৈচিত্র্য এসেছে ছন্দে।

এই কাব্য-অবয়বে নানা আভরণ-যুক্ত হয়েছে কালে কালে। স্বল্পবুদ্ধি শিশু যেমন কেবল রাঙা বস্তুতে আকৃষ্ট হয়, তেমনি সংস্কৃতির শৈশবে মানুষের কাব্য-ছন্দ ও বক্তব্য ছিল অমার্জিত ও স্থূল। মোটা রুচির মানুষ এক সময় অলঙ্কারবাহুল্যের মধ্যেই নারী-সৌন্দর্য আবিষ্কার করত। আজ

সংস্কৃতিবান মানুষ নিরাভরণার লাবণ্যে মুগ্ধ। এই মানুষই আজ কাব্য-দেহও নিরাবরণ আর নিরাভরণ দেখতে চায়। তাই পূর্বের মিলান্ত ছন্দে বাঁধা গতের অলঙ্কারে তার রুচি নেই। জীবন-তথ্যের ও অনুভব-তত্ত্বের আবেগগত অভিব্যক্তির আধার বলে কাব্যের রসও তাই রসিকবেদ্য। কাব্য জ্ঞান বাড়ায় না, অনুভবের দিগন্ত প্রসারিত করে, চিত্তাকাশের বিস্তার ঘটায়।

লোকে বলে, আদিকালে নিরক্ষর মানুষ শ্রুতি-স্মৃতির প্রয়োজনে বক্তব্য ছন্দোবদ্ধ করত এবং বঞ্চিত-বিড়ম্বিত জীবনে কাম্য সাধ মিটাবার জন্যে প্রবৃত্তিসঞ্জাত কল্পনা-মুখ্য রসচর্চা করত। —এতে কোন তথ্য নেই। সত্য এই যে, মানুষের চিন্তা ও কর্ম মাত্রই ছন্দ-সংলগ্ন। রুচিবৈচিত্র্যে স্থূল কিংবা সূক্ষ্ম রূপান্তর ঘটেছে মাত্র। মোটাবুদ্ধির ও স্থূলদৃষ্টির উদাসীন মানুষ কেবল কাব্যের ক্ষেত্রে নয়—জীবনের অন্য এলাকাতেও ছন্দ আবিষ্কারে চিরকাল অসমর্থ। সাহিত্যের গদ্যে-পদ্যে ছন্দ চিরকাল ছিল, এবং চিরকাল থাকবে, তার বাহ্য রূপ যেমনই হোক না কেন। আগে সব কথা পদ্যে লেখা হত, তাঁই পাঁচালী-মহাকাব্য গড়ে উঠেছে। আজকাল একটি আবেগই কবিতায় ব্যক্ত হয়, তাই কবিতা আকারে ছোট। আগে সবটাই সুর করে গাওয়া হত, তাই বিশেষ ছন্দ ও সুর-তালের প্রয়োজন হত। আজকাল গাওয়ার জন্যে আলাদা গান বাঁধা হয়, মন ও মর্জিভেদে সে-গানের ছন্দ, সুর ও তাল হয় বিচিত্র ও নতুন।

সাহিত্য বা কাব্যরসও কখনো জীবন-বিচ্ছিন্ন ছিল না, জীবনপরিবেশ অনুগই ছিল। প্রকৃতিনির্ভর অসহায় মানুষ দৈবানুগ্রহজীবী ছিল বলেই তার জীবনে দেবতা ও নিয়তি ছিল নিত্যসহচর, তাই তার জীবনকথা হয়েছে নিয়ন্তা ও নিয়তি নিয়মিত। তার জীবনের আনন্দ-যন্ত্রণার আকস্মিকতা সে ঐভাবেই ব্যাখ্যা করেছে।

অজ্ঞ-অক্ষম মানুষ ভয়ে-বিস্ময়ে তাকিয়েছে বিরাট বিচিত্র আকাশ ও পৃথিবীর পানে। তার অসংখ্য জিজ্ঞাসার উত্তর খোঁজার প্রয়াসপ্রসূত ভূতপ্রেত, দেও-দানু, হুরপরী, রাক্ষসখোক্কস স্থিতি পেয়েছে তার বিশ্বাসে সংস্কারে। তাই তার সাহিত্যও হয়েছে ঐ বিশ্বাস-সংস্কারের আকর। অদৃশ্য অরি ও মিত্র শক্তি হয়েছে তার জীবনে সংলগ্ন।

কালের চাকা ঘুরেছে। মানুষের আত্মশক্তি জেগেছে। প্রকৃতির প্রভু হয়েছে সে। কলে-কৌশলে, জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, প্রত্যয়ে প্রজ্ঞায় হয়েছে সে পাকা, তাই তার মন-মনন থেকে—ফলে তার সাহিত্য থেকে দেও দেবতা, রাক্ষস-খোক্কস গেছে উবে। বিভিন্ন শাস্ত্রীয়, সরকারী, সামাজিক ও আর্থিক তথা জীবিকাগত প্রতিবেশে তার সাহিত্যের অঙ্গগত, রসগত, বিষয়গত, বক্তব্যগত রূপান্তর ঘটেছে। এমনি করে চিরকাল ঘটবে। যেমন সুখী সমাজের সুখী মানুষ ফুল-পাখি-প্রেম-প্রকৃতি ও বিশ্বতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব, মনস্তত্ত্বের মধ্যে ভাব-ভাবনা নিয়োজিত রাখবে, দুঃখী মানুষ ভাত-কাপড়ের অভাবজাত যন্ত্রণার কথা লিখবে, নিপীড়িত দরিদ্র মানুষ শোষণ-পেষণের বিরুদ্ধে এবং বণ্টনে বাঁচার কথা বলবে, বিপ্লবের সময় বিদ্রোহের বাণী শুনাবে এবং যুদ্ধকালে উত্তেজনাকর গান গাথা হবে রচিত। যেহেতু কোন দেশে কালে সব মানুষ সমভাবে বিকশিত থাকে না, জ্ঞান-বুদ্ধি-রুচি কখনো অভিন্ন হয় না, সেজন্যে যে-কোন দেশে ও কালে সামগ্রিক জীবন-প্রবাহে নানা বিরুদ্ধ মত ও মনের দ্বান্দ্বিক সহাবস্থান অবশ্যম্ভাবী, কেউ শাস্ত্রীয় জীবনে, কেউ সরকার-তোষণে, কেউ সমাজানুগত্যে যেমন ইষ্ট কামনা করবে, তেমনি বিচলনে, দ্রোহে, নয়া মত-পথের সন্ধানে, জীবন ও সমাজের তাৎপর্য সন্ধিৎসায়ও থাকবে নিরত। উল্লেখ্য যে, নতুন শর্ত নতুন মন, নতুন মানুষ তৈরী করে। আবর্তন নয়—বিবর্তন ও পরিবর্তনই জগতের ও জীবনের নিয়ম। আবর্তনে স্থানকাল বদলায় কিন্তু বিকাশ বা উন্নতি হয় না, বরং জীর্ণতা ও জড়তা আসে ঐ পথেই।

আমাদের কাব্যের বিকাশধারায়ও ঐ সব লক্ষণ বিদ্যমান, দস্তুর ভাঙ্গে কেবল নির্বোধই ক্ষেপে উঠে, মনে করে অনাচার। কাজেই বিগত দিনের কাব্য যেমন আজ অচল, আজকের কাব্যও তেমনি আগামীকালের কোন প্রয়োজন পূরণ করতে পারবে না। শুধু কাব্যের ক্ষেত্রে নয়, জীবনের কোন ক্ষেত্রেই কোন পুরোনো নতুনের চাহিদা মিটাতে পারে না, কোন অতীত পারে না বর্তমান হতে। নতুন দিনে, নতুন পরিবেশে নতুন মানুষের কণ্ঠে স্বকালের মানুষের মনের কথা, প্রয়োজনের কথা, কামনা-বাসনার কথা ধ্বনিত হবে। সে-উচ্চারিত বাণীর রূপ, রস ও সুর হবে ভিন্ন। এভাবেই তো মানুষের সমাজ-সভ্যতা এগিয়েছে। এরই নাম চলমানতা ও প্রগতি।

সাহিত্যে মনস্তত্ত্বের ব্যবহার

আগেকার দিনে মানুষ ঘরোয়া ও সামাজিক জীবনে সহাবস্থানের প্রয়োজনে কতকগুলো নিয়মনীতি ও আদর্শের বাঁধনে নিজেদের জীবন নিয়ন্ত্রিত করত। এবং ঐ নীতি-আদর্শের কাঠামোর মধ্যেই তাদের শিল্প-সাহিত্যাদি প্রায় সব কলাই রূপায়িত হত। তাই পূর্বকালে ন্যায়-অন্যায় বা ভালমন্দ প্রতিপাদন উদ্দেশ্যেই সাধারণত সাহিত্য রচিত হত। ফলে সেকালের ছাঁচে-ঢালা সাহিত্য ছিল ঘটনাপ্রধান, অর্থাৎ বাহ্য ঘটনা ও আচরণের স্থূলচিত্র দানই ছিল লক্ষ্য। মানুষের মন তেমন গুরুত্ব পেত না। তাই রস বলতে শৃঙ্গারাদি নানা রসের সমাবেশ থাকত বটে, কিন্তু জীবনরস থাকত স্বল্প ও গৌণ। তবু সেকালের কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন লিখিয়েরা স্ব স্ব জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি দিয়ে চরিত্রের মনের সঙ্গে বাহ্যাচরণের সঙ্গতি রক্ষার চেষ্টা করতেন। এতেই তাঁদের রচনা কালজয়ী উৎকর্ষ লাভ করত। শেক্সপীয়ার, ভিক্টর হুগো, মোপাসাঁ, ডিকেন্স কিংবা ডস্টয়েভস্কী প্রভৃতি অনেকেই তাই লোকবন্দ্য শিল্পী।

মেঘ-বৃষ্টি-রোদ, সুবাস-দুর্বাস, সুন্দর-কুৎসিত, লোভ-ক্ষোভ অসূয়া কিংবা আরাম-আনন্দ-আকর্ষণ যে মানুষের মন ও আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে বা মানুষের শারীরিক, মানসিক ও প্রাতিবেশিক অবস্থান যে মানুষের ভাব-চিন্তা-কর্ম নিয়ন্ত্রণ করে, ফ্রয়েডীয় বা এখনকার মনোবিজ্ঞান না জেনেও তাঁরা তা বুঝেছিলেন। মন ও বাহ্যাচরণের মধ্যে যে কারণ-ক্রিয়া সম্বন্ধ রয়েছে, তা' সেকালে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করা সম্ভব ছিল না বটে, কিন্তু মানুষ সহজবুদ্ধি দিয়ে তা' বুঝত। এজন্যে সাহিত্যে-শিল্পে যা অস্বাভাবিক, যা পারিবেশিক কারণে অসঙ্গত, তা কখনো লোকগ্রাহ্য হত না।

ফ্রয়েড মানুষের অবচেতন প্রবৃত্তি ও যৌনবোধকে আত্যন্তিক গুরুত্ব দিয়ে এই শতকে এক নতুন তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করলেন। বিভিন্ন প্রতিবেশে অবদমিত মনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার বিস্ময়কর সব তত্ত্ব ও তথ্য উদ্‌ঘাটন করে একালের

মানুষকে তিনি মাতিয়ে দিলেন। যুক্তি-প্রবৃত্তির লীলার সে-চমকপ্রদ তথ্য ও তত্ত্ব আধুনিক মানুষের মন হরণ করল। আর এই তত্ত্বের প্রয়োগে মানুষের ভাব-চিন্তা-কর্ম ও আচরণের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দেয়ার ও তাৎপর্য নিরূপণের প্রবণতা প্রায় সব লিখিয়ের মধ্যে অল্পবিস্তর দেখা দিল। আজ যদিও ফ্রয়েডীয় তত্ত্বের যাথার্থ্য তর্কাতীত নয় এবং অন্য মনোবিজ্ঞানীরা নতুনতর এবং বিশুদ্ধতর তথ্য আবিষ্কারের দাবিদার, তবু সাহিত্যশিল্প ক্ষেত্রে নতুন জীবনদৃষ্টি প্রাপ্তির জন্যে এবং নতুন যুগ সৃষ্টির জন্যে আঁকিয়ে লিখিয়েরা ফ্রয়েডের কাছে অপরিশোধ্যভাবে ঋণী।

এমনি করে পুরোনো বিশ্বাস-সংস্কারসংলগ্ন জীবন-প্রত্যয় গেল উবে। নতুন প্রত্যয়-প্রসূত জীবনজিজ্ঞাসা ও জীবনদৃষ্টি যে-মূল্যবোধ জাগাল, যে-সংস্কৃতির জন্ম দিল, তাতে সেকাল ও একালের যোগসূত্রটি গেল হারিয়ে। ফলে বহুযুগের অভ্যস্ত নিয়মনীতি ও মূল্যবোধ ঐ নব-চেতনার অভিঘাতে বিপর্যস্ত হয়ে গেল ; পুরোনো মানুষ নতুনের সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারল না। তাই চেতনার এ বিপ্লবকে তারা মনে করল উপদ্রব, তরুণদের জানল সামাজিক উপসর্গ বলে, বিপ্লব হল উপপ্লব। পরিবর্তমান সমাজের এ অসঙ্গতি ও দ্রোহ সনাতন নিয়ম-নিশ্চিত নিস্তরঙ্গ জীবনে আনল এক অনিশ্চয়তা—যা সনাতনীরা চিহ্নিত করল বৈনাশিক বিচলন বলে।

তবু সামাজিকভাবে মানুষের জীবনে এল প্রগতি, আত্মা হল উন্নত, বিবেক হল প্রবল, সংস্কৃতি পেল উৎকর্ষ। কেননা, রক্তমাংসের মানুষ এই প্রথম জৈবজীবনকে অকপটে স্বীকার করে নিল। মানুষ যে নিয়মনীতি-আদর্শের আদলে গড়া পুতুল নয়, তার যে বোধবুদ্ধির বিকাশ ও বৈচিত্র্য রয়েছে, এক-একটি মানুষ যে এক-একটি স্বতন্ত্র জগৎ এবং সে-জগৎ যে বরণ-বিচ্যুতি ও ভালোমন্দ নিয়েই সামগ্রিক সত্তায় একটি বিশিষ্ট আশ্চর্য সৃষ্টি, তা' এ-যুগে প্রথম সাধারণভাবে স্বীকৃতি পেল।

আগেকার দিনে মানুষকে নিছক ভালো কিংবা অবিমিশ্র মন্দ বলে চিহ্নিত করা হত। সাহিত্যে নিখুঁত ন্যায় ও নির্ভেজাল অন্যায়ই কেবল দেখতে পেতাম। ফলে সদুদ্দেশ্যেই কৃত্রিম তৌলে মানুষকে যাচাই করতে যেয়ে চিরকাল লক্ষকোটি মানুষকে নির্যাতিত করেছি, হরণ করেছি কত মানুষের বাঁচার অধিকার।

মনোবিজ্ঞান অধ্যয়নের ফলে আজ জেনেছি—মানুষের ভাব-চিন্তা-কর্ম বিভিন্ন মানস-কারণ ও প্রতিবেশের প্রসূন। মানুষ তার অনেক কর্ম ও আচরণের ব্যাপারে অবস্থার দাস। স্বভাবেও সে পুরো স্বাধীন নয়। তাই মানুষ ভালোও নয়, মন্দও নয়, কখনো ভাল, কখনো মন্দ, কারো কাছে ভাল, কারো কাছে মন্দ। কারো মিত্র, কারো শত্রু। আপেক্ষিকতার এ বোধে উত্তরণ ঘটেছে বলেই আজ আমরা অধিক সহিষ্ণু, সহজেই ক্ষমাশীল, বেশী প্রীতিপরায়ণ ও সহাবস্থানের অনেক বেশী যোগ্য হয়ে উঠেছি। মানবিক বোধের ও মানববাদের বিকাশ মনস্তত্ত্বজ্ঞানের ফলে দ্রুততর হয়েছে। জগৎ ও জীবন এবং নর ও নারায়ণ সম্পর্কে এই উদার ও সহিষ্ণু দৃষ্টি ফ্রয়েডীয় বিজ্ঞানের বহুলচর্চার ফলেই সম্ভব হয়েছে।

আমাদের দেশে ত্রিশোত্তর সাহিত্যে ও শিল্পে ফ্রয়েডীয় তত্ত্বের বহুল প্রয়োগ শুরু হয়। কিন্তু আঁকিয়ে লিখিয়েদের নিষ্ঠ অধ্যয়ন ও আন্তরিক অনুধ্যানের অভাবে প্রয়োগ ও বিশ্লেষণক্ষেত্রে বঙ্কিমের রোহিণী হত্যার মতো আনাড়িপনার স্বাক্ষরই বেশী দেখা যায়। সুষ্ঠুভাবে অধিগত বিদ্যার প্রয়োগ-নৈপুণ্য কচিৎ নযরে পড়ে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, রবীন্দ্রনাথের আপদ, রোববার, ল্যাবরেটরী প্রভৃতি বহু গল্পে, ঘরে বাইরে উপন্যাসে, তারাশঙ্করের কালাপাহাড়, পিতাপুত্র, আরোগ্যনিকেতন প্রভৃতি অনেক রচনায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যো-পাধ্যায়ের পথের পাঁচালী, আরণ্যক কিংবা বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের নীলাঙ্গুরীয়, রাণুর প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রাগৈতিহাসিক, শৈলজশিলা, পুতুলনাচের ইতিকথা, মণি গঙ্গোপাধ্যায়ের রমলা, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র চাঁদের অমাবস্যা কিংবা কাঁদো নদী কাঁদো প্রভৃতি গল্পে-উপন্যাসে এবং সৈয়দ শামসুল হক, হাসান আজিজুল হক প্রভৃতি অনেক তরুণের রচনাতেই মনস্তত্ত্বের সুপ্রয়োগ লক্ষণীয়। এক কথায় আজকের উল্লেখযোগ্য জনপ্রিয় গল্প-উপন্যাস-লেখক মাত্রেরই উৎকৃষ্ট রচনায় মনস্তত্ত্বের সুসঙ্গত প্রয়োগ দুর্লভ নয়।

বাঙলায় তত্ত্বসাহিত্য

জগৎ ও জীবন সম্পর্কে কোন মানুষই উদাসীন থাকতে পারে না। জীবন-ভাবনা ও জগৎ রহস্য তাকে জন্মকাল থেকেই বিচলিত রাখে। তার মনের কৌতুহল ও জিজ্ঞাসা সে তার জ্ঞান বুদ্ধি দিয়ে চরিতার্থ করার প্রয়াসী। যে কোন জিজ্ঞাসার মনোময় উত্তর খোঁজা ও তৃপ্তিকর একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছা তার পক্ষে তার আত্মার আরামের জন্যে আবশ্যিক হয়ে উঠে। এই অর্থেই মানুষমাত্রই দার্শনিক। কিন্তু আদিকালের ভয়, বিস্ময় ও কল্পনাপ্রবণ অজ্ঞ মানুষ স্থূল বুদ্ধি ও মোটা কল্পনা দিয়ে জগৎ ও জীবন, সৃষ্টি ও স্রষ্টা এবং বিশ্ব-নিয়মের কার্যকারণ সম্পর্কে যে সব মীমাংসায় ও সিদ্ধান্তে উপনীত হল, ক্বচিৎ উপলব্ধির চমকপ্রদ কিছু দীপ্তি থাকলেও তার মধ্যে তথ্য যেমন বিরল, চিন্তা ও যুক্তির স্থূলতা এবং অসারতাও তেমনি প্রকট।

সব মানুষের বুদ্ধি বিবেচনা, রুচি কৌতুহল এক রকমের নয়, এক মাপেরও নয়। তাই মানুষের রহস্য চেতনা, এবং তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্ত বিভিন্ন ও বিচিত্র রূপ লাভ করেছে। দেশে দেশে, কালে কালে, গোত্রে গোত্রে ও শাস্ত্রে শাস্ত্রে তাই মানুষের তত্ত্ববুদ্ধি বহু ও বিচিত্র হয়ে প্রকাশ ও বিকাশ পেয়েছে। বহু যুগের বহু মানবের অনবরত প্রয়াসে ও মননশক্তির উৎকর্ষে এবং জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রসারে জগৎ ও জীবন, সৃষ্টি ও স্রষ্টা সম্পর্কিত তত্ত্বচিন্তা কয়েকটি বিশেষ সূত্রে সংহত হলেও, তা কখনো সর্বমানবিক কিংবা সর্বসম্মত তত্ত্বের মর্যাদা পায়নি। কখনো পাবেও না হয়তো। তাই দর্শন মাত্রই বিতর্কিত ও তর্কসাপেক্ষ বিষয়। সীমিত শক্তির ইন্দ্রিয় দিয়ে অতীন্দ্রিয়ের ধারণা কখনো পূর্ণ ও নির্ভুল হতে পারে না। তাই দর্শনে তথ্য ও তত্ত্ব বিমিশ্র হয়ে অভিন্ন সত্য হয়ে উঠে না। দার্শনিক যুক্তিও তাই প্রায়ই একদেশদর্শিতা দোষে দুষ্ট। অদৃশ্যকে কথা দিয়ে দৃশ্যমান করা, অধরাকে বাক্‌চাতুর্যে ধরা,

অবোধ্যকে যুক্তি দিয়ে বোধগত করা, পুতুলে হাত-পা-চোখ বসিয়ে প্রাণপ্রতিষ্ঠার দাবি করার নামান্তর মাত্র। তবু জীবন-চেতনা ও জগৎ-জিজ্ঞাসা মানুষ মাত্রেরই স্বভাবজ বলে মানুষ রহস্য আবিষ্কার প্রয়াসে চির অক্লান্ত। কেননা, ক্ষণে ক্ষণে সে অনুভব করে—জীবনের মূল রয়েছে কোন এক রহস্যলোকে, গতি হচ্ছে এক অদৃশ্যজগতে এবং সম্ভাবনা তার বিপুল ও অনন্ত। তাই অসীমের সীমা খোঁজা, অজানাকে জানা, অদৃশ্যকে দেখা তার চির অসাফল্যে বিড়ম্বিত মায়াবী আকাঙ্ক্ষার অন্তর্গত। 'অকূলে কূল পাবার, অসীমের সীমা খোঁজার, অরূপের রূপ দেখার আকুলতা প্রকাশেই এর সার্থকতা। কেননা, এতেই আত্মার আকুতি আনন্দময় প্রয়াসে নিঃশেষ হবার সুযোগ পায়। ইরানী কবির জবানীতে জগৎ হচ্ছে একটি ছেঁড়া পুথি—"এর আদি গেছে হারিয়ে, অন্ত রয়েছে অলেখা'। কাজেই এর আদি অন্তের রহস্য কোন দিনই জানা যাবে না। তবু অবোধ মন বুঝ মানে না, তাই ঘরও নয় গন্তব্যও নয়, পথে নেমে, পথ চলে, পথের দিশা খুঁজে, পথ বাড়ানোর ক্ষ্যাপামি তাকে পেয়ে বসে। এই মোহময়ী মরীচিকাই দিগন্তহীন আকাশচারিতার আনন্দে অভিভূত রাখে। জীবনে এই আকাঙ্ক্ষার প্রদীপ্ত আবেগ, এই আনন্দিত অভিভূতিই যথার্থ লাভ। কেননা, বিবেকের বোধনে, আত্মার উৎকর্ষসাধনে ও বিকাশে এবং শ্রেয়সে উত্তরণে এই ভাব চিন্তা ও অনুভব উপলব্ধিই পুঁজি।'

জগৎ ও জীবনের নিয়ামক ও তাৎপর্য সন্ধান করতে যেয়ে মানুষ সৃষ্টি করেছে ভূত-প্রেত, দেও দানু, জীন-পরী, দেবতা অপদেবতা, হুর-গন্ধর্ব অপ্সরা, স্বর্গ নরক, পাপ-পুণ্য প্রভৃতির হাজারো বিশ্বাস সংস্কার-সমন্বিত ইমারত। এর মধ্যেই নিশ্চিত বিশ্বাসে নিশ্চিন্ত সুস্থিরতায় স্বস্থ জীবনধারণের আশ্বাসে মানুষ স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বাস্থ্য উপভোগে প্রয়াসী। এমনি করে জীবনকে অজানা থেকে অসীমতায় প্রসারিত করে মানুষ তার যৌথ জীবনে ও জীবিকায় নিরাপত্তা ও স্বাচ্ছন্দ্য-সাচ্ছল্য কামনা করেছে। তারই ফলে বিবর্তিত ও বিকশিত হয়েছে শাস্ত্র, সমাজ, সংস্কৃতি ও সভ্যতা। গড়ে উঠেছে জাত-ধর্ম-রাষ্ট্র, আনুষঙ্গিক ভাবে এসেছে ঈর্ষা-অসূয়া ঘৃণা, প্রীতি-সেবা ত্যাগ। মানুষ হয়েছে ইষ্ট ও অরি। বহু যুগের বহু মানুষের সাধনায় ও দ্বন্দ্ব-মিলনে মানবসমাজ আজকের

স্তরে উত্তীর্ণ হয়েছে। যদিও সব মানুষের ও সব সমাজের বা গোত্রের উত্তরণ সমপর্যায়ের নয়। আদিম আরণ্য-মানব যেমন রয়েছে, তেমনি প্রাগ্রসর মানুষেরও অভাব নেই। তার কারণ, সব মানুষের প্রতিবেশ ও মনন-শক্তি সমভাবে বিকাশ-পথ পায়নি। স্থূল চিন্তার স্বাক্ষর আজো তাই প্রকট। বিশেষ করে শাস্ত্রীয় চিন্তার স্থূলতা ও সংস্কার থেকে অধিকাংশ মানুষ মুক্ত নয় বলে মানবভাগ্য ও তার জীবন-জীবিকার যন্ত্রণা, তার শাসন-পেষণ-শোষণের বিকার আজো অপরিবর্তিত রয়ে গেছে। দ্বন্দ্ব সংঘাত সংঘর্ষও রয়েছে পূর্ববৎ। তবু মানবভাগ্যের নিয়ামক নিয়ন্তা হিসেবে দর্শন ও দার্শনিকের ভূমিকা কখনো গুরুত্ব হারাবে না। মানবপ্রগতি চিরকালই তত্ত্বচিন্তার প্রসূন হয়ে থাকবে। কেননা মানুষ বাঁচে প্রত্যয় ও প্রত্যাশা নিয়ে। এবং এ দুটোই জন্মে চিত্তলোকে। এগুলো যুক্তিজাত নয়, বাঁচার গরজপ্রসূত। জন্ম-মৃত্যুর পরিসরাতীত অনন্ত জীবন তৃষ্ণাই মানুষকে প্রত্যয়ী ও প্রত্যাশী রাখে।

বাঙলাদেশের মুসলমানের তত্ত্বচিন্তা তিন ধারায় প্রকাশিত হয়েছে—ক. শাস্ত্র সংলগ্ন রচনায় তথা ধর্ম-সাহিত্যে, খ. যোগতান্ত্রিক চর্যা গ্রন্থে তথা সূফী সাহিত্যে এবং গ. সওয়াল সাহিত্যে।

ক. ধর্ম সাহিত্যে উল্লেখ্য হচ্ছে :

নেয়াজ ও পরানের (১৭ শতক) কায়দানি কেতাব, খোন্দকার নসরুল্লাহর (১৭ শতক) হেদায়তুল ইসলাম, শরীয়ৎ নামা, শেখ মুত্তালিবের (১৬৩৯ খৃঃ) কিফায়তুল মুসল্লিন, আলাউলের (১৬৬৪ খ্রীঃ) তোহফা, আশরাফের (১৭ শতক) কিফায়তুল মুসল্লিন, খোন্দকার আবদুল করিমের (১৮ শতক) হাজার মসায়েল, আবদুল্লাহর (১৮ শতক) নসিয়ত নামা, কাজী বদিউদ্দীনের (১৮ শতক) সিফৎ ই ইমান, সৈয়দ নাসির উদ্দীনের (১৮ শতক) সিরাজ সবিল, মুহম্মদ মুকিমের (১৮ শতক) ফায়দুল মুবতদী, বালক ফকিরের (১৮ শতক) ফায়দুল মুবতদী, সৈয়দ নুরুদ্দীনের (১৮ শতক) দাকায়েকুল হেকায়েক, মুহম্মদ আলীর (১৮ শতক) হায়রাতুল ফিকাহ্, হায়াত মাহমুদের (১৮ শতক) হিত জ্ঞানী বাণী, আফজল আলীর (১৮ শতক) নসিয়তনামা প্রভৃতি। এ সব গ্রন্থের সব কথা কোরআন-হাদিস অনুগ নয়, সদুদ্দেশ্যে বানানো নানা কথাও রয়েছে।

দৈশিক ও লৌকিক বিশ্বাস-সংস্কারের প্রভাবও প্রবল। শাস্ত্র-কথার সঙ্গে মিশে রয়েছে সৃষ্টিতত্ত্ব, অধিবিদ্যা এবং দ্বৈতাদ্বৈত তত্ত্ব প্রভৃতি। এসব গ্রন্থে সাধারণভাবে স্রষ্টার প্রতি মানুষের শাস্ত্রসম্মত আনুগত্য, দায়িত্ব ও কর্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তির নৈতিক, পারিবারিক ও সামাজিক তথা মানবিক আচার আচরণবিধি আলোচিত হয়েছে।

খ. সূফী সাহিত্যে মূল্যবান রচনা হচ্ছে :

ফয়জুল্লাহর (১৬ শতক) গোরক্ষ বিজয়, অজানা লেখকের যোগকলন্দর, মীর সৈয়দ সুলতানের (১৬ শতক) জ্ঞান প্রদীপ জ্ঞানচৌতিশা, হাজী মুহম্মদের (১৬ শতক) সুরত নামা বা নূরজামাল, মীর মুহম্মদ সফীর (১৭ শতক) নূরনামা, শেখ চান্দের (১৭ শতক) হর-গৌরী সম্বাদ ও তালিবনামা, নিয়াজের (১৭ শতক) যোগকলন্দর, আবদুল হাকিমের (১৭ শতক) চারি মোকামভেদ ও শিহাবুদ্দীন নামা, আলীরজার (১৮ শতক) আগম ও জ্ঞানসাগর, বালক ফকিরের (১৮ শতক) জ্ঞান চৌতিশা, মোহসীন আলীর (১৮ শতক) মোকামমঞ্জিল কথা, শেখ জাহিদের (১৭ শতক) আত্ম পরিচয়, শেখ জেবুর (১৮ শতক) আগম, শেখ মনসুরের (১৮ শতক) সির্নামা, রমজান আলীর (১৯ শতক) আত্মবাক্য, রহিমুল্লাহর (১৯ শতক) তনতেলাওত ও সিহাবুল্লাহর যুগীকাচ। যোগচর্যা-নির্ভর অধ্যাত্ম সাধনার কথাই এ সব গ্রন্থে আলোচিত। এ সব গ্রন্থে বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য দেহতত্ত্ব এবং সূফীর ফানা, বৌদ্ধ নির্বাণ আর অদ্বৈততত্ত্ব প্রভৃতি উচ্চ ও সূক্ষ্ম দার্শনিক প্রত্যয়গুলির ইঙ্গিত রয়েছে। শেখ ফয়জুল্লাহ, হাজী মুহম্মদ, সৈয়দ সুলতান, আলী রজা ও শেখ চান্দ অধ্যাত্মদর্শনে পণ্ডিত ছিলেন। বিশেষ করে শেখ ফয়জুল্লাহ, হাজী মুহম্মদ ও আলী রজা ছিলেন উচ্চ ও সূক্ষ্ম মনন শক্তির অধিকারী। অধ্যাত্মসাধনার ও সিদ্ধির তথা মারিফৎ পন্থা ও চর্যার তত্ত্ব এবং সে সূত্রে সৃষ্টিতত্ত্ব, দেহতত্ত্ব, স্রষ্টাতত্ত্ব মোক্ষতত্ত্ব প্রভৃতিই এসব গ্রন্থের মূল আলোচ্য বিষয়। এতেও বিশ্বাস-সংস্কারের প্রবলতা যেমন প্রকট, তেমনি ইসলামী ও বৌদ্ধ-হিন্দুয়ানী তত্ত্বচিন্তা আর সাধনতত্ত্বের অসঙ্গত ও অসমঞ্জস মিশ্রণও অবিরল।

এ ছাড়া প্রণয়োপাখ্যানগুলোতেও কোন-না কোন প্রসঙ্গে যোগী ও যোগচর্যা এবং অধ্যাত্মতত্ত্ব আলোচিত হয়েছে। অভেদ বা অদ্বৈততত্ত্ব

প্রায় সব বাঙালী তথা ভারতিক মুসলমানের মন হরণ করেছিল। প্রণয়োপাখ্যানে এবং মুসলিম রচিত রাধাকৃষ্ণ পদে ও বাউল গানে আহাদ ও আহমদকে প্রায় সর্বত্র অভিন্ন করে দেখা হয়েছে। সৃষ্টিতত্ত্বেও আল্লাহর নূরে মুহম্মদ এবং তাঁর নূরে বিশ্বজগৎ সৃষ্টি বলে বর্ণিত হয়েছে। এতে 'কুন ফায়াকুন'এর নয়—'একোহম বহুস্যাম' তত্ত্বের প্রভাবই সুস্পষ্ট।

গ, সওয়াল-সাহিত্যে পাই:

মুহম্মদ আকিলের (১৭ শতক) মুসানামা, খোন্দকার নসরুল্লাহ (১৭ শতক) মুসার সওয়াল, আলিরজার (১৮ শতক) সিরাজ কুলুব, শেখ সাদীর (১৭ শতক) গদামালিকার সওয়াল, এতিম আলমের (১৮ শতক) আবদুল্লাহর সওয়াল, সৈয়দ নুরুদ্দিনের (১৮ শতক) মুসার সওয়াল, অজানা কবির মুসার রায়বার, খোন্দকার আবদুল করিমের (১৭ শতক) মুসার সওয়াল, সেরবাজ চৌধুরীর (১৮ শতক) মালিকার সওয়াল বা ফকর নামা প্রভৃতি।

এ সব গ্রন্থ প্রশ্নোত্তরের বা সওয়াল জওয়াবের আকারে রচিত বলেই আমরা এগুলোকে সওয়াল সাহিত্য নামে অভিহিত করেছি। এসব গ্রন্থে সৃষ্টি, স্রষ্টা, ইহকাল-পরকাল, পাপ পুণ্য, ন্যায় অন্যায়, জীবন, সমাজ, শাস্ত্র, নীতি, আচার আচরণ, বৈষয়িক, আত্মিক, আধ্যাত্মিক এমন কি ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক বিষয়েও নানা জিজ্ঞাসার উত্তর রয়েছে। 'আবদুল্লাহর সওয়ালে' ইহুদীরাজ আবদুল্লাহ কর্তৃক হযরত মুহম্মদের নবুয়ত পরীক্ষাচ্ছলে নানা তথ্য ও তত্ত্ব উপস্থাপিত হয়েছে। গদা মালিকা, বা মালিকার সওয়ালে রাজ্ঞী মালিকা তাঁর পাণিপ্রার্থী জ্ঞানী পুরুষ হালিম বা আলিমের বিদ্যা ও বিজ্ঞতা পরীক্ষাচ্ছলে যে সব প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন, সে-সবের উত্তর রয়েছে। এখানে রয়েছে হেঁয়ালী বা ধাঁধা থেকে নানা সাধারণ জাগতিক জ্ঞানের সন্নিবেশ। এসব গ্রন্থ সেকালের মানুষের পক্ষে জ্ঞানের আকর। সেকালের এগুলো ছিল একালের 'লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা'র মতো। লোক-সাধারণ এসব গ্রন্থের মজলিসি পাঠ শুনে শুনে নৈতিক, সামাজিক, বৈষয়িক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভ করে নিরক্ষর সমাজের সুশিক্ষিত সদস্য হয়ে উঠত। তাদের জীবন-ভাবনা ও জগৎ-জিজ্ঞাসা এসব গ্রন্থোক্ত তথ্যে ও তত্ত্বে নিবৃত্ত হত। অবশ্য সেদিন মানুষের বিচরণ ক্ষেত্র ছিল অঞ্চলে সীমিত। সে জীবনের পরিধি ছিল সংকীর্ণ;

সে-জ্ঞানের পরিসরও ছিল ক্ষুদ্র এবং জ্ঞানও ছিল খণ্ড সত্যে বা প্রাতিভাসিক সত্যে নিবদ্ধ।

আকর গ্রন্থ :

১। পুথিপরিচিতি : আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ সংকলিত, আহমদ শরীফ সম্পাদিত, বাঙলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত : ১৯৫৭ সন।

২। বাঙলার সুফী সাহিত্য : আহমদ শরীফ, বাঙলা একাডেমী

৩। সওয়াল সাহিত্য : ঐ ঐ প্রকাশিতব্য।

বাঙলাদেশের 'সঙ' প্রসঙ্গে

মানুষের ভাব-চিন্তা-কর্ম মাত্রই জীবন ও জীবিকাসংপৃক্ত। জীবনের জীবিকা দু'রকমের—একটা শারীর ক্ষুধা-তৃষ্ণা সম্পর্কিত, অপরটি বৃত্তি-প্রবৃত্তি সংপৃক্ত। স্বাভাবিক জীবনের জন্যে দুটোই প্রয়োজন। অবশ্য সুলভতা ও দুর্লভতার নিরিখে মানুষ তার প্রয়োজনকে লঘু ও গুরু কিংবা উচ্চ ও তুচ্ছ শ্রেণীতে বিন্যস্ত করে দেখতে ও ভাবতে অভ্যস্ত। তাই বলে মানুষের কোন চাহিদার তাত্ত্বিক গুরুত্ব কমে না।

বাঁচার প্রয়াসের মধ্যে বাঁচাই হচ্ছে জীবন। এ তাৎপর্যে জীবন সংগ্রামেরই নামান্তর। একাকীত্বে মনুষ্যজীবন অসম্ভব বলেই যৌথজীবনে প্রয়োজন হয়েছে—শান্তি ও সংহতি। অপরের উপর বিশ্বাস ও ভরসা রেখে, নির্ভর করেই মানুষকে সংযম, সহিষ্ণুতা, সহাবস্থান ও সহযোগিতার অঙ্গীকারে বাঁচতে হয়। কাজেই শান্তি, সংহতি ও সহযোগিতা যৌথজীবনে ব্যক্তিক জীবন ও জীবিকার জন্যে একান্ত আবশ্যিক।

এ উপলব্ধি থেকেই আদিম নরগোষ্ঠীর মধ্যেও আমরা গোত্রীয় সংহতির গুরুত্ব-চেতনা দেখতে পাই। সংহতি-শান্তি রক্ষার গরজেই তৈরী হয়েছিল নিয়ম-নীতি, রীতি-রেওয়াজ, আচার ও আচরণ পদ্ধতি। এভাবেই ক্রম-বিকাশের ধারায় গড়ে উঠেছে শাস্ত্র, সমাজ ও সরকার।

উক্ত ত্রিবিধ শাসনেও মানুষকে সংযত-শায়েস্তা রাখা পুরোপুরি সম্ভব হয়নি কোনকালেই। শাস্ত্রীয়-সামাজিক-সরকারী শাসন-পীড়নকে তাচ্ছিল্য করে যুগে যুগে দেশে দেশে দ্রোহীরা নিয়ম-নীতি, শাসন-শৃঙ্খলা ভেঙে উপদ্রব-উপপ্লব সৃষ্টি করেছে। তাই মানুষের সমাজে কখনো নির্দ্বন্দ্ব নির্বিঘ্ন সুখ-শান্তি-আনন্দ-আরাম ভোগ করা কোন মানুষের পক্ষেই সম্ভব হয়নি।

সমাজ-প্রহরীরূপে কিছু মানুষ চিরকালই সদাসতর্ক ও সদাশঙ্কিত দৃষ্টি রেখেছে শাস্ত্রীয়, সামাজিক ও সরকারী নিয়ম-নীতি রক্ষার ও মানানোর কাজে। এঁরাই হলেন গম্ভীর প্রকৃতির শাস্ত্রী, সমাজপতি ও রাষ্ট্রনায়ক।

অন্য অসংখ্য মানুষ যারা এ দায়িত্ব স্বীকার করেনি, তারা জগৎ ও জীবনের প্রতি তাকিয়েছে কৌতুক, বিস্ময় ও জিজ্ঞাসা নিয়ে। জগৎ ও জীবনের অন্ধি-সন্ধির অন্তত কিছুটা বোঝা সম্ভব হয়েছে কেবল এদের পক্ষেই। কেননা মনটা পুরো খোলা না থাকলেও চোখ তাদের খোলা থাকেই। আর মনের পুরো সহযোগিতা থাকে না বলে তাৎপর্য-চেতনায় তথা কারণ-ক্রিয়াবোধে ত্রুটি থাকলেও নির্ভুল অনুকরণ সম্ভব।

কৌতূহলী মানুষের কৌতুক বোধের প্রসূন হচ্ছে অনুকরণ-স্পৃহা। এই স্পৃহার অভিব্যক্তি ঘটেছে দু'প্রকারে; একটি আদিরসাত্মক, তার প্রকাশ মস্করায়, অন্যটি নিন্দাত্মক, তার প্রকাশ ঠাট্টায়, বিদ্রূপে, ব্যঙ্গে, উপহাসে ও পরিহাসে। উচ্চারিত ধ্বনি যোগে, ভেংচি বা মুখভঙ্গি যোগে, অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে অপরের অনুচিত কথার, কর্মের ও আচরণের অসঙ্গতির অনুকৃতি তাই প্রাগৈতিহাসিক। গোড়ায় যা নির্লক্ষ্য, নিরুদ্দিষ্ট, অনাবিল কৌতুকরস উপভোগের জন্যে শুরু হয়েছিল, তা-ই ক্রমে শাস্ত্র-সমাজ-সরকার স্বার্থে নীতিবোধ জাগানো লক্ষ্যে নিয়োজিত হয়। নিন্দাত্মক ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ-পরিহাস মাধ্যমে চরিত্রশোধনের মতো মহৎ উদ্দেশ্যে এই শিল্প-চেতনাকে কাজে লাগানো শুরু হল এভাবেই। সামাজিক শাসনের মতো এ সামাজিক নিন্দা-বিদ্রূপ সমাজ-স্বাস্থ্য ও ব্যক্তি-চরিত্র অক্ষুণ্ণ রাখার জন্যে প্রয়োজন হয়েছে। কেউ যে সচেতনভাবে সমাজ-কল্যাণের মহৎ লক্ষ্যে এ নিন্দা-বিদ্রূপ পরিহাস শুরু করেছিল, তা হয়তো সত্য নয়, কিন্তু ক্রমে তার সামাজিক উপযোগ অবচেতন ভাবেই হয়তো অনুভূত হয়। পৃথিবীর সর্বত্রই তাই এরূপ বিদ্রূপাত্মক রচনা গান, গাথা, ছড়া, কিংবদন্তী ও প্রহসন রূপে চালু রয়েছে।

আমাদের দেশে বৌদ্ধযুগে সামাজিক শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্যে নিয়ম-নীতি লঙ্ঘনকারীকে লজ্জা দিয়ে, তার নিন্দা রটিয়ে কলঙ্কিতের দুর্বহ জীবনযাপনে বাধ্য করা হত। 'ধর্মঘট' ও 'হাটে হাঁড়ি ভাঙা' এ দুই

অনুষ্ঠানই বাঙলার বৌদ্ধযুগের। তাছাড়া শাসিতজনের অপরাধে মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে গাঁ-ছাড়া করে কিংবা মিসিল করে তাকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দৃষ্টান্তিক শাস্তির মাধ্যমে গণমনে নৈতিকতা ও সংযমের গুরুত্ব-চেতনা দেয়া হত। সমাজের ধনী-মানী-বলীকে শায়েস্তা করবার অন্য কোন উপায় সেকালেও ছিল না, একালেও নেই। কারণ এই শ্রেণীর লোক প্রতাপে প্রভাবে শাস্ত্রী, সমাজপতি ও শাসককে সহজে বশে রাখতে পারে।

আগের কালে আমাদের এই দেশে পার্বণিক উৎসবে কিংবা আনন্দের আয়োজনে পাড়া-প্রতিবেশীরা—যারা সামাজিক নিয়ম-নীতি কিংবা রীতি-রেওয়াজ লঙ্ঘন করে অন্যের অধিকারে ও স্বার্থে আঘাত হানত, তাদেরকে 'একঘরে' করত। জনতার মধ্যে উচ্চকণ্ঠে তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করা হত এবং নিন্দা রটানো হত, তারপর তা' শ্রুতিমধুর ও মুখরোচক হলে পাড়ার লোকেরা গান-ছড়া-নৃত্য ও অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে রসোপ-ভোগের জন্যে তা' প্রচার করে বেড়াত। এ ভাবেই ওগুলো গান, কবিতা, যাত্রা, এবং কথকতার বিষয় হয়ে উঠে। আজো তেমনি অসামান্য ও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা নিয়ে গ্রাম-কবি 'কবিতা' রচনা করেন। আজো গাজন গানে, আল্লের গম্ভীরায়, কবিগানে, যাত্রায়, কথকতায়, মহররমের কিংবা ঈদের মিসিলে সামাজিক দুর্নীতি, অনাচার, ব্যক্তিচরিত্রের ত্রুটি প্রভৃতি প্রত্যক্ষভাবে লোক-গোচরে আনবার জন্যে 'সঙ' সাজানো হয়। বলা চলে, উক্তরূপ অনুষ্ঠানই হচ্ছে আমাদের সুপ্রাচীন "গণ আদালত"। এর ফল ও প্রভাব সামাজিক জীবনে গভীর ও ব্যাপক ছিল।

আমরা যখন কথা বলি, তখন কেবল উচ্চারিত ধ্বনি দিয়েই বক্তব্য শ্রোতার হৃদয়বেদ্য করতে পারিনে। তার সঙ্গে অভিপ্রায়-অনুগ তথা অনুভূতিপ্রকাশক কণ্ঠস্বর ও চোখ-মুখ-হাতের বিভিন্ন ভঙ্গির সহযোগ আবশ্যিক। এই উপলব্ধি থেকেই যে-কোন বক্তব্য ও ঘটনা প্রত্যক্ষ ও জীবন্ত করে তুলবার জন্যে অবিকল অনুকৃতির প্রয়োজন অনুভূত হয়েছে। এর থেকেই 'সঙ'-এর, যাত্রার ও নাটকের উৎপত্তি বলে অনুমান করা যায়। তা'ছাড়া আদিম আরণ্য ও গুহামানবেরাও জীবন-জীবিকার নিরাপত্তার জন্যে, বাঞ্ছাসিদ্ধির জন্যে, প্রার্থনা জানাবার জন্যে, প্রয়াসে সিদ্ধির জন্যে যাদুবিশ্বাস বশে নৃত্য, চিত্র ও অন্যান্য প্রতীকি অনুষ্ঠানের আশ্রয় নিত।

মূর্তিনির্মাণ ও মূর্তিপূজা এ ধারারই বিকশিত রূপ। সুতোর মাধ্যমে বাঞ্ছা নিবেদন ও দেবতুষ্টিসাধন এই সেদিনও দেবপূজার আবশ্যিক অঙ্গ ছিল। কাজেই 'সঙ' সাজার ও সাজানোর, বহুরূপী সাজার এবং সঙ সাহিত্য রচনার প্রেরণা সেদিক দিয়েও আদিম এবং ঐতিহ্যিক। এ একাধারে গ্রামীণ art ও ritual।

ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 'সমঅঙ্গ' থেকেই 'সঙ' নামের উৎপত্তি বলে মনে করেন। আমরা এ বিষয়ে অজ্ঞ। কাজেই তাঁর সিদ্ধান্তেই আস্থা রাখি। কিন্তু স+অঙ্গ=সঙ্গ∠সঙ অথবা স্ব+অঙ্গ—সোয়াঙ্গ> সোয়াঙ>সঙ-ও কি কল্পনা করা চলে না! অর্থাৎ ঘটনার বা আচরণের কেবল মৌখিক বর্ণনা নয়, আঙ্গিক অভিব্যক্তিদানও যার লক্ষ্য সে-ই 'সঙ্গ' বা স্বঙ্গ। সম+অঙ্গ যদি সমাঙ্গ না হয়ে সমঅঙ্গ>সঙ্গ হয় তবে স+অঙ্গ ও 'সাঙ্গ' না হয়ে 'সঙ্গ' হতে বাধা কি? বিদ্বানদের মনে অন্বেষা জাগানোই আমাদের এই বিনীত প্রশ্নের লক্ষ্য।

১৫১ পৃষ্ঠা ব্যাপী দীর্ঘ ভূমিকায় গ্রন্থকার ও সংগ্রাহক শ্রীবীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় অনেক তথ্য সন্নিবিষ্ট করেছেন, সে-সূত্রে কিছু অপ্রাসঙ্গিক তথ্যেরও ঠাঁই করে দিয়েছেন, যেমন কোলকাতার কশাইখানা স্থানান্তর প্রয়াস ও হিন্দুদের আপত্তি বিষয়ক বিস্তৃত তথ্য 'সঙ' সাহিত্যালোচনার ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক।

কিন্তু বাঙালীমাত্রই তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে এ জন্যে যে, তিনি এ অবহেলিত বিষয়ে অতি নিষ্ঠার সঙ্গে কষ্ট ও শ্রমসাধ্য অনুসন্ধান চালিয়েছেন। এ বিষয়ে ভাবীকালে বিস্তৃত ও বহুমুখী আলোচনার ভিত্তিও তিনিই রচনা করে দিলেন। অবশ্য তার আগে পশ্চিমবঙ্গের ও বাংলাদেশের 'সঙ' সাহিত্য বিশেষ তৎপরতার সঙ্গে সংগৃহীত হওয়া আবশ্যক। দেশের সাহিত্যসেবীরা তা করবেন এ প্রত্যাশা অসঙ্গত নয়। তাঁর ভূমিকাটিও বস্তুসন্ধিৎসা, তত্ত্বজিজ্ঞাসা ও বিশ্লেষণ-নৈপুণ্যের নিদর্শন। 'সঙ'-এর গান, গাথা, কবিতা ও ছড়া সংগ্রহে তাঁর অধ্যবসায়ও প্রশংসনীয়। এ ছাড়া বহুরূপী, মুখোশ, বসাসঙ ও পুতুল, বিদূষক, ভাঁড় ও আহ্লাদে প্রভৃতি সঙ সম্পর্কে আলোচনাও প্রাসঙ্গিক ও তথ্যনির্ভর হয়েছে।

আমাদের উপরের আলোচনা দেখে কেউ যেন মনে না করেন, 'সঙ' সাহিত্যে কিংবা গাজনে, গম্ভীরায়, ঈদ-মহর্‌রমের মিছিলে, গানে, অভিনয়ে অথবা কবিগানে, যাত্রায়, কথকতায় কেবল ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ, পরিহাস, মস্করাই থাকে। সে-সঙ্গে ব্যক্তিক ও সামাজিক অসঙ্গতি, দুর্নীতি ত্রুটি সংশোধনের জন্যে নীতিকথাও উচ্চারিত হয়। সমাজস্বার্থে জনগণমনে আদর্শ-চেতনা জাগানো ও আদর্শদানের চেষ্টাও থাকে।

বিদ্বানদের কাছে এই বইয়ের আদর-কদর নিশ্চিতই প্রত্যাশা করা যায়। বইয়ের প্রচ্ছদ দৃষ্টি-সুন্দর, ছাপা ও বাঁধাই চমৎকার। এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল-এর প্রকাশনা এবং প্রখ্যাত পণ্ডিত ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ভূমিকা গ্রন্থের গুরুত্ব এবং গ্রন্থকারের সম্মান বৃদ্ধি করেছে।

বাউল কবি ও তত্ত্ব প্রসঙ্গে

সেকালের জীবনপ্রবাহের গতি প্রকৃতির কথা সমকালের মানুষ গানে গাথায় চিত্রে স্থাপত্যে ভাস্কর্যে কিংবা স্মৃতি-কথায় ধরে না রাখলে তা চিরতরে হারিয়ে যায়। পরে আর শতচেষ্টায়ও তা কায়া-প্রতীক হয়ে উঠে না, মায়া ও ছায়া হয়ে জিজ্ঞাসুকে কেবল বিভ্রান্তই করে। কল্পনা ও অনুমান যোগে সত্য নির্ধারণের প্রয়াসে তাই কোন দুই ব্যক্তি একমত হতে পারে না। একারণেই অতীত সম্বন্ধে প্রাতিভাসিক সত্য ও তথ্য নিয়ে বিদ্বানদের মধ্যে বিতর্ক-বিবাদ চলতেই থাকে—সর্বজনগ্রাহ্য মীমাংসা থাকে চির অনায়ত্ত।

বলতে গেলে অক্ষয়কুমার দত্ত ব্যতীত উনিশ শতকে কেউ বাউল মত ও সম্প্রদায় সম্বন্ধে আগ্রহী ছিলেন না। অক্ষয় দত্তও বিভিন্ন শাখার বাউল মতের সংক্ষিপ্ত সাধারণ অস্তিত্বের কথাই কেবল লিখেছিলেন। তা'যে বাঙলার ও বাঙালীর নিজস্ব ধর্ম সে সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন না। বিশ শতকে প্রতিভাবান লোক-কবি লালনের প্রতি আকর্ষণবশেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর কয়েকটি গান 'হারামণি' নামে প্রবাসীতে প্রকাশিত করেন। তারপর থেকেই লালন ও লোকগীতি সম্পর্কে কোন কোন বিদ্বানের কৌতূহল জাগে। এভাবেই ক্রমে লালনচর্চা ও বাউল মত আলোচনার শুরু। পাকিস্তান আমলে লালনকে মুসলমান বানিয়ে গৌরব-গর্বের অবলম্বন করবার অপপ্রয়াসে বাউল তত্ত্ব, বাউল কবি ও বাউলগান বহুল ও প্রায় নিত্য আলোচিত বিষয় হয়ে দাঁড়ায়।

পঞ্চাশোর্ধ্ব'কাল ধরে বহুলোকের চর্চার ফলে তথ্য ও তত্ত্ব বহুল ও বিপুল হয়ে উঠেছে। এবং তা ই প্রায় অসমাধ্যরূপে জটিলও হয়েছে। কাজেই সমস্যাও পূর্ববৎ প্রবল। প্রতিজ্ঞার (Premise-এ) প্রমাদ থাকলে সিদ্ধান্ত নির্ভুল হতেই পারে না। মূল সমস্যা চারটি: ক, বাউল নামের উৎপত্তি নিরূপণ, খ, বাউল মত নির্ণয়, গ, লালনের জাতি পরিচয়, ঘ, লালনের জন্মস্থান নির্দেশ।

এসব সমস্যার সমাধানের পথে তথ্য-প্রমাণের বিভ্রান্তি যত না আছে, তার চেয়ে বেশী প্রতিবন্ধক রয়েছে আলোচক-গবেষকের মানস-প্রবণতায়।

'বাউল' নামের উদ্ভব ও ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে এযাবৎ যাঁর যেমন ইচ্ছা তেমনি মত ব্যক্ত করেছেন। সম্ভাব্য সব রকমের অনুমানের আকর প্রায় নিঃশেষ। তবু মীমাংসা হল না।

বাউল মতকেও কেউ যোগ, কেউ তন্ত্র, কেউবা সাংখ্যসম্ভূত বলে অনুমান করেন, কেউবা সুফীমত বলে চালিয়ে দেন। আবার কেউ কেউ একে একটি মিশ্রমত বলে আপস খোঁজেন। সম্প্রতি 'এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাঙলাদেশ' জার্নালে (এপ্রিল ১৯৭৩ সন) ডক্টর হরেন্দ্রচন্দ্র পাল 'চারি চন্দ্র' তত্ত্বের উৎস কোরআনের আয়াত বলে প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন। এ ছাড়া জন্ম-সূত্রে বৌদ্ধ, শৈব বা বৈষ্ণব সংলগ্নতার দাবি তো রয়েইছে। বাউল মতের প্রবর্তক হিসেবে পাই চৈতন্যদেব, নিত্যানন্দ, বীরভদ্র, আউলচাঁদ, মাধববিবি প্রভৃতিকে।

গোড়াতে লালনের জাতিপরিচয় সম্পর্কে একটা আপোসমূলক সিদ্ধান্ত চালু ছিল—লালনের জন্ম হিন্দুর ঘরে আর পালন মুসলিম সংসারে এবং পোষণ হিন্দু-মুসলিমে মিশ্রিত বাউল সমাজে। ইদানীং তাঁকে শুদ্ধ মুসলমান কিংবা কেবল হিন্দু বানাবার জোর প্রয়াস চলছে। এ শতকের গোড়ার দিকে ওহাবী-ফরায়েজী আন্দোলনের প্রভাবে বাউলদের দেখা হত মুসলিম সমাজের লজ্জা, দায় ও বোঝারূপে। ইসলামের নামে বাউলবিরোধী ও বিধ্বংসী ফতোয়া বের হল—লাঞ্ছিত হল কত বাউল। এখন লালন শাহ্‌র প্রতিভামুগ্ধ ও লোক-সাহিত্যের ঐশ্বর্যগর্বী বিদ্বানেরা বাউল মত, বাউল কবি ও বাউল গানকে সম্পদরূপে বিবেচনা করেন, তাই শুরু হয়েছে দাবি-প্রতিষ্ঠার লড়াই।

জন্মস্থানের অধিকার নিয়েও তাই শুরু হয়েছে সংগ্রাম—ছেউড়িয়ায় ভাঁড়ারায় ও হরিশপুরে। এ সংগ্রামে প্রযুক্ত অস্ত্র হচ্ছে শতোর্ধ্ব' বয়সের বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, লালনের জ্ঞাতি, ভূমি ক্রয়-বিক্রয়ের কবলা এবং রাজস্বের ও স্বত্বের মামলার দলিল। আপাতদৃষ্টিতে এগুলোকে অব্যর্থ প্রমাণক বলেই মনে হয়। কিন্তু সমকালে 'লালন' নামের একাধিক মানুষের অস্তিত্বের সম্ভাবনা, অশিক্ষিত মানুষের বয়সের হিসেবে ত্রুটি,

অস্তিত্বে প্রমাণের অভাব, দলিল দস্তাবেজে নামগত সাদৃশ্যজাত বিভ্রান্তির সম্ভাব্যতা প্রভৃতি প্রশ্ন সদুত্তরের অপেক্ষা রাখে। সম্প্রতি দদ্দু শাহ রচিত লালনের জীবনপরিচিতি মিলেছে। আমিও অধ্যাপক এস. এম. লুৎফর রহমানের কাছে এর প্রতিলিপি দেখেছি। দুদ্দু শাহ নিজে গান বাঁধতেন। ঐ রচনার ভাষায় ও ছন্দে স্বভাবকবির স্বাচ্ছন্দ্য নেই। শব্দবিন্যাসে ও প্রয়োগে এবং ছন্দে ত্রুটি সর্বত্র দৃশ্যমান। তা ছাড়া সাক্ষর দদ্দু শাহ নিজের বাঁধা গান কখনো খাতায় লিখে স্থায়িত্বদানের চেষ্টা করেছেন বলে প্রমাণ নেই। তিনি হঠাৎ ৭০।৮০ চরণে লালনগুরুর জীবন-কথা লিপিবদ্ধ করতে গেলেন কোন্ প্রেরণায়? লালন সম্পর্কে আধুনিক বিদ্বানদের যতটুকু তথ্য প্রয়োজন, ঠিক ততটুকুই মেলে উক্ত দদ্দুরচিত জীবনচরিতে। এতেই এর যাথার্থ্য সম্বন্ধে জাগে প্রশ্ন অথচ বহু শিষ্যের সিদ্ধগুরু ও গানের রাজা লালন-জীবনের নানা লৌকিক অলৌকিক কাহিনীর বর্ণনা থাকা ছিল প্রত্যাশিত। এতেই এর অকৃত্রিমতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রবল হয়। সরকার যেমন শাসনের প্রয়োজনে অসত্য প্রচারে আগ্রহী থাকে, গবেষকরাও তেমনি সত্য উদ্ঘাটনের নামে মানসপ্রবণতার প্রতি সোহাগবশে তথ্যের বিকৃতি ঘটিয়ে পছন্দসই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

আমি নিজেও এক সময় বাউল তত্ত্ব, বাউল গান ও লালন সম্পর্কে সামান্য আলোচনা করেছি। আজ মনে হয় সে-সব তথ্য ও তত্ত্বের সবটা যথার্থ নয়। আমার এখনকার ধারণা: বাউল মত বাঙলার ও বাঙালীর মৌলিক ধর্ম। মঙ্গোলীয় তথা ভোটচীনা রক্তে সঙ্কর ও ভোটচীনা পরিবেষ্টিত ও প্রভাবিত অস্ট্রিক বাঙালীর মানস-প্রসূন এই ধর্ম। আমাদের ভুললে চলবে না যে, বাঙালী মুখে বহির্দেশীয় ধর্ম ও দর্শন গ্রহণ করেছে বটে, কিন্তু নিজের জীবন জীবিকার অনুকূল না হলে তা কখনো বুকের সত্য কিংবা মর্মের তত্ত্ব রূপে বরণ করেনি। তাই এখানে বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও ইসলাম বিকৃত হয়েছে। বাঙালী সাংখ্যসম্মত ·যোগতন্ত্রভিত্তিক জীবন-চর্যা গ্রহণ করে নামসার বৌদ্ধমতের আবরণে। কালক্রমে তারই বিবর্তিত রূপ পাই বজ্র-সহজ কালচক্র-মন্ত্র প্রভৃতি বিকৃত বৌদ্ধযানে বা মতে। দেহতাত্ত্বিক এই নাস্তিক্য সাধনার জন্ম হয়েছে দেহতাত্ত্বিক ঐ নাস্তিক চর্যার ও ভোটচীনার তন্ত্রাচারে। বস্তুত অস্ট্রো-মোঙ্গল সংস্কৃতির প্রসূন ঐ কায়াভিত্তিক

জীবনসত্তা ও জগৎতত্ত্ব বাঙালীচিত্তে বহুসত্ত্ব কালতত্ত্ব সহজানন্দ শূন্য রূপে বিশিষ্ট বা অনন্ত দৈশিক রূপ লাভ করে। এক সময় তা হয়তো নিরক্ষর নিজিত সমাজে জনপ্রিয় হয়ে সর্বভারতীয় হয়ে উঠে। গোরক্ষনাথীয় ও কবীরপন্থীয় চর্যার সঙ্গে তাই এর সাদৃশ্য খুঁজে পাই।

ব্রাহ্মণ্য অভ্যুত্থানে বৌদ্ধ-বিলুপ্তির সময়ে নির্যাতিত বৌদ্ধনামধেয় উক্ত বজ্র সহজযানীরা ব্রাহ্মণ্য সমাজে আত্মগোপন করে এবং অনতিকাল পরে আত্মরক্ষার গরজে ইসলামাশ্রিত হয়। তখন নবধর্মের আচারিক প্রভাবের প্রাবল্যে অত্যুৎসাহী শাস্ত্রকারদের শাসনে তারা সাধারণত প্রকাশ্যে স্বধর্মাচরণ বন্ধ রেখেছিল, তারপর ব্রাহ্মণ্যবাদী ও মুসলিমদের প্রাথমিক উৎসাহে শৈথিল্য এলে ওরা স্বধর্মাচরণে সাহসী হয়ে উঠে। মাঝখানের দুশ' আড়াইশ' বছরের গুপ্ততা ও আংশিকবিরতি নিরক্ষর নিজিত গণমানবের আত্মপরিচয়ে বিস্মৃতি ঘটায়। এর ফলেই চোদ্দ-পনেরো শতকে বাউল সম্প্রদায় পরিচয়ের ক্ষেত্রে ঐতিহ্য ও শাস্ত্রবিরহী ভুঁইফোড় হয়ে দাঁড়ায়। এভাবে 'বাউল' নামের ও মতের উদ্ভব নিরূপণে পণ্ডিতে পণ্ডিতে লড়াইয়ের সুযোগ ঘটেছে। আমার এখনকার ধারণা 'বজ্রকুল' থেকেই কালে 'বাউল' শব্দের উদ্ভব এবং বজ্র সহজযানী থেকে নাথশৈব, যোগী, বৈষ্ণব সহজিয়া ও বিভিন্ন গুরুবাদের বেনামে হিন্দু মুসলিম বাউল সম্প্রদায়গুলোর বিকাশ কিংবা বিকৃতি ঘটেছে। মধ্যখানে ব্রাহ্মণ্যসমাজ, ইসলাম ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব মত আশ্রিত হয়েছিল বলে তাদের মধ্যে আস্তিক্যবোধ ও অধ্যাত্মবুদ্ধি দৃঢ়মূল হয়েছে। এবং তা রাধাকৃষ্ণ, মায়া ব্রহ্ম, আল্লাহ্-মুহম্মদ, শিব শক্তি, নাথ-শূন্য প্রভৃতি নানা আরাধ্যের রূপকে কোরআন পুরাণাশ্রিত হয়েছে। বিদ্বানদের বিভ্রান্ত হবার কারণও ঘটেছে এভাবেই। নইলে এরা পূর্বাপর দেহাত্মবাদীই—দেহাধারেই প্রাণ-পুরুষের পরশ প্রয়াসী। এক তত্ত্ব সম্বন্ধেই তারা জিজ্ঞাসু—সেটি হচ্ছে দেহতত্ত্ব। নাস্তিক্য সাংখ্য যোগ তন্ত্রই এ তত্ত্বের উৎস, বারোশতকের 'অমৃতকুণ্ড', চর্যাগীতি, প্রাণ-সঙ্কলি, হাড়মালা, সাধনমালা প্রভৃতি যোগ ও তন্ত্র বিষয়ক গ্রন্থ কিংবা বিবর্ত বিলাস প্রভৃতি সহজিয়া বৈষ্ণব গ্রন্থগুলোর আলোকে বাউল মত বোঝা কঠিন নয়। যা বললাম-তার জন্যে পাথুরে প্রমাণ পেশ করতে পারব না, তবে এই অনুমানে গবেষণা করলে বোধ হয় আমরা সত্যের সন্ধান পেয়েও যেতে পারি।

বাউল ও লালন সম্বন্ধে সম্প্রতি অনেক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে ও হচ্ছে। ডক্টর উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ও অধ্যাপক আবু তালিব বিপুলকায় গ্রন্থ রচনা করেছেন, অধ্যাপক আনওয়ারুল করীম, অধ্যাপক খোন্দকার রিয়াজুল হকের বইও ছোট নয়। অধ্যাপক এস. এম. লুৎফর রহমান এবং আবুল আহসান চৌধুরীর গ্রন্থও প্রকাশনের পথে। রবীন্দ্রনাথ, ক্ষিতিমোহন সেন, মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন, সতীশচন্দ্র দাস, করুণাময় গোস্বামী, ভোলানাথ মজুমদার, বসন্তকুমার পাল, শচীন্দ্রনাথ অধিকারী, ডক্টর মতিলাল দাস, পীযুষকান্তি মহাপাত্র, ডক্টর মযহারুল ইসলাম, এ. এইচ. এম. ইমামুদ্দীন, বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীর প্রভৃতি অনেকেই নানাভাবে বাউল গান ও বাউল কবি সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন ও করবেন। তত্ত্ব কিংবা পুরাতত্ত্ব বিষয়ে কেউ কখনো শেষ কথা বলতে পারে না। বিতর্কে বিবাদে বিসম্বাদে প্রতিবাদী গবেষণা ও আলোচনা চালু রাখাই হচ্ছে জ্ঞানচর্চা। আনুষঙ্গিকভাবে আসে নতুন তথ্য, তত্ত্ব ও তাৎপর্য। এভাবেই মানুষের জ্ঞান বিজ্ঞান বিকাশ ও প্রসারলাভ করছে।

— — — —

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	আছে	হবে
১০	১৬	ক্ষণেক	ক্ষণেকে
১০	১৫	নতুন. ভীরু	নতুন-ভীরু
২২	৫	Promise	Premise
২৬	২০	তেলাঙ্গান	তেলঙ্গানা
৩২	১৭	প্রতিভাসিক	প্রাতিভাসিক
৩৫	২৫	জিগীষরত্তির	জিগীষারত্তির
৩৬	১৮	গ্রহণ	গ্রহণের
৩৬	২৫	নীতির	নীতি
৩৭	২০	সই	সেই
৩৭	২১	কু ওয়ানের	ক ও্ য়ানের
৩৯	১৯	সনস্বার্থে	সমস্বার্থে
৪০	৮	অঙ্গীকারে	অঙ্গীকারে আস্থা রেখে
৪০	১১	হ ত্যাকাণ্ডের	হত্যাকাণ্ডের
৪০	২২	এই ও	এ-ও
৪২	২১	ল´ভ	দুর্লভ
৪৩	১২	অযোগ	সুযোগ
৪৫	১৭	মনীষা সম্পন্ন,	মনীষাসম্পন্ন
৪৬	১৪	দু´দিন	দুর্দিন
৪৭	১৫	প্রাণবন্থ	প্রাণবন্ত
৪৯	৪	মিটাইবার	মেটাবার
৫১	১৩	তমদ্দুনওয়ালাও	তমদ্দুনওয়ালা ও
৫২	৩	সর্বজনীণ	সর্বজনীন
৫২	৫	বৈদেশিক	দৈশিক
৫৫	৮	বৃদ্ধি	বুদ্ধি
৫৫	১০	দ্বেষী-না	দ্বেষী না
৬০	৫	পব	পর্ব